কৃষিক্ষেত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে

FELLOW OF THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY OF LONDON,

Late Superintendent of H. H. the Nawab Bahadur of Murshidabad's Gardens, formerly Superintendent of the

Cossipur Horticultural Institute,

প্রণীত।

কলিকাতা।

PRINTED AND PUBLISHED BY H. C. DAS,

65/2, BEADON STREET, ELYSIUM PRESS.

মূল্য এক টাকা।

RAJAH SASISEKHARESHWAR RAY,
ZEMINDAR OF TAHIRPUR,

THIS LITTLE BOOK IS INSCRIBED AS A TOKEN OF SINCERE RESPECT AND ADMIRATION FOR HIS INVALUABLE SERVICES IN THE CAUSE OF THE COUNTRY IN GENERAL AND OF AGRICULTURE IN PARTICULAR,

BY

THE AUTHOR.

ভূমিকা।

এ দেশে মধ্যবৃত্ত গৃহস্থগণের বিশেষ আর্থিক অনাটন হইয়াছে। এই সকল ভদ্র সন্তানের চাকরি ব্যতীত অন্য আর অর্থ উপার্জ্জনের দ্বিতীয় উপায় নাই। চাকরিও দেশে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে,—সুতরাং শিক্ষিত হইয়াও অনেকে যথেষ্ট অর্থ কষ্ট উপভোগ করিতেছেন।

ইহাঁদেরই জন্য এই পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইল। ভারতের ন্যায় শস্যশালিনী ও শস্যপ্রসবিনী দেশে কাহারও অন্ন কষ্ট বা আর্থিক অনাটন হওয়া সম্ভব নহে। বিস্তৃত ভারতের উর্ব্বরা ক্ষেত্র সকল অযত্নে অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অতি সামান্য অর্থ ব্যয় করিলে, অতি সামান্য যত্ন করিলেও একটু সামান্যরূপ কৃষিকার্য্য অবগত থাকিলে এই সকল ক্ষেত্র হইতে রত্ন উৎপাদন করিয়া ধনবান ও যশোবান হইয়া সুখে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারা যায়।

এ দেশে অল্পই লোক আছেন, যাঁহার কিছু না কিছু জমী নাই। এই সকল জমী একটু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলে সকলেরই আর্থিক অনাটন দূর হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অনেকে এ কার্য্য করিতে কেন পারেন না, তাহাও আমরা জানি। এ দেশে এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে কেহই কৃষি বিদ্যার কিছুই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। অন্যান্য নানা বিদ্যা ও বিজ্ঞানের ন্যায় কৃষিও একটী বিশেষ

প্রয়োজনীয় ও জ্ঞানপ্রদ বিদ্যা। ইহার বহু উন্নতি সাধন করিয়াই আজকাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা দেশে কৃষির উন্নতি সাধনে সক্ষম হইলে ভারতের ধনের অভাব থাকে না, ভারতে ভারতসন্তান আর কখনও অন্নের অভাব উপভোগ করেন না একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

অনেকে কৃষিকার্য্য জানেন না বলিয়াই, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না। তাঁহাদের এই অভাব দূর করিবার জন্যই অতি যত্নে ও বহু পরিশ্রমে এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেশে যে পুস্তক নাই, তাহা নহে, কিন্তু আমরা স্বয়ং স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া ও ইয়ুরোপীয় কৃষি-বিদ্যার আলোচনা করিয়া যে যে বিষয় এ দেশীয় কৃষিকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজন ও জ্ঞাতব্য মনে করিয়াছি, তাহাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সুতরাং এ পুস্তকে কৃষিকার্য্যব্রতীগণের যে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, সে বিষয় আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অন্যান্য প্রায় সকল ফসলের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ধান্যের উল্লেখ এ পুস্তকে করি নাই। ধান্যের চাষ একটী প্রধান বিষয় ও উহা সঙ্খেপে শেষ করিবার নহে। এই জন্য ভবিষ্যতে কেবল ধান্য চাষ সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিবার বাসনা রহিল। ইহাতে ইহার কোন উল্লেখ রহিল না।

বিদেশে থাকিয়া ছাপার কার্য্য পরিদর্শন করা বড় অসুবিধা-জনক। এই জন্য ইহাতে অনেক ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। সাধারণে অনুগ্রহ করিয়া সে ত্রুটী মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব।

এই পুস্তক দ্বারা পাঠকগণের বিন্দুমাত্রও উপকার দর্শিলে সকল পরিশ্রম ও যত্ন সফল বলিয়া মনে করিব।

রৈইস্ বাগ, মুরসিদাবাদ।
১লা কার্ত্তিক ১৩০১ সাল।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে।

সূচিপত্র।

—oo—

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কৃষি ক্ষেত্র।

মূল-ধন।

কৃষি কার্য্যে হস্ত ক্ষেপন করিবার পূর্ব্বে প্রধান বিবেচ্য বিষয় মূলধন। গৃহস্থিত অর্থ যে কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে, সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতা আবশ্যক, কেননা অনেক সময়ে স্বীয় অবিবেচনার ফলে লোকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অবশেষে দোষ হইয়া থাকে, কৃষি কার্য্যের। এইরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া যে ব্যক্তি-বিশেষ নিরুৎসাহ ও ভগ্নমনোরথ হয়েন তাহা নহে, এ দৃষ্টান্ত জনসমাজের যথেষ্ট ক্ষতি করে। যে কার্য্যে এক ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া থাকে, অপর দশজন ব্যক্তি তদ্দৃষ্টে আর তাহাতে অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। এই জন্য একজনের ক্ষতিকে আমরা ব্যক্তিগত ক্ষতি মনে না করিয়া জাতীয় ক্ষতি মনে করি। ব্যক্তিগত ক্ষতির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ অতি অল্প, কিন্তু যখন ইহার সহিত জাতীয় স্বার্থ সন্নিহিত সে স্থলে আমরা এ সম্বন্ধে সকলকে এবং প্রত্যেককে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করি।

নিজের মূলধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কৃষিক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। অবিবেচনার সহিত অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করিলে অনেক সময়ে

অর্থাভাব ঘটে, এবং সেই হেতু সমূহ লোকসান হয়। নিজে যে পরিমানে অর্থব্যয় করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস কার্য্যের আয়োজন, তদনুসারে করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য। বরং অল্প আয়োজনে কার্য্যারম্ভ করা শত গুণে শ্রেয়, কিন্তু মূলধনের শক্তির অতীত বৃহৎ ব্যাপারের আয়োজন করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। যদি বিশ বিঘা জমিতে আবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে সম্বৎসরমধ্যে তাহার জন্য যে কিছু খরচ হওয়া সম্ভব তাহা হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে এবং নিজের অর্থের সচ্ছলতা বুঝিতে হইবে। প্রতি বিঘার জন্য ২৫৲ টাকা ধার্য্য করিলে উক্ত বিশ বিঘায় আবাদ করিতে ৫০০৲ টাকার আবশ্যক, কিন্তু পাঁচশতটাকামাত্র মূলধন হইলে আমাদের মতে দশ হইতে পনর বিঘার অধিক আবাদ করা উচিত বা যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহার কারণ এই যে ৫০০৲ টাকার মধ্যেই যে সম্বৎসরের সমুদায় খরচ চলিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা কি? এরূপ অনেক ঘটনা আছে যাহাতে হয়ত ১০০৲ টাকার দরকার হইতে পারে অথচ তদভাবে হয়ত ক্ষেত্রের ফসল উঠিতেছে না; জলাভাব এমন হইতে পারে যে ক্ষেত্রে জল সেচন না করিলে সমুদায় ফসল বিনষ্ট হইয়া যাইবে কিম্বা অন্য কারণে প্রথম বৎসর হয়ত ক্ষতি হইল, তখন তাহা পূরণ করিবার জন্য হস্তস্থিত টাকা খরচ করা আবশ্যক হইবে। ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, একবৎসরের চাষেই যে লাভ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, বস্তুতঃ তিন বৎসরের আয় ব্যয় না দেখিলে কৃষিক্ষেত্রের লাভ বা ক্ষতি বুঝা যায় না। প্রথম বৎসরে যেমন ক্ষতি হইতে পারে সেইরূপ লাভ ও হওয়া সম্ভব। কৃষিকার্য্য আর প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ করা প্রায় একই

কথা, সুতরাং তাহাতে সফল বা বিফল হওয়া একরূপ অনিশ্চিত। তাহাতেই আমাদের পরামর্শ যে, সমুদায় মূলধন একবারে ব্যয় না করিয়া সম্বৎসরের খরচ বাদ হস্তে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা যে বিপদ ঘটিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম বৎসর মধ্যেই সমুদায় টাকা ব্যয় করিয়া যদি ক্ষতি মাত্র লাভ হয়, তাহা হইলে, পর বৎসর আর অর্থাভাবে কার্য্য চালান সম্ভব হয় না, অগত্যা অনেকে প্রথম বৎসরের ক্ষতিতেই কার্য্য পরিত্যাগ করেন। দুই বৎসরের খরচের টাকা মজুত রাখিয়া কৃষিক্ষেত্রে অবতরণ করাই পরামর্শ সিদ্ধ।

ঋণ করিয়া কৃষি কার্য্য করিবে না। বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষে টাকার বড় অসচ্ছল, এজন্য এখানে অধিক সুদ না দিলে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় না। বন্ধকীসুদেও যদি ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ কারা যায় তথাপি শত করা মাসিক একটাকার স্থানে উহা পাওয়া যায় না; তাহা হইলে মোট টাকার উপর বার্ষিক ৬০৲ টাকা সুদ হইয়া থাকে। বিনা বন্ধকে আরো অধিক সুদ দিতে হয়। যদি এরূপ কোন জামীন থাকিত যে, একবৎসর চাষ—বাস করিলেই সুদ সমেত আসল টাকা উঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ঋণ করিতে তত ভয়ের কারণ নাই। যে বৎসর ঋণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করা গেল, সে বৎসর যদি বন্যারজলে সমুদায় ভাসিয়া যায় বা অনাবৃষ্টিতে ফসল দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বর্ষশেষে ৫৬০৲ টাকার দায়ী হইতে হইল এবং সত্বর তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে সুদের উপর সুদ বাড়িতে লাগিল; অগত্যা হয়ত কৃষিকার্য্য ও বন্ধ করিতে হইল। কৃষি কার্য্যে

যথেষ্ট আনন্দ আছে, অন্যদিকে ততোধিক চিন্তা আছে; তাহার উপরে আবার অর্থের বা ঋণের চিন্তা বলবতী থাকিলে মনুষ্যের ধৈর্য্য চ্যুতী হয়, ও হৃদয় অশান্তির আলয় হয়। ঋণ করিয়া এরূপ অশান্তি ক্রয় করিবার আবশ্যক নাই। কার্য্য কালে যদি সামান্য টাকার অভাব হইয়া পড়ে তাহা হইলে কর্জ্জ করিতে দোষ নাই কিন্তু আরম্ভেই ঋণ আশাপ্রদ নহে।

আর এককথা এই যে, নূতন অথবা পতিত জমি লইয়া প্রথম কার্য্যারম্ভ করিতে হইলে সচরাচর চাষে যে খরচ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ খরচ হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে জঙ্গল পরিষ্কার, পুষ্করিণী খনন, গৃহনির্ম্মান, লাঙ্গল বলদ খরিদ, ও যন্ত্রাদি খরিদ বিষয়ে অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে উহা বার্ষিক খরচের মধ্যে নহে, মূল ধনের রূপান্তর মাত্র। তথাপি কিন্তু ইহার ক্ষয় আছে এবং সেই ক্ষয় ক্রমে লাভের অংশ হইতে পরিপোষিত হইয়া যায়। এ সকলই সত্য, তথাপি প্রথমতঃ উহা গৃহ হইতে বাহির করিতে হইবে, এজন্য উহা বার্ষিক খরচের মধ্যে গণ্য না করিয়া মূল ধন হিসাবে দিতে হয়। এ সমুদায় প্রারম্ভিক খরচ প্রতিবৎসর আবশ্যক হয় না, সুতরাং উহা বার্ষিক খরচের অন্তর্গত নহে। একবার যন্ত্রাদি খরিদ ও গৃহাদি নির্ম্মান হইয়া গেলে ভবিষ্যতে যে তাহা মেরামতাদি করিতে হয় অথবা কোন যন্ত্র খরিদ করিতে হয়, তাহা বার্ষিক খরচের অন্তর্গত।

এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া মূল ধন হিসাব করতঃ অর্থের শক্তি বুঝিয়া কার্য্যের আয়োজন করিতে হইবে। কার্য্যারম্ভের পরে অর্থাভাবে যেন কোন কার্য্যের ত্রুটি

না হয়, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সম্বৎসরের খরচের তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক।

ক্ষেত্র স্বামী।

কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহারা যথেষ্ট সময় ব্যয় করিতে না পারেন তাঁহারা যেন এ কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ না করেন। অনেকে কৃষি কার্য্যকে সামান্য জ্ঞানে অথবা দ্বিতীয় অবলম্বন ভাবিয়া স্বীয় সুবিধামত ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। কৃষি কার্য্য সামান্য কার্য্য নহে; ইহাতে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য আবশ্যক। দরিদ্র কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করে বলিয়া ইহাকে সামান্য জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রম। যে শাস্ত্রসাহায্যে মানব জাতির আহার ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা যে সামান্য ইহা অহম্মুখের কথা। ধীর ও গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ইহাপেক্ষা গুরুতর ও প্রয়োজনীয় বিষয় আর নাই কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইহা অনেকের বোধাগম্য। কৃষি শাস্ত্রে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে;—রসায়ন আছে বিদ্যা আছে, ও অর্থ আছে। যে শাস্ত্রমধ্যে এত গুলি বিষয় একত্রে সম্বদ্ধ তাহাপেক্ষা গুরুতর শাস্ত্র আর কি আছে?

গৌণ অবলম্বন মনে করিলে কৃষি কার্য্যে যত্ন হয় না, এজন্য ইহাকে মুখ্য অবলম্বন ভাবিয়া একাগ্র চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অবহেলা পূর্ব্বক কৃষি কার্য্য করিতে গেলে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কেবল অর্থব্যয় করিলে কাজ হয় না।

আপনাকে ভৃত্যভাবে ক্ষেত্রের জন্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে হইবে, নতুবা প্রাতঃকালে বা স্বায়ংকালে বায়ু সেবনোদ্দেশে ক্ষেত্রে বেড়াইতে গিয়া নাম মাত্র কার্য্য পরিদর্শন করিলে কোন কার্য্যই হয় না। ক্ষেত্র স্বামী স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিলে যে পরিমানে লোকজনের নিকট হইতে কার্য্য আদায় হইয়া থাকে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহার অর্দ্ধাংশ ও হয় কি না সন্দেহ। স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ না করিলে লোক জন চক্ষে ধুলি দিয়া থাকে অর্থাৎ সমস্ত দিবস আলস্যে কাটাইয়া ক্ষেত্র স্বামী আসিবার সময় সময় যন্ত্রাদি লইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ক্ষেত্র স্বামী কার্য্যকালে বরাবর উপস্থিত থাকিলে সেরূপ হইবার আশঙ্কা নাই। কৃষি কার্য্য সময় ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। লোক জন যদি সর্ব্বদা অলস ভাবে কাল কাটায় তাহা হইলে যে ক্রমাগতই ক্ষতি হইতে থাকিবে ইহা নিশ্চয়। ক্ষেত্র স্বামীর ইহা দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, তিনি ক্ষেত্রের বেতন ভুক্ত ভৃত্যের স্বরূপ এবং ক্ষেত্রকার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বাবধারণ করা, লোকজন দ্বারা সকল কার্য্য যথা সময়ে সম্পন্ন করিয়া লওয়া এবং আবশ্যক হইলে নিজেও কোদাল ধরা তাঁহার নিয়মিত কার্য্য। ক্ষেত্রে গিয়া রৌদ্র বৃষ্টির ভয়ে গৃহ মধ্যে থাকিয়া অথবা ছাতি মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না। লোকজনেরা আদেশ মত কার্য্য করিতেছে কি না, যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা হইল কি না, এবং যদি না হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট কারণ না দেখাইতে পারিলে তখনই উপস্থিত থাকিয়া তাহা সমাধা করাইয়া লওয়া চাই। আপনি প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে বা বৃষ্টির সময় কার্য্য

ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে লোকজনেরা কখনই পালাইতে সাহস পাইবে না।

কেবল যে লোকজনকে খাটাইয়া লইবার জন্য ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা আবশ্যক তাহা নহে। কোন দিন কোন ক্ষেত্রে বা ফসলে কিরূপ পাইটের আবশ্যক তাহা এই মূর্খ লোকজনেরা জ্ঞাত নহে, আর জ্ঞাত থাকিলেও সে বিষয়ে পরিপক্কতার অভাব আছে; মুখে একরূপ বলিয়া দিলে তাহারা অন্যরূপ করিয়া রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—ক্ষেত্রে জল সেবন করিতে বলিলে কেবল মাত্র উপরিস্থিত মৃত্তিকা ভিজাইয়া দিল, নিড়ানি করিতে বলিলে তৃণাদির শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে রাখিয়া উপরিভাগ ছিঁড়িয়া দিল, জমিতে লাঙ্গল দিতে বলিলে এখানে সেখানে বসিয়া লাঙ্গলের কার্য্য শেষ করিল, গাছের গোড়া খুঁড়িতে গিয়া গাছই উঠাইয়া ফেলিল, গোরু চরাইতে গিয়া গাছতলায় ঘুমাইতে লাগিল, গোয়াল ঘরে গোরুকে 'জাব' দিতে খৈল চুরী করিল, গাভী দোহন করিতে দুগ্ধ চুরী করিল অথবা অপরিষ্কার পাত্রে দোহন করিয়া দুগ্ধ নষ্ট করিয়া ফেলিল, ক্ষেত্রে অগ্নি দিতে গিয়া গৃহ দাহ করিয়া বসিল এইরূপ নানা বিধ অকার্য্য ইহারা প্রতি নিয়ত করিয়া থাকে এবং ইহা সংশোধিত করিয়া লইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা প্রথম হইতে নিয়মিত ভাবে কার্য্য করাইয়া লওয়া ভাল। এই দুরাত্মাগণ এমনই ধূর্ত্ত যে, নিজের দোষ কখনই স্বীকার না করিয়া নানাবিধ বাক্য দ্বারা প্রভুকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পায় যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা ঠিক! সময়ে সময়ে ইহাদিগের কার্য্যের ত্রুটি দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইতে হয়। এ সকল কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত

বল্কিতে পারেন যে, যে সকল ব্যক্তি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত তাহারা কি কৃষি কার্য্য করিবেন না? এতদুত্তরে প্রথমেই আমরা সে কার্য্যে তাঁহাকে অবতরণ করিতে নিষেধ করিব কিন্তু যদি তাঁহার এরূপ বিশ্বাস থাকে যে তাঁহার কোন অতি সন্নিকট আত্মীয় দ্বারা কার্য্যে হইতে পারে তাহা হইলেও তিনি কৃষি কার্য্য করিতে পারেন। অপরের জন্য নিজের মত ভাবিয়া যত্ন ও পরিশ্রম করিবার লোক অতি অল্পই আছে। একান্ন-ভূক্ত নিজ সহোদর অথবা পুত্র ভিন্ন অপর কাহার ও তাদৃশ যত্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। বৃহৎ ব্যাপার হইলে বেতন ভোগী তত্ত্বাবধারক রাখা চলিতে পারে। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, যে আত্মীয় বা লোককে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল, তাঁহার কৃষি কার্য্যে আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না? যদি তাহা না থাকে, তবে তাহার দ্বারা বিশেষ কার্য্য পাইবার আশা নাই, কারণ সে কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে তাঁহার বিরক্ত বোধ হইবে সুতরাং তাদৃশ যত্ন সহকারে কাজ কর্ম্ম দেখিবার বা করিবার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা হইবে না। নিজের সময় ও সুবিধা বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়া তবে কার্য্য ক্ষেত্রে নামিতে হয় নতুবা অর্থব্যয় পণ্ড হইয়া থাকে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া কার্য্যের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে। অদ্য সমস্ত দিনে কোন জমিতে কি কার্য্য হইল এবং সঙ্কল্পিত কার্য্যের কি বাকি রহিল এ সকল তদন্ত করতঃ আগামী কল্য কোথায়, কোন ব্যক্তি কি কার্য্য করিবে তাহার একটা মোটা মোটী বন্দবস্ত করিয়া রাখিতে পারিলে পর দিবস প্রত্যূষ হইলেই লোকজনেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে চলিয়া যাইতে পারে,

নতুবা প্রাতঃকালে উহারা কাজে আসিয়া অনেক ক্ষণ গোল—মালে কাটাইয়া দেয় কিন্তু কার্য্যের বন্দোবস্ত করা থাকিলে আর এরূপ ঘটিতে পারে না। আর যদি ইহাদিগের উপরেই নির্ভর করা যায় তাহা হইলে নিজের মনোমত কাজ হওয়া দূরের কথা, বরং তাহারা যাহা করে তাহাতে হয়ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। যে কার্য্য শীঘ্র করা আবশ্যক তাহা ফেলিয়া রাখিয়া আপন সুবিধা বা ইচ্ছা মত কোন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাদিগকে সে জন্য তিরস্কার করিলে বলিয়া থাকে যে "আমরা ত বসিয়া নাই।" সন্ধ্যাকালে কাজের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলে ক্ষেত্র স্বামীর পক্ষে আরো বিশেষ সুবিধা এই যে, পর দিন প্রাতে উঠিয়াই সেই মূর্খ দিগের সহিত হঙ্গামা বা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয় না এবং নিজেরও অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিবার অবসর পাওয়া গিয়া থাকে।

লোক জনেরা কার্য্যে চলিয়া গেলে স্বয়ং ক্ষেত্রময় পরিদর্শন করা চাই এবং যাহাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সে ব্যক্তি সেই কার্য্য যথা রীতি করিতেছে কি না তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। প্রতিদিন যে ব্যক্তির দ্বারা যত দূর কার্য্য হওয়া সম্ভব তাহা হইল কি না এবং যদি তাহা না হইয়া থাকে, তজ্জন্য উহাদিগকে বিশেষ ভাবে শাসন করা আবশ্যক। কার্য্য কালে উহাদিগকে অতি তীব্রভাবে দেখিতে হইবে এবং অপর সময়ে উহাদিগের সহিত স্নেহভাবে আচরণ করা উচিত। এক সময়ে উত্তাপ ও অন্য সময়ে শীতলতা সংসারের নিয়ম। সততই কঠোর ভাবে শাসন করিলে উহারা বিরক্ত হয় এবং সাধ্যমত প্রভুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা পায়।

মিতব্যয়িতা।

ইতি পূর্ব্বে মূলধনের কথা বলা গিয়াছে কিন্তু ইহার সহিত মিতব্যয়িতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এ প্রস্তাবে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। সকল ব্যবসায়েই ক্ষতি ও লাভ আছে; কৃষি কার্য্য সে নিয়মের বহির্ভূত নহে এবং এই ক্ষতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যে টাকা মোট আদায় হয়, তাহা হইতে খরচ বাদ দিয়া যে টাকা হস্তে মজুত থাকে তাহাকে লাভ কহে; আর খরচের টাকা যদি মোট আমদানি হইতে সঙ্কুলান না হয় তবেই জানিতে হইবে যে ক্ষতি হইয়াছে এবং সঙ্কুলানের জন্য যে পরিমান টাকা অনাটন পড়িবে, তত টাকা ক্ষতি হিসাবে খরচ লিখিতে হইবে। খরচের সমান আমদানি হইলে, লাভ বা লোকসান কিছুই বলা যায় না। বলা বাহুল্য, নিয়মিত খরচের সহিত নিজের পরিশ্রমিক বলিয়া একটা বিবেচনামত মাসিক টাকা খরচ লিখিতে হইবে, কিন্তু সেই টাকা যথেচ্ছা মত লিখিলে চলিবে না। চাষ ও মূল ধনের পরিমানানুসারে ক্ষেত্রে কার্য্য তত্বাবধারণের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে মাসিক যে পরিমান বেতন দেওয়া উচিত নিজের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কিছুতেই অধিক হওয়া কর্ত্তব্য নহে। নিজের টাকা, নিজের ক্ষেত্র, নিজের কার্য্য ভাবিয়া যিনি যথেচ্ছাভাবে অপরিমিত অর্থব্যয় করেন তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন।

লাভ ও দুই প্রকারে হইয়া থাকে;—প্রথমত নিত্য পরিমিত ব্যয় দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ আমদানি হইতে খরচ বাদ যে

টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাহার দ্বারা। সামান্ত বিষয়েও পরিমিত ব্যয় প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উহার দ্বারা মাসে দশটাকা হিসাবে বাঁচাইতে পারিলে একবৎসরে ১২০৲ টাকা লাভ থাকে অথবা মূল ধনে মজুত থাকে। সেই ১২০৲ টাকায় ৫।৬ বা ৭ বিঘা অতিরিক্ত জমি আবাদ হইতে পারে। ক্ষেত্রের নিমিত্ত এক—কালিন, বার্ষিক, মাসিক বা দৈনিক যে কিছু খরচ হইবে তাহা অতিশয় বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। প্রতি টাকায় যদি এক পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত বা অন্যায় খরচ হয় তাহা হইলে একশত টাকায় ১৷৵৹ আনা হয় এবং সেই ১৷৵৹ আনায় বলদের খাইবার বা ক্ষেত্রে সার দিবার এক মণ খইল খরিদ করা যাইতে পারে। অপব্যয় কিন্তু লোকে জানিতে পারে না, ইহা সচরাচর অজ্ঞাতসারে হইয়া থাকে তবে চেষ্টা করিলে যে বুঝিতে পারা যায় না তাহা নহে। হয়ত ক্ষেত্রের জন্য কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হইল, তখন দেখিতে হইবে, উহার স্থানীয় ও সাময়িক মূল্য কত? যদি স্থানীয় অপেক্ষা কিয়দ্দূর স্থিত সহরের বাজারে উহার মূল্য সুলভ বোধ হয়, তবে শেষোক্ত স্থান হইতেই আনাইয়া লওয়া উচিত; ইহাও দেখিতে হইবে যে ক্ষেত্রের একজন লোক পাঠাইলে যে হিসাবে ক্ষেত্রের ক্ষতি হইল সেই সামগ্রী অপরস্থান হইতে আনিলে সে ক্ষতি পূরণ হইয়াও ক্ষেত্রের কিছু লাভ আছে কি না; যদি কিছু লাভ না থাকে স্থানীয় সামগ্রীই ক্রয় করা উচিত অথবা এরূপ কোন ব্যক্তিকে পাঠান উচিত যাহার অনুপস্থিতিতে ক্ষেত্রের কোন ক্ষতি না হয়। সাময়িক দরের অর্থ এই যে, যে সামগ্রী খরিদ করিতে হইবে তাহার আশু প্রয়োজন না থাকিলে, যে সময়ে

উহার মূল্য সুলভ হয়, সেই সময়ে খরিদ করা উচিত। অনেকে ক্ষেত্রের সমুদায় ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলেন, এমন কি বীজ পর্য্যন্ত ও রাখেন না, তাহাতে হয় এই যে, পুনরায় আবশ্যক কালে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, অথবা কর্জ্জ করিয়া লইলে এক মোনের পরিবর্ত্তে দুই মণ দিতে হয়।

ক্ষেত্রের জন্য কোন সামগ্রীই খুচরা খরিদ করা উচিত নহে, ইহাতে অধিক খরচ পড়িয়া যায় এবং জিনিস ও ভাল পাওয়া যায় না। নিত্য হইতে সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক হইতে মাসিক এবং মাসিক হইতে বার্ষিক খরিদ করায় লাভ আছে। মোট কথা, যত অধিক পরিমানে জিনিষ খরিদ করা যায় ততই সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

ক্ষেত্রে যখন ঠিকা লোক নিযুক্ত করিতে হইবে তখন বাজার দর কি জানিতে হইবে এবং যদি তখন সুবিধাজনক বোধ হয় তবেই সে সময়ে লাগাইতে হইবে নতুবা বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত অতিরিক্ত দরে নিযুক্ত করিলে ক্ষেত্রের অর্থের অপব্যয় হইল। ঠিকা লোকের দর সময়ে সময়ে সুলভ হয় আবার অন্য সময় মহার্ঘ হয়। এক সময়ে দেখা যায় প্রতি টাকায় ৮ জন লোক পাওয়া যায় আবার এক সময়ে হয়ত ৪ জন পাওয়া কঠিন সুতরাং নিজের আবশ্যকের গুরুত্ব বুঝিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে লোক নিযুক্ত করিবে।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ও মিতব্যয়িতার সংস্রব আছে, এজন্য ক্ষেত্রের তারতম্য ও সুবিধার সহিত মূল ধনের সামঞ্জস্য রাখিয়া ভূমি নির্ব্বাচন করা উচিত। কঠিন, জঙ্গল যুক্ত, পতিত ও অনুর্ব্বরা জমিতে আবাদ করিতে অপেক্ষাকৃত খরচ অধিক লাগে

কিন্তু আবাদী ও উর্ব্বরা জমিতে অনেক অল্প খরচে হয়। আবার সহরের জমিতে যে পরিমানে খরচ পড়ে, মফঃস্বলের বা পল্লিগ্রামের জমিতে তত পড়ে না, তাহার কারণ এই যে, সহরের জিনিষ পত্র মহার্ঘ, তন্নিবন্ধন লোকের খরচ অধিক, সুতরাং অধিক মজুরী না লইয়া লোকে কাজ করিতে পারে না। পল্লি-গ্রামের সকল সামগ্রীই অপেক্ষাকৃত সস্তা বশতঃ লোকের মজুরী ও সুলভ, এজন্য সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে কৃষিকার্য্য করাই যুক্তি-সঙ্গত। যেখানে লোকের মজুরী অধিক, জমি খারাপ ও নানা অসুবিধা সে রূপ স্থানে চাষ বাস করিতে গেলে বহুব্যয়ের সম্ভাবনা।

ক্ষেত্র জাত কোন দ্রব্যই অপদার্থ নহে; কৃষি কার্য্যে আবর্জ্জনারও মূল্য আছে। শস্যাদি মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া লইলে যে আবর্জ্জনা থাকে এবং গোয়াল ঘরের গোময় ও মূত্র, ক্ষেত্রের তৃণ, জঙ্গল, পুষ্করণীর শেওলা, প্রভৃতি কোন দ্রব্য নষ্ট না করিলে সারের অনেক সাশ্রয় হইয়া থাকে। এই সকল আবর্জ্জনা ক্ষেত্র মধ্যে ছিটাইয়া বা জ্বালাইয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় ও তখন অন্য সার অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে দিলেই চলিতে পারে।

কার্য্যশৃঙ্খলতার সহিত মিতব্যয়িতার সম্বন্ধ আছে। লোক-জন অলসভাবে না কাল কাটায়, অথবা যে কার্য্যের আবশ্যক নাই এরূপ কার্য্যে অনর্থক সময় অতিবাহিত না করে কিম্বা এক দিবসের কার্য্য দুই দিবসে অথবা এক বেলার কার্য্য দুই বেলায় সম্পন্ন করিয়া সময় ব্যয় না করে, এ সকলও ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষ লক্ষ্যণীয়। আটজন লোকে সমস্ত দিন মধ্যে এক ঘণ্টার হিসাবে

অপর্ব্যয় করিলে ক্ষেত্রের একজন লোক কামাই হইল কিম্বা অর্থবিষয়ে দুই আনা হইতে চারি বা পাঁচ আনা ক্ষতি হইল। এ সকল বিষয় সামান্য মনে করা উচিত নহে; তিল তিল এক্‌-ত্রিত হইলে তাল হয়, পরমাণুর সমষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে পরিমিত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক, খরচ পত্র করিতে পারিলে তবে কৃষিকার্য্যে লাভ আছে।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জমির সহিত ভাবি কৃষকের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা স্থির থাকা উচিত। অনেকে জমি ইজারাবন্দোবস্তে, অনেকে মৌরসী, অনেকে যোতসত্ব, আবার অনেকে ঠিকা বন্দোবস্তে জমীদারের নিকট হইতে জমি লইয়া কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। মৌরসী ও জোত বন্দোবস্ত ব্যতীত অপর কোন বন্দোবস্ত আমাদিগের সুবিধাজনক মনে হয় না এবং এতদুভয় অভাবে ইজারা বন্দোবস্ত ভাল। উপরোক্ত কয়েক প্রকার বন্দোবস্তের মধ্যে কোন্‌টার সহিত প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা যাউক।

বার্ষিক কোন নির্দ্দিষ্ট হারে জমীদারকে খাজনা দিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়, তাহাকে মৌরসীসত্ব কহে। প্রজা অনায়াসে উক্ত জমিতে যথেচ্ছারূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন, পূর্ব্বস্থিত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিতে পারেন, পাকা ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন, এবং অপরকেও বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন অথবা উক্ত জমি পুত্রপৌত্রাদি চিরদিন যথেচ্ছাক্রমে ভোগ দখল করিতে পারেন। জমীদার সে জমি কাড়িয়া লইতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত মৌরস-সত্ব বিশিষ্ট জমির অনেক সুবিধা আছে।

জোতসত্বে জমীদারের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। জমীদারকে বার্ষিক কোন নির্দ্দিষ্টহারে খাজনা দিয়া জোত লইতে হয়। প্রজা যাবৎ নিয়মিতভাবে জমির খাজনা দাখিল করিবে, তত দিন জমীদার উক্ত প্রজার 'জোতসত্ব' কাড়িয়া লইতে পারেন না।

কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য নির্দ্দিষ্টহারে জমীদারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইলে, তাহাকে ইজারা লওয়া কহে। নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং পুনরায় যাবৎ না নূতন বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যায়, প্রজার তাহাতে আর কোন সত্ব থাকে না। নূতন বন্দোবস্তে জমীদার উহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে অথবা অপর ব্যক্তিকেও দিতে পারেন।

ঠিকা জমার কিছুই স্থির নাই। জমীদারের আবশ্যক হইলেই তিনি উহা প্রজার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে অথবা জমীর হার বৃদ্ধি করিতে পারেন।

জমি-জমা সম্বন্ধে জমীদারী মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে তাহা আমাদিগের জানিবার তত আবশ্যক নাই; তবে কয়েকটী বিষয় যে আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষিকার্য্যের জন্য যে কয়েকটী বিষয় বিবেচ্য ও কৃষক মাত্রেরই জানিয়া রাখা উচিত, তাহা অপরের সাহার্য্য ব্যতীত, এই পুস্তক পাঠেই মোটা মোটী জ্ঞান জন্মে।

জমির উপর বিশেষ অধিকার ও স্থায়ী সত্ব না থাকিলে তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে লোকের ইচ্ছা হয় না এবং জমির প্রতিও প্রজার অনুরাগ জন্মে না। দুই পাঁচ বৎসরের জন্য যে জমি লওয়া যায়, তাহাতে কোন ব্যক্তি প্রাণপণ

চেষ্টাদ্বারা ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে প্রস্তুত ? নূতন জমি লইয়া, তাহাকে দুরস্ত ও তৈয়ার করিতেই বহুব্যয় হয় এবং ইহাতেই প্রায় দুই তিন বৎসর কাটিয়া যায়, তখন, পরের জন্য এতদূর করিয়া যাইবার প্রয়োজন কি ? অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া যদি তাহার উপসত্ব ভোগ না হয়, তবে জানিয়া শুনিয়া সে কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করে ? আবার জমির উন্নতি না করিলেও কৃষিকার্য্যে লাভ হয় না। সুতরাং জমিতে স্থায়ী কোন সত্ব থাকা আবশ্যক। একজন জমি পরিষ্কার করিয়া, হলচালনা ও সারপ্রয়োগদ্বারা মাটি তৈয়ার করিল, অন্য দিকে অপর একজন সেই জমির উপর লোলুপ হইয়া জমীদারের নিকট হইতে অধিক হারে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া উহা লইল ; অথবা একজন প্রজা জমি হইতে বেশ লাভবান হইতেছে দেখিয়া জমীদার স্বয়ংই তাহার হার বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন এবং এ প্রস্তাবে সে ব্যক্তি সম্মত না হইলে, অপর ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অল্পমিয়াদি জমির এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু অধিককালের মিয়াদ থাকিলে অথবা জমিতে স্থায়ী সত্ব থাকিলে প্রজা স্বইচ্ছায় তাহার উন্নতি করিয়া থাকে এবং অধিককাল একই জমিতে থাকায় জমির প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মে ও তখন সে ব্যক্তি ততোধিক যত্ন সহকারে ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা রাখিতে চেষ্টা পায়। যাহারা ঠিকা নিয়মে জমি লয়, তাহারা উহার উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং উহাতে এরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়া লয় যে, পরে সে জমি একবারে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর নূতন জমি লইয়া তাহারা ক্ষেত্রের অনিষ্ট করে! ইহাতে জমীদারের ও বিশেষ ক্ষতি হয়, কেন না জমি অনুর্ব্বরা

হইলে তাহার হার কমিয়া যায়, কিন্তু ইঁহাদের সে বিষয়ে অতি অল্প দৃষ্টি। এই সকল অত্যাচার ও অসুবিধা হয় বলিয়া আমরা ঠিকা বা অল্প দিনের ইজারার পক্ষপাতী নহি। মৌরস, তদভাবে যোতসত্ব লইয়া কৃষি কার্য্য করা উচিত কিম্বা অধিক দিনের জন্য ইজারা লইলে ও চলিতে পারে। ইজারা দশ বৎসরের ন্যূন না হয়। নিজস্ব খরিদ জমি হইলে ত কোন কথাই নাই।

স্থান ও মৃত্তিকার তারতম্যানুসারে খাজনার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। সহর বা সহরতলীর খাজনা অতিরিক্ত। কলিকাতার ন্যায় সহরে একবিঘা জমির খাজনা ন্যূন কল্পে ৪০৲ টাকা কিন্তু কলিকাতর উত্তর সহরতলি কাশিপুর অঞ্চলে প্রতিবিঘায় মোটজমা ১৮।২০৲ টাকা। মফঃস্বলের খাজনা ইহাপেক্ষা অনেক কম। অতিদুর ও অগম্য স্থানে জমির খাজনা ৵০ কি ।০ আনা এবং যতই গ্রামের নিকটস্থ হওয়া যায় ততই জমির খাজনা বেশী দেখা যায়। সচরাচর আবাদী জমি ১।২।৩৲ টাকার অধিক প্রায় হয় না। সহর বা সহরতলী চাষবাসের উপযোগী নহে।

আবার শস্যশালিনী উর্ব্বরা ও আবাদী জমির যে খাজনা, ডোবা, অনুর্ব্বরা ও পতিত জমির খাজনা তাহাপেক্ষা অনেক কম। নিকৃষ্ট ও অনুর্ব্বরা জমিতে আবাদ করিতে হইলে অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম না করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না; অন্যদিকে ডোবা জমির উপর নির্ভর করা উচিত নহে, কেন না বর্ষাধিক্য হইলে অথবা বন্যা আসিলে সমুদায়ই পণ্ড হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বা মৌরসীসত্বে যদি খারাপ জমি ও প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে আমাদের মতে ইহাই ভাল, নতুবা উর্ব্বরা জমি

মধ্যবিৎ হারে লওয়া উচিত। প্রতিবৎসর যখন জমিদারকে খাজনা দিতে হইবে, তখন নিজের ক্ষমতানুযায়ী হারের বন্দোবস্তে জমি লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। প্রতি বৎসরই যে সচ্ছলের সহিত চাষবাস হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই এজন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতার আবশ্যক।

জমি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আরো একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিতে বাকি আছে। জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত জমি যেন সহরের সন্নিকটে হয়,—সে স্থান হইতে রেল পথ অধিক দূরে না হয়,—অথবা নদী নিকটে হয়,—সে স্থান হইতে শকটাদি চলাচলের রাস্তা থাকে, ক্ষেত্র কার্য্যেরজন্য লোকজন পাওয়া যায় ইত্যাদি। অল্প বিস্তর এ সকল সুবিধা যে খানে দুর্ল্লভ এরূপ স্থান একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। সে স্থানে গমনাগমনের রাস্তা নাই, রেল পথের সহিত সংশ্রব নাই, নদীতে যাতায়াতের সুবিধা নাই, শ্রমজীবি গণের অভাব, এরূপস্থলে কৃষি কার্য্য দ্বারা লাভবান হইবার আশা অতি অল্প। জঙ্গল মধ্যে ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইলে, তথাকার শস্য বা ফসল বিক্রয়ের উপায় নাই, ক্ষেত্রের কোন আবশ্যকীয় জিনিষ বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়, এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্য সহরে পাঠাইতে হইলে যদি খরচ অধিক পড়ে, তাহা হইলে লাভ কম হইবে। লোকে ব্যক্তি বিশেষের খরচ দেখিয়া সামগ্রী খরিদ করে না, বাজারে জিনিষের যে দর সেই দামেই লইয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি অল্প খরচায় বাজারে মাল আনিয়া হাজির করিতে পারে, সে অল্পলাভে তাহা বিক্রয়

করিতে পারে, কিন্তু অপর ব্যক্তি তাহা পারেনা বলিয়া তাহার জিনিষ বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয় হইলে ও ক্ষতি হয়। আর এক কথা, সহর নিকটে হইলে অথবা মাল চালানের সুবিধা থাকিলে বাজারের অভাবানুসারে যখন ইচ্ছা তখনই মাল চালান দিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের সামান্য অভাবের উপর নির্ভর করিয়া বিস্তৃতভাবে কৃষি কার্য্য চলে না, কেন না ক্ষেত্রের যাবতীয় উৎপন্ন ফসল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হওয়া সম্ভব নহে, কিম্বা হইলে ও সে রূপ দর পাওয়া যায় না। তাহার পরে লোকালয় বর্জ্জিত স্থানে ক্ষেত্র থাকিলে বিদেশ হইতে লোক আমদানী না করিলে ক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন অথচ বিদেশ হইতে লোক আমদানী করিতে খরচা আছে, এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে স্থানীয় লোকদিগের অপেক্ষা অধিক বেতন দিতে হয়। স্থানীয় লোক পাওয়া গেলে অল্প হারে বেতন দিলেই চলে এবং সন্নিকটে লোকালয় হইলে আবশ্যকমত সময়ে সময়ে অতিরিক্ত লোকও পাওয়া যায়। ফসলের সময় অতিরিক্ত ঠিকা মজুর প্রায়ই আবশ্যক হয়, কিন্তু সে সময়ে যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে কেবল ফসল নষ্ট হয় তাহা নহে, উহার জন্য ইতিপূর্ব্বে যে ব্যয় হইয়াছে তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সহরের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও, আমরা সময়ে সময়ে বড়ই লোকাভাব অনুভব করিয়াছি এবং তাহাতে অনেক সময়ে ফসল গৃহ জাত করিতে না পারায় বিশেষ ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছি।

ক্ষেত্রস্বামীর কৃষিশিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের উপায়।

কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া যেমন ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা যায় না, অথবা স্বকপোল কল্পিত প্রণালীতে যেমন যোগ সাধন হয় না, সেইরূ কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারা অথবা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলে কৃষি বিষয়ে পারদর্শিত জন্মে না। কৃষি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ক নানাবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা পাঠ, কৃষিকার্য্যনিরত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষেত্রের সমুদায় কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। পুস্তকাদি পাঠকালে, ব্যক্তি বিশেষের সহিত আলাপকালে, অথবা ক্ষেত্রকার্য্য মধ্যে যাহা কিছু আবশ্যকীয় ও সার বলিয়া মনে হইবে, তাহা একখানি সতন্ত্র বহিতে লিখিয়া রাখিলে, অনেক সময়ে কার্য্যে আসিয়া থাকে। এই কারণে ক্ষেত্রে একখানি খাতা রাখিতে হইবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাতে ক্ষেত্রের সারা-দিবসের কার্য্য এবং কোন কার্য্য কোন প্রণালীতে সমাধা করা গেল ইত্যাদি সবিশেষ লিখিতে হইবে। যে দিবস যে কার্য্য হইল, তাহার তারিখ লিখিয়া না রাখিলে উহার মূল্য অতি অল্প। এসকল বিষয় যতই তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারা যায় ততই ভাল, কেন না অভিজ্ঞতা লাভের এমন সহজ উপায় আর নাই। অদ্যকার অভিজ্ঞতার দ্বারা কল্যকার, সম্বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা পরবৎসরের কার্য্যের অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। কোন ফসলে কিরূপ পা'ট করাতে কিরূপ ফল হইয়াছে এবং

তাহাতে যদি অনাবধানতা বশতঃ কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পর বৎসর সাবধান হওয়া যাইতে পারে ;—কোন ফসলের বিশেষ পা'ট হেতু তাহার পরিমান বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে অথবা অন্য কোন বিশেষত্ব দেখা যাইলে, পর বৎসর তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। নোট বুক হইতে এইরূপ নানাবিধ উপকার লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু লিখিয়া না রাখিলে নানকার্য্য ও নানা চিন্তা বশতঃ সকল কথা সকল সময়ে মনে আইসে না, সুতরাং জ্ঞাত থাকিলেও সে অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন ফল হয় না।

কৃষক বা কৃষিকার্য্য নিরত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়। উভয়ে কৃষিবিষয়ক কথা বার্ত্তা হইতে হইতে পরস্পরের অভিজ্ঞতা একত্রিত হয় এবং যাহার যে দোষ থাকে তাহাও মীনাংসা হইয়া যাইতে পারে, অথবা অপর ব্যক্তি কোন বিশেষ প্রণালী অবলম্বন দ্বারা যদি সফল হইয়া থাকে, তবে অন্যব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্রে তাহা পরিক্ষা করিতে পারেন। আমি যাহা করিতেছি, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে ঠিক ও নির্ভুল ইহা মনে মনে ধারণা করিয়া রাখা আত্মম্ভরী ব্যক্তির কার্য্য। চাষীগণের সহিত আলাপ করিয়া বা তাহাদের কার্য্যানুসরণ দ্বারা অনেক মহামূল্য জ্ঞান পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাদিগকে নিরক্ষয় বা ইতর ভাবিয়া ঘৃণা করিলে নিজেরই ক্ষতি, বরং তাহাদিগের সহিত এমনই সদ্ভাব রক্ষা করা উচিত যে, সে ব্যক্তি তোমার নিকটে আসিয়া নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। চাষীও তোমার নিকট অনেক কাজের কথা শুনিয়া গিয়া নিজের ক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষা

করিতে পারে। এইরূপ সম্মিলনে উভয়েরই লাভ আছে। আমরা কৃষিকার্য্যে নাম লিখাইয়াছি বটে, কিন্তু সেই নিরক্ষর চাষীদিগের নিকট হইতে আমাদিগের অনেক বিষয় শিখি-বার আছে।

পূর্ব্বে যে খাতার কথা বলা গিয়াছে, তাহার আকার এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহাতে সম্বৎসরের কার্য্যবিবরণ লিখিত হইতে পারে। প্রতি বৎসরেই নূতন খাতা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যের নূতনখাতা আরম্ভের জন্য বৈশাখ মাসই প্রশস্ত, কেন না এই সময় প্রায় ক্ষেত্রে কোন সাবেক ফসল থাকে না এবং নূতন ফসলের জন্য সমুদায় জমি আবাদ হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ যখন ধান্যের উপর নির্ভর করে এবং সেই ধান্যাদি প্রধান ফসলের আয়োজন এই সময়েই হইয়া থাকে, তখন বৈশাখ মাসই ক্ষেত্রের নূতন খাতা আরম্ভ উচিত। উল্লিখিত বহিদ্বারা আর একটী উপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ফসলের লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতে হইলে, উহার মধ্যে কিয়দংশ স্বতন্ত্র রাখিয়া, কোন ফসলে কত মজুরী পড়িল, কত টাকার সার দেওয়া গেল এবং তাহার উৎপন্নের মূল্য কিরূপ হইল, এ সকল লিখিয়া রাখিলে ফসলান্তে বুঝা যায় যে, ইহাতে কি পরিমাণে লাভ বা ক্ষতি হইল এবং অবশেষে যদি দেখা যায় যে, উহাতে লাভ হইয়াছে তবেই পুনরায় সে ফসল আবাদ করা উচিত, নতুবা উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, উহার চাষে কোনরূপ অন্যায় পাইট বা খরচ হেতু ক্ষতি হইল কি না? যদি অন্যায় পা'ট বা ব্যয় হেতু ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে ভবিষ্যতে সেরূপ

যাহাতে না হইতে পারে, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। আর যদি এ সকল কারণাভাব সত্ত্বেও ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে স্থানীয় মৃত্তিকা বা জল-হাওয়া ফসল বিশেষের উপযোগী নহে জানিয়া উহার চাষ আর না করাই ভাল।

সাধারণ জমা খরচের বহি যে একখানি থাকিবে এ কথা বলা বাহুল্য। ইহাতে ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় খরচ ও আয়ের বিষয় লিখিতে হইবে। অনেকে মজুত ফসল, অথবা স্বীয় খরচের জন্য যে ফসল লইয়াছেন, তাহা জমাখরচের বহির মধ্যে লিখিতে রাজি নহেন। কিন্তু আমাদিগের মতে তৎসমুদায়েরই ইহাতে স্থান পাওয়া উচিত। বৎসরের শেষে ক্ষেত্রে বা গুদামে যে পরিমাণ ফসল মজুত থাকে তাহার একটী মূল্য ধার্য্য করিয়া যেমন জমা খাতে লিখিতে হইবে, তদ্রূপ ক্ষেত্রস্বামী স্বীয় খরচের জন্য যে পরিমাণ ফসল সম্বৎসরে লইয়াছেন, তাহারও একটা মূল্য স্থির করিয়া জমা খাতে লিখিতে হইবে এবং ক্ষেত্রস্বামীর নামে উহা কর্জ্জ লিখিতে হইবে অথবা তাঁহার মাসিক পারিশ্রমিক বা বরদারী হইতে সেই টাকা বাদ দিতে হইবে। অতি সামান্য সামগ্রীও যদি ক্ষেত্রস্বামী স্বয়ং লয়েন অথবা অপরকে দিয়া থাকেন, তাহারও মূল্য আদায় হইয়া খাতায় জমা পড়া উচিত। নগদ না হইলে ও খাতায় উহার জমা খরচ দেখাইতে হইবে। তাহা হইলেই ক্ষেত্রের প্রকৃত আয় ব্যয় বুঝা যাইবে।

পুস্তক বা সাময়িক পত্রিকা পাঠ বা লোকের সহিত আলাপ দ্বারা যে নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, ক্ষেত্র মধ্যে প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যাহা নূতন জ্ঞাত হওয়া গেল, তাহা কিরূপ মৃত্তিকায়, কিরূপ সারে বা কোন

অবস্থায় অপরের নিকটে সুবিধাজনক হইয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে ক্ষেত্রস্বামীর পক্ষে সুবিধা হইবে কি না, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য নানা বিষয়, যাহা ক্ষেত্রস্বামী জ্ঞাত নহেন, তাহা স্বীয় ক্ষেত্রে প্রচলন করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার জন্য এক বা দুই বিঘা জমিকে সমভাবে খণ্ড—বিভাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক খণ্ডে সতন্ত্রভাবে পা'ট করিয়া ফসল-বিশেষ পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষার ফল যদি আশাপ্রদ হয়, তবেই উহা পর বৎসর ক্ষেত্রে প্রচলন করা উচিত নতুবা সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কোন ব্যক্তি জমিতে চূণ দিয়া অনেক ফসল পাইয়াছে কিন্তু চূণের গুণ ও কার্য্য জ্ঞাত না থাকিলে, জমীর অনাবশ্যকতা সত্বে অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে চূন দিলে মৃত্তিকা ও ফসল জ্বলিয়া যায়। এইরূপ অনেক ক্ষতি হয় সুতরাং পরাক্ষা না করিয়া কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। পরীক্ষাক্ষেত্র অধিক প্রশস্ত করিবার আবশ্যক নাই, কেন না, উহা কেবল নিজের সন্তোষের জন্য, উহা হইতে আর্থিক লাভের প্রত্যাশা নাই।

পরীক্ষাক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন স্থানে না হইয়া একই স্থানে একখণ্ড জমিকে ভিন্ন ভিন্ন উপখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ইচ্ছামত পরীক্ষার সূচনা করা উচিত। পরীক্ষাকালে যে যে উপখণ্ডে যে প্রকার পা'ট করা হয়, যে সার দেওয়া হয়, বা যে ফসল দেওয়া হয় তাহা সবিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত। পরীক্ষার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেক খণ্ডের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা যথা সময়ে ও যথা নিয়মে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। মনে করুন, বাঙ্গালা দেশে বক্সারের গম আবাদ করিতে হইবে, সে স্থলে

প্রথমত ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে যে, ঐ গম এ দেশে জন্মিতে পারে কি না, এবং পারিলেই বা তাহার উৎপন্ন কিরূপ হইবে, তাহাতে খরচ পোষাইতে পারে কি না, কিরূপ জমি আবশ্যক, এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকের জন্য এক এক টুকরা জমি দিতে হইবে। এজন্য ছয় উপখণ্ড জমি লইয়া প্রথম খণ্ডে দেশী গম, দ্বিতীয় খণ্ডে বক্সার গম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমখণ্ডে সতন্ত্র সতন্ত্র সার দিয়া এবং ষষ্ঠ খণ্ডে জল সেচন দ্বারা শেষোক্ত গম কিরূপ জন্মে তাহা দেখিতে হইবে। প্রথম দুই খণ্ডের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সহজ চাষে দেশীয় অপেক্ষা বকসারের গম ভাল কি মন্দ জন্মে; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ওপঞ্চম খণ্ডের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, বিনা সারে ও সার প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমান ও গুণের কি প্রভেদ হয়; তৎপরে দ্বিতীয়ের সহিত ষষ্ঠের তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, বিনা জল সেচনে ফসলের কি প্রভেদ হয়। ইহার মধ্যে যে যে প্রণালী সফল বোধ হইবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত, নতুবা বক্সার গমের কথা শুনিয়াই ১০০ বিঘা জমিতে ইহারই আবাদ করা গেল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। এরূপ ব্যর্থমনোরথ হওয়া অপেক্ষা ধীর ভাবে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিলে, অর্থ ও পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা।

ক্ষেত্রের জন্য স্থান নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অপরাপর বিষয় বিবেচনার সহিত মৃত্তিকার অবস্থাও পরীক্ষা করা নিতান্ত

আবশ্যক। তাড়াতাড়ি পূর্ব্বক যথেচ্ছা ও যে সে প্রকারের জমি লইলে ভবিষ্যতে হয়ত পরিতাপ করিতে হয়। যদি কোন বিশেষ ফসলের আবাদ করিবার অভিপ্রায় ইতিপূর্ব্ব হইতেই মনে মনে সঙ্কল্প থাকে, তাহা হইলে সেই ফসলের স্বভাবোপযোগী মৃত্তিকা বিশিষ্ট জমি লইয়া কার্য্যারম্ভ করা উচিত, নতুবা সেই জমিকে তদুপযোগী করিয়া লইতে অতিরিক্ত খরচ পড়ে। পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত যদি কোন অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ চাষের জন্য এরূপ জমি লইতে হইবে, যাহাতে ইচ্ছামত সকল প্রকার চাষই হইতে পারে, কিন্তু বলাবাহুল্য যে সকল ফসলই একপ্রকার মৃত্তিকায় সুচারু রূপে জন্মে না। কোন ফসল এঁটেল, কোন ফসল দো-আঁশ; আবার কোন ফসল বা বেলে মাটীতে সুন্দর রূপে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মধ্যবিৎ অর্থাৎ দো-আঁশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট জমি লইতে পারিলে সুবিধা, কারণ ইদৃশ জমি অনায়াসে মনোমত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এঁটেল জমিকে হাল্‌কা করিবার আবশ্যক হইলে, তাহাতে ছাই, উদ্ভিজ্জাবশিষ্ট বা চুণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। উক্ত জমিকে দো-আঁশ করিতে হইলে উহার সহিত বালি মিশ্রিত করিতে হয়; দো-আঁশ মাটীকে এটেল করিতে হইলে, পুরাতন গোবর সার বা অধিক পরিমাণে এটেল মাটি মিশাইয়া দিতে হয়। আবার বেলে-জমিকে উদ্ধার করিতে হইলে তাহাতে পুষ্করণী খোদিত মাটি, অথবা এঁটেল মাটি সংযোজিত করিলে উপকার হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে চতুষ্কোণবিশিষ্ট তিনহাত গভীর করিয়া গর্ত্ত খনন করিতে হয়। খোদিত গর্ত্তের

পার্শ্বদেশ দেখিলে ভূগর্ভের অবস্থা বুঝা যায় ও ভিতরে যে ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকার স্তবক দেখা যায়, অভিজ্ঞতা থাকিলে তদ্দৃষ্টেই জমির ভিতরের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। শ্বেত স্তবক দ্বারা বালি, হরিদ্রাভ স্তবকদ্বারা দোয়াঁশ এবং কৃষ্ণবর্ণ স্তবকদ্বারা এঁটেল মাটী বুঝা যায়। বালি বা কঙ্কর ব্যতীত যদি নিম্নদেশে একই স্তবকে দোআঁশ বা এটেল মাটী থাকে তবে আমাদের মতে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এরূপ চোরা-জমি অনেক আছে, যথাকার উপরিভাগের কিয়ৎপরিমাণ অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত পরেই বালি বা কঙ্কর দৃষ্টিগোচর হয়। এই জন্য জমি গভীররূপে গর্ত্ত খনন করিয়া ভিতরের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পরীক্ষা না করিয়া জমি নির্ব্বাচন করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

উল্লিখিত প্রণালীতেও যদি কিছু স্থিরীকৃত না হয়, তবে কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকা লইয়া উহা ওজন করিবার পরে প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে পুনরায় ওজন করিলে পূর্ব্ব ওজন অপেক্ষা কম হইবে এবং যে পরিমাণ কম হইল, তাহাই মৃত্তিকার আর্দ্রতা ধরিতে হইবে। অনন্তর সেই শুষ্ক মৃত্তিকা কোন লৌহ বা অন্য পাত্রে রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপরে ক্ষণকাল রাখিলে তন্মধ্যস্থিত দাহ্য পদার্থ পুড়িয়া যাইবে। তখন উহা তৃতীয় বার ওজন করিলে দ্বিতীয় বারের ওজন হইতে কম হইবে এবং এই কমের পরিমাণকে দাহ্যপদার্থের পরিমাণ জানিতে হইবে। তৎপরে ইহাকে জলের সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া এক মিনিটকাল স্থিরভাবে থাকিতে দিলে, বালির অংশ পাত্রের নিম্নে স্থাপিত হইবে এবং ভাসমান সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ অন্য পাত্রে ঢালিয়া উক্ত বালিকে শুষ্ক করতঃ ওজন করিলে

বালির অংশ স্থির হইবে ও তৃতীয়বারের ওজনের সহিত তুলনা করিলে, ইহার যে পরিমাণ কম হইবে, তাহাই কর্দ্দমের (clay) অংশ জানিতে হইবে।

মৃত্তিকার সহিত যে চূণের অংশ থাকে তাহা জানিতে হইলে, উল্লিখিত তৃতীয় অবস্থার একশত গ্রেণ পোড়া মাটী লইয়া তাহাতে ৫ ছটাক জল ও সিকি ছটাক মিউরিয়াটিক এসিড্ (Muriatic acid) সহিত মিশ্রিত করিয়া কাচের পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা রাখিয়া দাও। উক্ত নির্দ্ধারিতসময় উত্তীর্ণ হইলে উহাকে বারম্বার উত্তমরূপে নাড়িয়া, কোন সুক্ষ্ম ছাঁক্‌নি দ্বারা ছাঁকিয়া, ছাঁক্‌নিস্থিত পদার্থ শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে যে পরিমান কম পড়িবে, তাহাই চূনের ভাগ। যে জমিতে অতিরিক্ত পরিমানে চূণ আছে বা আদৌ নাই, এ প্রকার জমি সুবিধা-জনক নহে।

অনেক জমি এরূপ আছে যথায় নানা কারণে কোন ফসল সুচারু রূপে জন্মিতে পারে না। লবনাক্ত জমি তন্মধ্যে প্রধান। ইদৃশ জমিকে চাষোপযুক্ত করিয়া লইতে অনেক খরচ হয়, এজন্য ইহা পরিত্যাগ করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু যাঁহারা পুঁথিগত কৃষিবিদ্যারিসারদ তাঁহারা মরুভূমিতেও চাষ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় যে, আমরা তাঁহাদের সহিত কোন মতে একমত হইতে পারি নাই। সে যাহা হউক, লবনাক্ত জমি চিনিয়া লইতে বড় বিলম্ব হয় না। গ্রীষ্ম কালে ইদৃশ জমির উপরিভাগে একরূপ লবনের ন্যায় শ্বেত পদার্থ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে, অথবা বৃষ্টির ক্ষণকাল পরে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, উহা জমির উপরিভাগে প্রকাশ পায়। এরূপ

জমিকে "উষর" বা "রে" জমি কহে। এরূপ জমিতে আবাদ করিতে হইলে যে প্রণালীতে উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহা ভিন্ন প্রস্তাবে আলোচনা করা যাইবে।

জমির উপরি স্তবকে অথবা অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে "বোদ" মাটী প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ কাল, এবং উঠাইলে কয়লার স্থায় হাল্‌কা বোধ হয়,—শুষ্কাবস্থায় অগ্নিতে দিলে জ্বলিয়া যায় ও জলে দিলে ভাসিতে থাকে। ইহাকে ইংরাজিতে (Bog earth) কহে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, দাহ্য পদার্থের সম্মিলনে উহা জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা গর্ভে যখন অবস্থান করে, তখন উহা অত্যন্ত ভিজা থাকে এবং শুষ্ক হইতেও বিস্তর সময় লাগে। বালির সহিত সংমিশ্রিত হইলে উহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্যোপযোগী নহে। অধিকন্তু ভিজা অবস্থায় ইহা এত আটাবৎ ও পিচ্ছিল যে, উহাতে কোন রূপ আবাদ করা চলে না। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে কাশিপুর ইনষ্টিটীউসনের উণ্টা-ডিঙ্গী ফারমে এইরূপ জমি বিস্তর পরিমানে পাওয়া গিয়াছিল এবং উহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অধুনা সেই মাটী কয়েক বৎসর চাষ ও সার সংযোগ দ্বারা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই রূপ জমি লইয়া আবাদ করা ধনী লোকের পক্ষে সম্ভব।

জলের বন্দোবস্ত।

ক্ষেত্রের মধ্যে জলের সুবন্দোবস্ত না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে সুতরাং যে ক্ষেত্র মধ্যে অথবা তাহার সন্নিকটে জল না পাওয়া যায়, তথায় সকল ফসলের আবাদ করা চলে না। ভাদুই ফসলে প্রায় জলের আবশ্যক হয় না; অনেক রবি শস্যও বিনা জলে হইয়া থাকে; কিন্তু ইক্ষু, আলু, গম, তুলা, নানাবিধ বিলাতি সবজী ও অন্যান্য অনেক ফসলের জন্য জলের বিশেষ আবশ্যক. জলহীন স্থানে এ সকল ফসল উৎপন্ন বা আবাদ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। সকল স্থানে বিশেষতঃ সুবৃহৎ ময়দান বা মেটো জমিতে প্রায় পুষ্করণী দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন জমির নিকট দিয়া কোন কোন নদী বা উপনদী গিয়াছে, কিন্তু বর্ষাতীত হইলে তাহার জল এতদূর নামিয়া যায় যে, তাহা ব্যবহারে আশা সুকঠিন। অতএব নদীর উপরে বিশেষ ভরসা রাখিয়া চায আবাদ করা উচিত নহে। অধিকন্তু নদী নিকটে থাকিলে শীত কাল হইতে গ্রীষ্ম কাল পর্য্যন্ত জমি নীরস হইরা থাকে, তাহার কারণ এই যে, ক্ষেত্রের সমুদায় রস নদী কর্তৃক আকর্ষিত হয় এবং নদীর জল শুষ্ক হইয়া যতই নিম্নে নামিয়া যায় ততই জমির রস হ্রাস হইতে থাকে।

পুষ্করণী মধ্যে জলাশয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন এবং উহা বিবেচনা মত বড় হইলে ভাল হয়। ক্ষেত্র মধ্যে জলের কোন সুবিধা না থাকিলে তন্মধ্যে পুষ্করণী খোদিত করা উচিত। ইহাতে ব্যয় আছে সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা যে বারমাস অপরি-

মিত সুবিধা লাভ হইবে, সে কথা বিবেচনা করিলে উক্ত ব্যয় অতি সামান্যই মনে হইবে। অনেকে পুষ্করণী খননকালে ইষ্টকের ভাটা করিয়া ইষ্টক পোড়াইয়া থাকেন, ইহাতে পুষ্করণী খনন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। এই রূপে যে ইষ্টক তৈয়ার হয়, তাহাতে ক্ষেত্রস্বামী নিজের ঘরবাটী নির্ম্মান করিতে অথবা বিক্রয় দ্বারা লাভবান হইতে পারেন।

ক্ষেত্রের এমন স্থানে পুষ্করণী খনন করিতে হইবে যে, সে স্থল সমুদায় ক্ষেত্রের মধ্যবিন্দু স্বরূপ হয় এবং গোয়াল বাটী ও বাঙ্গালার সন্নিকটে হয়। ক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে পুষ্করণীর আয়তন বা সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখিতে হয়। জমি সুদীর্ঘ হইলে পুষ্করণীও সুদীর্ঘ ঝিলের ন্যায় করিতে পারিলে ভাল হয়, নতুবা প্রতি ২৫।৩০ বিঘা জমির জন্য একটী পুষ্করণী আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া যতই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই কূপ বা ইঁদারা দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প মাত্র গভীর করিয়া মৃত্তিকা খনন করিলেই জল বাহির হইয়া থাকে, এজন্য এখানে লোকে কূপ খনন করে না। যে স্থানে জল দুর্ল্লভ ও ৪০।৫০ হস্ত গভীর না করিলে জল পাওয়া যায় না, সেই দেশেই কূপের প্রাদুর্ভাব। সে দেশের কৃষকেরা ইঁদারার জলেই চাষ আবাদ করিয়া থাকে।

ক্ষেত্রের মধ্যে যে স্থানের মৃত্তিকা এঁটেল ও গভীর এরূপ স্থানে পুষ্করণী বা ইঁদারা খনন করিলে উহাতে বার মাস জল থাকে। বেলে মাটীর উপরে যে জলাশয় তাহা অতি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

জলাশয়ের সহিত সমুদায় ক্ষেত্রের নালা দ্বারা এরূপ সংযোগ

রাখা উচিত যে, আবশ্যক হইলে যথা ইচ্ছা তথায় জল সেচন করিতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

সাধারণতঃ চাষীগণ ক্ষেত্রে জল সেচন করে না এবং পুরুষানুক্রমে অভ্যাস না থাকায়, তাহাদিগের এক প্রকার ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, ফসলে ছেঁচ দিবার আবশ্যকই নাই। চাষীরা যে জলের বিষয়ে উদাসীন তাহার দুইটী কারণ আছে;—প্রথমতঃ ক্ষেত্রমধ্যে জলের বন্দোবস্ত থাকে না, দ্বিতীয়তঃ জলাশয় খনন করিয়া লওয়া তাহাদিগের সাধ্যাতীত। মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা স্থানে গবর্ণমেণ্ট আজকাল খাল কাটাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন; স্থানীয় চাষীগণ তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। জলাশয় হইতে জল উঠাইবার জন্য কেহ কেহ বিলাতি কল বসাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে, একটী কল (Pumping Machine) খরিদ করিতে যে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সেই অর্থ-ক্ষেত্রে অন্য বাবদে খাটাইলে অধিক আয় হইবার সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামে যে ডোঙ্গা কল আছে, জল উঠাইবার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত ও সহজ উপায় এবং আমরা দেখিয়াছি, কৃষকগণ তদ্দারা অনায়াসে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। উক্ত ডোঙ্গাকল নির্ম্মান করাইতে খরচ অধিক নহে এবং হঙ্গামা ও কিছু নাই। বিলাতি কল বিকৃত হইয়া গেলে মফঃস্বল ত দূরের কথা, কলিকাতায় ও যে সে জায়গায় মেরামত হইবার উপায় না থাকায়, অগত্যা তাহাকে নানা হঙ্গামা পূর্ব্বক টী-টমসন কোম্পানী বা জেসপ কোম্পানীর কারখানায় পাঠাইতে হয়। এত হঙ্গামা ব্যাপারে হস্তক্ষেপন করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। যে স্থলে দেশীয়

প্রথায় কার্য্য নিতান্ত অচল, সেই খানে কেবল আমরা বিজাতি ব্যবস্থা করিব, ইহা আমাদিগের মূল সূত্র।

পানীয় জলের জন্য একটী সতন্ত্র পুষ্করণী বা ইঁদরা থাকা আবশ্যক, কেননা সাধারণ পুষ্করণীতে নানা রূপ ময়লা ও আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতে উহার জল দূষিত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা পান করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

মৃত্তিকা বিচার।

সকল প্রকার মৃত্তিকার সংগঠন এক প্রকার নহে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদার্থের পরিমাণের তারতম্যানুসারে ও সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৃত্তিকা সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে কর্দ্দম (clay), বালি (sand) ও দাহ্যপদার্থই (Humus) প্রধান। সাধারণতঃ এই তিন পদার্থের অস্থিত্ব প্রায় সকল প্রকার মৃত্তিকায় দেখা যায়। যে মাটিতে ৫০ ভাগের অধিক কর্দ্দম থাকে, তাহাকে এঁটেল মাটী (clayey soil), যে মাটিতে ১০ ভাগের অনধিক কর্দ্দম থাকে তাহাকে বেলেমাটি (sandy soil) এবং যে মাটিতে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কর্দ্দম থাকে তাহাকে দো-আঁশ (loamy) মাটি বলা যায়। পরিমাণানুসারে ইহাদের নাম যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, ইহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যও সেইরূপ সতন্ত্র।

কোন মৃত্তিকাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করিবার পরে, উহাকে জলে গুলিয়া বালি সতন্ত্র করিয়া ফেলিবার পরে যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনমুভবনীয় পরমানু সমুহ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারই সমষ্টিকে কর্দ্দম বলা যায়। এই পরমানুরাশি বহুল পরিমাণে

স্রোতস্বিনী নদীর জলের মধ্যে দেখা যায়। ইহার আকার বালি অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, এই জন্য জল অনেকক্ষণ স্থির না হইলে উহা মাটি স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা যে গঙ্গা-মৃত্তিকা দেখিয়া থাকি, এবং যে মৃত্তিকা লইয়া গৃহস্থ হিন্দুমহিলাগণ বৈশাখ মাসে শিব নির্ম্মাণ করেন উহাই এঁটেল মাটি,—কর্দ্দমের সমষ্টি মাত্র; এঁটেলমাটির মধ্যে বালি অথবা দাহ্য-পদার্থ একবারে থাকে না এ কথা আমরা বলি না। এঁটেল মাটি আর্দ্রাবস্থায় পিচ্ছিল এবং শুষ্কাবস্থায় অতিশয় কঠিন এবং ইহার জলশোষক শক্তি (Power of absorption) ও জলবাহক শক্তির (Porousity) অল্পতা প্রযুক্ত অনেক সময়ে ইহা আমাদিগের চাষ আবাদের অনুপযোগী হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে বস্তু থাকিলে উহার জলশোষণ করিবার শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা এঁটেল মাটীর মধ্যে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এবং সেই বস্তুর নাম সূক্ষ্ম-শিরা বা নলী (capillary tube)। উক্ত সূক্ষ্ম শিরার নিজস্বঃ কোন আকার বা অস্তিত্ব নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু সমূহের একত্র সম্মিলন হইলে উহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। পরমাণু সকল একত্রিত হইলে পরস্পরের মধ্যে যে অননুমেয় স্থান (invisible space) থাকে এবং যাহা পরস্পরের সহিত সংযোগ রাখিয়া ক্রমান্বয়ে নিম্নদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই সূক্ষ্ম-শীরার আকার। উক্ত অননুমেয় সূক্ষ্ম-শিরা দ্বারা মৃত্তিকার বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে এবং ইহার অভাবে মৃত্তিকাকে মৃত বা অকর্ম্মণ্য বলা যাইতে পারে। আবার মৃত্তিকা সমষ্টি যখন বিস্তৃত পাত্রে পৃথক করিয়া অথবা বাতাসে উড়াইয়া কিম্বা জলে গুলিয়া দেওয়া যায়, তখন আর উহার শিরা থাকে না,

সুতরাং কোন শক্তিও থাকে না। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চভূতের অন্তর্গত ব্যোম নামক ভূতেরই সূক্ষ্মাংশ অধিকার করিয়া শিরার উৎপত্তি।

এঁটেল মাটির শীরা সকল অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে জলশোষণ করিতে পারে না, কিন্তু যাহা শোষণ করে তাহাও সহজে বাহির হইতে না দিয়া, গর্ভ মধ্যে ধারণ করিয়া রাখে এবং অনাবৃষ্টির দিনে সেই সংগৃহীত রস দ্বারা উদ্ভিজ্জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। জমির উপরে জল দিলে বা পড়িলে, মৃত্তিকার সেই শীরার সূক্ষ্মতাবশতঃ জল শোষণ করিতে বিলম্ব হয় এবং এ জন্য অল্প বৃষ্টিতে চিকণ মাটি শীঘ্র ভিজে না। আবার অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও সূক্ষ্ম শী.রার মুখ বন্ধ হইয়া যায় ও তন্নিবন্ধন মৃত্তিকাভ্যন্তরে জল প্রবেশ করিতে না পারিয়া উপরেই দাঁড়াইয়া থাকে। উপরে অধিকক্ষণ জল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে এবং তাহা শুষ্ক হইয়া গেলে জমির উপরিভাগ এমনই কঠিন হইয়া যায় যে, উহার সহিত বায়বীয় পদার্থের আর বিশেষ সংস্রব থাকে না। অনেকক্ষণ সময় লইয়া টিপ্ টিপে বৃষ্টিপাত হইলে চিকন মাটীর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে, কারণ তাহা হইলে সূক্ষ্ম শীরাসমূহ ধীরে ধীরে তাবৎ জল শোষণ করিয়া লইবার অবসর পায়।

শোষণ ও বহনশক্তির পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ। মৃত্তিকার বহনশক্তির অভাবে উপরে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহার বহনশক্তি থাকিলে পতিত জলকে শীঘ্রই শোষণকরতঃ নিম্নদেশে লইয়া যাইতে পারে। সূক্ষ্মনলীবশতঃ মৃত্তিকা যেমন শীঘ্র জল শোষণ করিতে অক্ষম, সেইরূপ এবং সেই কারণেই

উপরের জল নিম্নদেশে নামিয়া যাইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। নলীর আকার স্থূল হইলে, জল শীঘ্রই শোষিত হয় ও নিম্নদেশে বাহিত হইতে থাকে। যে জলভাগ প্রথমে শোষিত হইল, তাহা নিম্নভাগে চলিয়া না গেলে, শোষণ কার্য্য স্থগিত হইয়া যায় ফলতঃ জল উপরিভাগে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

উক্ত নলীর আকারানুসারে মৃত্তিকার ধারণাশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিকণ মাটির সূক্ষ্ম-নলী, সুতরাং উহার মধ্য দিয়া জল প্রবেশ করিতেও যেরূপ দীর্ঘকাল সময় লাগে, সেইরূপ উহার মধ্য হইতে জল বাহির হইতেও অনেক বিলম্ব হয়। জমি হইতে জল সূর্য্যের আকর্ষণে বাষ্পাকারে শূন্যে উঠিয়া থাকে। শিরা সূক্ষ্ম হইলে সূর্য্যের উত্তাপ সহজে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, এই কারণে উহার সঞ্চিত রস শুকাইতে বিলম্ব হয়। এই ধারণাশক্তিকে ইংরাজিতে power of retention কহিয়া থাকে। চিকণ মৃত্তিকার সহিত দাহ্যপদার্থ থাকিলে উহার ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বহনশক্তি ও শোষণশক্তিও বৃদ্ধি পায়। চিকণ মাটির আর একটী বিশেষ গুণ এই যে আর্দ্র অবস্থায় উহা আকাশ হইতে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ সঞ্চয় করিতে পারে। এই বায়বীয় পদার্থ মধ্যে নাট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ও অক্সিজেন নামক যে যে পদার্থ বর্ত্তমান এবং যাহা উদ্ভিজ্জীবন পোষনের পক্ষে অতীব আবশ্যকীয়, সুতরাং মৃত্তিকার পক্ষেও আবশ্যকীয়; তাহার অভাবে মৃত্তিকার কোন মূল্য নাই। মৃত্তিকা কঠিন হইয়া থাকিলে অথবা তাহার উপরে জল সঞ্চিত হইয়া থাকিলে, মৃত্তিকার সেই বায়বীয় পদার্থ সমূহ আহরণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

ধারণা-শক্তির আতিশয্যবশতঃ এঁটেল মৃত্তিকার শৈত্যতা অধিক। রৌদ্রের উত্তাপে উহা শীঘ্রই উত্তপ্ত বা রসহীন হয় না এবং বায়ু হইতে উহা বহুল পরিমাণে বাষ্পীয় পদার্থ আহরণ করিয়া স্বীয় অভাব অনেক পরিমাণে মোচন করিতে পারে। রাত্রিকালে যখন শিশিরপাত হয় অথবা দিবা ও রাত্রি নির্ব্বিশেষে শীতল বাতাস বহিতে থাকে, এঁটেল মাটি তখন উহা হইতে রস সংগ্রহ করে এবং সেই সঙ্গে উল্লিখিত বায়বীয় পদার্থ সমূহও আসিয়া পড়ে।

এইবার আমরা বেলে-মাটীর কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, বেলে মাটিতে প্রায় দশ ভাগের অধিক কর্দ্দমের অংশ থাকে না। বালির আকারের স্থূলতা এবং কর্দ্দমাংশের ক্ষীণতা বশতঃ বেলে মাটির শিরা সকলও স্থূল। শিরার সূক্ষ্মতা হেতু চিক্কণ মাটির যে যে গুণ বা দোষ আছে, বেলে মাটিতে উহার স্থূলতাবশতঃ এঁটেল হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। শিরা সূক্ষ্ম হইলে জল-শোষণ, জল-বহন ও ধারণাশক্তির আতিশয্য থাকে, কিন্তু স্থূল হইলে তদ্বিপরীত হইয়া থাকে। শিরার স্থূলতা বশতঃ বেলে ভূমিতে বৃষ্টিপাত হইবামাত্রই উহা শোষিত হইয়া শিরার অভ্যন্তর দিয়া অনায়াসে নিম্ন দিকে চলিয়া যায়। তাহাতে উপরি-ভাগস্থিত জমিতে রস থাকে না এবং সূর্য্যোত্তাপেও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া একবারে মাটি নীরস হইয়া পড়ে। অধিকন্তু এঁটেল মাটির ন্যায় ইহা বায়বীয় পদার্থ আহরণ করিতে অসমর্থ। যাহা প্রকৃত বালি, তাহা বাতাস হইতে আদৌ রস সংগ্রহ করিতে পারে না, সুতরাং বালি মধ্যে নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন আদৌ পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে বালির উপর কোন উদ্ভিদ

জন্মিতে পারে না এবং এই কারণেই মরুভূমিতে বৃক্ষাদি জন্মে না।

চিক্কণ ও বালি মাটির দোষ গুণ এক প্রকার দেখা গেল। সেই সকল দোষ বা গুণের উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হওয়া অনেক সময়ে সুকঠিন। নিম্নভূল চিক্কণ মৃত্তিকাযুক্ত জমিতে বর্ষাকালে যে জল সঞ্চিত হয় তাহার উপর অনেক ফসল জন্মিতে পারে না এবং উহার জল শুষ্ক হইতে এতই বিলম্ব হয় যে, উহাতে রবি শস্য আবাদ করিবারও উপযুক্ত সময় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বেলে-মাটী এতই নীরস এবং বাষ্পীয়পদার্থ ও জল ধারণে অসমর্থ যে, গাছের তাহাতে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে ক্ষতি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উহা সামান্য রৌদ্রোত্তাপে এতই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, গাছ সহজেই ঝিমাইয়া পড়ে। আমরা এজন্য এতদুভয়ের মধ্য-বর্ত্তী দো-আঁশ মাটী কৃষি কার্য্যের জন্য বিশেষ উপযোগী মনে করি। ইহার ধারণা-শক্তি, শোষণ-শক্তি, বহন-শক্তি প্রভৃতি যথাবিৎ ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে ও উহার গর্ভ শীতোষ্ণ বিশিষ্ট হওয়ায় উদ্ভিদের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। দো-আঁশ মৃত্তিকাকে ইচ্ছা করিলে বেলে মাটি অথবা এঁটেল মাটির সদৃশ করিয়া লইতে পারা যায় কিন্তু একবারে বেলে অথবা এঁটেল হইলে তাহাকে পরিবর্ত্তন করা বিশেষ ব্যয় ও শ্রম-সাপেক্ষ।

যে দাহ্য পদার্থের সংশ্রব থাকিলে মৃত্তিকার আকর্ষণী ও ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার আতিশয্যও কিন্তু কোন কার্য্যের নহে। এরূপ মৃত্তিকাকে ইংরাজিতে Bog earth কহে।

ইহার ধারণা-শক্তি অতিরিক্ত এবং গঠন আঠাবৎ ও পিচ্ছিল, কিন্তু শুষ্ক হইলে অতিশয় হাল্‌কা হয়, জলে ভাসিয়া থাকে এবং অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। বহুকালের উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমবায়ে উহা সৃষ্ট হয় এবং সর্ব্বত্র বা সচরাচর পাওয়া যায় না। এ জমি আমাদিগের পক্ষে কোন কার্য্যের নহে, তবে, উহার মাটি, যে জমিতে দাহ্য পাদার্থের অভাব আছে, তাহাতে মিশাইয়া দিলে উপকার দর্শিতে পারে। এরূপ মৃত্তিকার বাঙ্গালা নাম বোদ মাটি এবং ইংরাজিতে Humus soil ও বলা যায়। ইহাতে বালি অপেক্ষা কর্দ্দমের অংশ অনেক অধিক থাকে, এই কারণে ইহা এত জলধারক।

মার্লি (marly) নামক অন্য যে এক প্রকার মৃত্তিকা আছে উহার মধ্যে আবার চিক্কণ ও দো-আঁশ আছে। মার্লি মৃত্তিকায় ৫ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত চূণের অস্তিত্ব দেখা যায়। চিক্কণ মৃত্তিকায় উক্ত পরিমাণ চুণ থাকিলে তাহাকে মার্লি-চিকণ, এবং দো-আঁশ মৃত্তিকায় সেই পরিমাণ চুণ থাকিলে তাহাকে মার্লি-দো-আঁশ বলা যাইতে পারে। দুই ক্কাচ্চা আন্দাজ মৃত্তিকা পোড়াইয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে হাইড্রক্লোরিক এসিড অথবা মিউরিয়াটিক এসিড দিলে যদি ফেণা উঠে তবে বুঝিতে হইবে যে উহাতে চুণ আছে। যে জমিতে ইহাপেক্ষা চুণের অংশ অধিক তাহাকে (Calcarious) ক্যালকেরিয়াস মৃত্তিকা কহে। গম, মটর প্রভৃতি যে সকল ফসলের জন্য অধিক চুণ আবশ্যক তাহার পক্ষে এইরূপ জমি ভাল।

ক্ষেত্রবিভাগ ও তাহার উপকারিতা।

বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রকে পরিমিত আকারে খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিলে বস্তুতঃ কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, নতুবা কোন কার্য্যেরই সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারা যায় না। জমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও প্রত্যেকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে মজুরদিগের নিকট হইতে দৈনিক কার্য্য বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। তাহা ব্যতীত, কতটুকু জমিতে কি আবাদ করা যাইবে, তাহাতে কি ব্যয় হইবে, তাহার জন্য কোন্ দিবস কতগুলি মজুর আবশ্যক হইবে, তাহার জন্য কত বীজ লাগিবে এবং তাহা হইতে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হইল ইত্যাদি অনেক হিসাব সংক্ষেপ হইয়া থাকে, নতুবা অপরিমিত জমিতে মজুরেরা কাজ করিতে গেল এবং তাহারা কি পরিমাণে কার্য্য করিল, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। ক্ষেত্র বিভাগ করিবার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডকে ক্রমে ক্রমে চাষ ও আবাদ করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রময় বিস্তর লোক নিযুক্ত করিয়া কোন কার্য্য একবারে আরম্ভ ও শেষ করিলে ভবিষ্যতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়, এই জন্য সমুদায় কার্য্য ক্রমে ক্রমে করিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রের আয়তন যদি পঞ্চাশ বিঘা হয় এবং তাহা একসঙ্গে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করনান্তর একসঙ্গে সর্ব্ব স্থানে বীজ বপন করা হয়, তাহা হইলে তৎপরবর্ত্তী যে সমুদায় পা'ট তাহাও এক সময়ে করিতে হইবে। পঞ্চাশ বিঘা জমিতে পাটের বীজ বপন করিলে, সেই সকল বীজ একই সময়ের মধ্যে

অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। সেই বিস্তৃত ভূমিতে যখন নিড়ান করিতে হইবে, তখন ক্ষেত্র-স্বামীর পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে, কারণ, যে সকল লোক দ্বারা একসময় মধ্যে ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপনাদি করা হইয়াছিল, এক্ষণে নিড়ানী কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করা দুরূহ। নিড়ানী কার্য্যে অধিক সময় লাগে এবং যথা সময়ে সর্ব্বস্থানে নিড়ানী না হইলে পাটের গাছ খারাপ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহার পরে যখন পাট কাচিবার সময় হইবে, তখন অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিতে না পারিলে, সুশৃঙ্খলে পাট কাচিয়া উঠা দায় হইবে এবং যথা সময়ে উহা কাচিয়া তুলিতে না পারিলে, জাগের পাট জাগেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের লোকের সংখ্যা বুঝিয়া, ক্রমে ক্রমে কয়েক খণ্ডে বীজ রোপন করিলে ও পরবর্ত্তী পা'ট সেই নিয়মানুসারে পরিচালনা করিলে, ফসলের কোন অনিষ্ট হইতে পায় না। প্রথম দিবস হয় ত চারি বিঘা জমিতে বীজ রোপন করা গেল, তাহার অষ্টাহ পরে পুনরায় অন্য চারি বিঘাতে বপন করা গেল, এইরূপে পরবর্ত্তী সকল পা'টেই অষ্টাহ করিয়া সময় পাওয়া গেলে, কার্য্যের বড় বিশৃঙ্খলা হইতে পায় না। আমরা ভুক্তভোগী,—আমাদিগের কথা অমূল্য জ্ঞান করা উচিত। আমার বিলক্ষণ মনে আছে, গত বৎসর আমার অনুপস্থিতে রৈইসবাগের মালিরা বিস্তৃত জমি খণ্ডে পাটের বীজ ছিটাইয়া দিয়াছিল। গাছ জন্মিল কিন্তু লোকাভাবে যথা সময়ে উহার নিড়ানী হইয়া উঠিল না। পাট কাচিবার সময়ও সেই কারণে অনেক পাট কাচিয়া তুলিতে না পারায় তাহা জাগেই নষ্ট হইল। সেই অবধি

কার্য্যের সুবিধার জন্য ক্ষেত্রকে খণ্ডাকারে বিভাগ করা গিয়াছে এবং সেই অবধি কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। জমিকে অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্রায়তনে বিভাগ না করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ এক এক বিঘা করিলে ভাল হয়। এক বিঘা জমির পরিমাণ দীর্ঘে ৮০ হস্ত ও প্রস্থে ৮০ হস্ত অথবা ৬৪০০ বর্গ হস্ত। খণ্ড খণ্ড করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব হইতে ৮০ হস্ত অন্তরে একটী খোঁটা পুতিয়া সেই স্থান হইতে দীর্ঘে বরাবর এক গাছি দড়ি টানিয়া বাঁধিতে হয় এবং সেই দড়িকে মধ্যে রাখিয়া দুই পার্শ্ব হইতে কোদাল দ্বারা মাটি উঠাইয়া দেড় বা দুই হস্ত প্রশস্ত একটী আ'ল বা বাঁধ করিয়া, সেই বাঁধের শেষাংশ হইতে প্রত্যেক ৮০ হস্ত ব্যবধানে প্রস্থভাগে একটী করিয়া আ'ল তৈয়ার করিলে, যে খণ্ড খণ্ড জমি হইবে উহার পরিমাণ এক বিঘা। যে সকল অংশে কচ্ বাহির হইবে, তাহা সরল খণ্ডের সহিত না মিশাইয়া সতন্ত্র রাখা উচিত।

এইরূপে সুবন্দোবস্তপূর্ব্বক ক্ষেত্র বিভাগ করিতে পারিলে ক্ষেত্রের সর্ব্ব ভাগে অনায়াসে বেড়াইয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রই তদারক করা যাইতে পারে এবং সেই আ'ল গুলি একবার জমিয়া গেলে উহার উপর দিয়া যাতায়াতের কোন কষ্ট হইবে না। আ'লের বন্দোবস্ত না থাকিলে ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। মাটির উচ্চতা ও নিম্নতা বশতঃ তাহার উপর দিয়া চলিতে গেলে পায়ে আঘাত লাগে, কোন সময়ে বা পা মুচ্ড়াইয়া যায় এবং বর্ষাকালে কর্দ্দমে যাতায়াতের অসুবিধা হয়, কিন্তু আ'ল থাকিলে আর সে সকলের কিছু ভয় থাকে না।

প্রত্যেক খণ্ডে একটী করিয়া নম্বর দিতে পারিলে এবং সেই

নম্বর সমেত ক্ষেত্রের একখানি নক্সা বা প্ল্যান (plan) নিকটে থাকিলে, ক্ষেত্রস্বামী গৃহে বসিয়াই কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে ও ঘরে বসিয়াই কার্য্যের হিসাব লইতে পারেন। নম্বর দিবার জন্য বিশেষ ব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক খণ্ড জমিতে সতন্ত্র না দিয়া, একখণ্ড বাদ একখণ্ডে এক একটী চারি হস্ত লম্বা বাঁশ পুতিয়া, তাহার উপরিভাগে একটুক্‌রা চতুষ্কোণ তক্তা মারিয়া, উহাতে দুই পার্শ্বের জমির নম্বর লিখিয়া দিলে দুই জমির নম্বর বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে কৃষক যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিতে পারেন।

ক্ষেত্র বিভাগ করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উচ্চ-তল ও নিম্নতল জমি এক চৌকার মধ্যে না পড়ে। যদি ইতি পূর্ব্ব হইতেই জমির অবস্থা এইরূপ থাকে, তবে উহাতে এরূপ ভাবে আ'ল দিতে হইবে, যেন নিম্নতল ও উচ্চতল ভুমি সতন্ত্র থাকে; কেননা উচ্চতল জমির উপযোগী ফসল উচ্চতল জমিতে এবং নিম্নতল জমির উপযোগী ফসল নিম্নতল জমিতে আবাদ করিতে হইবে। জমিতে আ'ল দেওয়া থাকিলে আর এক সুবিধা এই যে, আবশ্যক মত প্রত্যেক খণ্ডেই জল প্রবেশ বা নিকাশ করিতে পারা যায় এবং বর্ষাকালের জল প্রত্যেক খণ্ডেই আবদ্ধ থাকিতে পারে।

সুবৃহৎ ক্ষেত্রকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভাগ করিলে বিশেষ কোন সুবিধা না হইয়া বরং অসুবিধা হইতে পারে। এজন্য ক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে খণ্ড জমিরও আয়তন নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। পঁচিশ ত্রিশ বিঘা জমিকে বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ এক বিঘা, পঞ্চাশ বিঘা ক্ষেত্রের বিভাগ

করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দেড় বিঘা, একশত বিঘা ক্ষেত্রের বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ দুই বিঘা এবং দুইশত বিঘার ক্ষেত্রকে বিভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ তিন বিঘা করা উচিত। তিন বিঘার অধিক কোন খণ্ডের পরিমাণ না হয়, কেন না তাহাতে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হইবে।

কৃষাণ বা লাঙ্গল-বাহী মজুরদিগের দোষে ক্ষেত্রের 'আল' ভাঙ্গিয়া যায়। এক ক্ষেত্রে চাষ দিয়া যখন তাহারা বলদ ও লাঙ্গল সমেত অন্য ক্ষেত্রে গমন করে, তখন জমি হইতে লাঙ্গল উঠাইয়া না লওয়ায় আ'ল খোদিত হইয়া যায় এবং এইরূপ বারম্বার হইলে উহা একবারে নষ্ট হইয়া যায় ও পুনরায় উহাকে মেরামত করিবার আবশ্যক হয়, সুতরাং উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতেও যদি পুনরায় এরূপ অন্যায় কার্য্য করে, তাহা হইলে কোন শাস্তিদ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে।

বর্ষাকালের জল কাদায় আ'ল বাঁধাই বা মেরামত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সুবিধাজনক নহে, অধিকন্তু, সে সময়ে আবাদের সময়। আবাদের কার্য্য ফেলিয়া, এ কার্য্যে লোক নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। মাঘ ফাল্গুন মাস হইতে যেমন যেমন ফসল জমি হইতে উঠিয়া যাইবে, সেই সঙ্গে আ'ল ও অন্যান্য মাটি কাটিবার কার্য্য করিয়া লইতে হইবে। আ'ল বাঁধিবার পরে বৃষ্টিতে অনেক মাটি ধুইয়া যায় ও তাহাতে আ'ল স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। সেগুলি মধ্যে একবার মেরামত করিয়া দিলে যখন উহার উপরে ঘাস জন্মিবে, তখন আর উহার জন্য কোন চিন্তা নাই।

অনেকে সূক্ষ্ম আ'ল করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম আ'লের উপর দিয়া লোক বা গোরু মহিষ যাতায়াতের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গোরু মহিষ লইয়া গেলে তাহাদিগের পদভারে অনেক ফসল নষ্ট হয় এবং অনেক ফসল ও তাহারা যাতায়াত কালে ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

যে সমুদায় জমি উচ্চ ও বালিযুক্ত, তাহার আ'ল অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বাঁধা উচিত, কেননা, তাহা হইলে উহাতে অধিক জল আটক্ রাখিতে পারে। নিম্ন ভূমিতে অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করিলেই যথেষ্ঠ হইবে।

জল ও মৃত্তিকা।

জলের সহিত মৃত্তিকা ও সারের কিরূপ সম্বন্ধ ও তাহাদিগের পরস্পরের কার্য্য কি, তাহা জানিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। বায়ু ও জল ব্যতীত উদ্ভিজ্জীবন রক্ষা পাইতে পারে না এবং এতদুভয় হইতে মৃত্তিকা স্থানান্তরিত হইলে উহার আর কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মৃত্তিকার জীবন আছে, একথা বলিলে পাঠকগণের হাস্যোদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে পাঠককে আমাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। সংসারে যাহার কার্য্য আছে তাহারই জীবন আছে, যে বস্তুর কার্য্য নাই তাহা মৃত। উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে বা কথা কহিলেই জীবিত বলিয়া স্থির করা ভ্রম, কেননা তাহা হইলে বাক্ ও চলৎশক্তিরহিত উদ্ভিদকে জীবিত বস্তুর মধ্যে গণনা করা যায় না। তাহাতেই বলি, যাহার কার্য্য করিবার শক্তি আছে, তাহারই জীবন আছে; আবার মানব জগতে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগকে আমরা জীবন্মৃত বলিতে কুণ্ঠিত নহি। জীবন্মৃত ও জীবিতের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও, সে বিষয় লইয়া আমাদিগের আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

জল ও বায়ুর সহিত যতক্ষণ না মৃত্তিকার সংযোগ হয়, ততক্ষণ উহা মৃত থাকে এবং উহার কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না। জল ও বায়ুরোধ করিয়া মৃত্তিকার সহিত যতই উৎকৃষ্ট

সার মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট ও সুপুষ্ট বীজ বপন করা যাউক না কেন, মৃত্তিকার দ্বারা বীজের কোন উপকারই হইবে না, কিন্তু যে-ই উহা বায়ু ও জলের সম্পর্কে আসিবে অমনি উহাতে সঞ্জিবনীর কার্য্য আরাম্ভ হইবে। মৃত্তিকায় জল সংযুক্ত না হইলে কেবল বায়ুর দ্বারাও উহার কোন কার্য্য হয় না।

বৃষ্টি হইলেই নাইট্রোজেন নামক পাদার্থ মৃত্তিকাতে সংযোজিত হয় ও তাহারই ফলে বৃক্ষলতাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষাকালে যে গাছ পালা পরিবর্দ্ধিত হয় ও তাহাদিগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার এক মাত্র কারণ, বৃষ্টি। বর্ষাতীত হইলে উহাদিগের আর সেরূপ তেজ বা শ্রী থাকে না। * ভারতীয় বৃষ্টির জলে, ইংলণ্ডীয় বৃষ্টির জল অপেক্ষা নাইট্রোজেনের ভাগ অল্প, ইহাই ডাক্তার ভয়েল্কার সাহেবের ধারণা, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ থাকিলেও বাঙ্গালাদেশের বৃক্ষলতাদির যেরূপ বৃদ্ধি, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারি যে, এখানকার বৃষ্টিতে যে পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে, তাহা আমাদিগের কৃষিকার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অল্প, এবং সূর্য্যোত্তাপ এতই অধিক যে, অতি শীঘ্রই ক্ষেত্রের রস শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, উহাতে সেই সকল পদার্থের অভাব হইয়া থাকে।

কেবল যে বৃষ্টি হইতেই নাইট্রোজেন বা আমোনিয়া ক্ষেত্রে

---

* Dr. Voelker's Improvement of Indian Agriculture, page 45.

সংগৃহিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে তাহা নহে। জমিতে রসাভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে উহাতে জল সেচন করিলে মৃত্তিকা আর্দ্র হইয়া থাকে ও তখন বায়ু হইতে সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করে। মৃত্তিকা নীরস ও শুষ্ক থাকিলে তাহাতে বায়বীয় পদার্থ সংযোজিত হইতে না পারায়, উহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় না, বরং প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে বায়বীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। মাটি হাল্‌কা বা অধিক বালিযুক্ত হইলে তাহার উর্ব্বরা-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে, কিন্তু দো-আঁশ, তদপেক্ষা চিক্কণ মৃত্তিকা সহজে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় না বলিয়া উহার সংগৃহিত বায়বীয় পদার্থও শীঘ্র উড়িয়া যাইতে পারে না।

মৃত্তিকা সম্বন্ধে যেরূপ বলা হইল, সার সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। মৃত্তিকা যেরূপ আর্দ্র না হইলে কোন কার্য্য করিতে অক্ষম, তদ্রূপ সারও বিনা জল সাহায্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। সার শুষ্কাবস্থায় থাকিলে কোন মতে উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। জমিতে রাশিকৃত সার প্রয়োগ করিলেও যতক্ষণ উহা জলের সহিত মিলিত না হয়, ততক্ষণ উহা গাছের নিকট থাকা বা না থাকা একই কথা। জলের সংশ্রবে আসিলে উহার পদার্থ সমুহ বিগলিত হইয়া জলীয় অবস্থায় পরিণত হইলে উদ্ভিদের পানোপযোগী হইয়া থাকে। জলের ন্যায় তরল অবস্থা না প্রাপ্ত হইলে একতিলার্দ্ধসারও উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করিলে এবং উহাকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে জলের বিশেষ আবশ্যক। সার যত তরল হইবে ততই শীঘ্র উহা উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করিবে, এ কথা কৃষকগণ যত না জানে, সবজীব্যবসায়ী চাষী ও ফুলবাগানের

মালিগণ তাহা সবিশেষ অবগত আছে। মরস্থমী ফুলে (Season flower) আমরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উহার গোড়ায় জলীয় সার দিলে ৫।৬ দিবসের মধ্যে তাহার কার্য্য প্রত্যক্ষ ফলিয়া থাকে, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে জলীয় সার প্রদান করা সহজ কথা নহে, কারণ উহাতে বিস্তর পরিশ্রম আছে। সেই কার্য্য প্রকারান্তরে করিবার জন্য ক্ষেত্রে জল দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সার হইতে যে পরিমাণে কার্য্য লইতে হইবে সেই পরিমাণে উহাকে সর্ব্বদা তরলাবস্থায় রাখিতে হইবে। তরল অবস্থা অর্থে আমরা এরূপ বলি না যে, জমিকে সর্ব্বদা জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে,—তবে এরূপে জল যোগাইতে হইবে, যাহাতে সারস্থিত পদার্থ সমূহ গলিত হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জল হইতে তাহা আর সতন্ত্র না থাকে। মৃত্তিকা মধ্যে যে রস আছে, সার পদার্থ তাহার বরাবর হইলেই, উহা উদ্ভিদের পানোপযোগী হইয়া থাকে। অনেক স্থানে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়াছে অথচ তাহাতে জল সেচনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ফসলের কোন উপকার হয় না। এ স্থানে ক্ষেত্র-স্বামীর জানা উচিত যে, জলের অভাব থাকিলে সার বিগলিত হইতে পারে না, স্থতরাং তদ্বারা ফসলেরও কোন উপকার হয় না। বর্ষাকালে বৃষ্টির আতিশয্যবশতঃ সারের বিশেষ ও শীঘ্র কার্য্য হইয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ উত্তাপের অল্পতা বশতঃ তন্মধ্যস্থিত জলীয় ভাগ শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সকল কথার আলোচনা করিতে গেলে রসায়ন আসিয়া পড়ে। আমরা এ

পুস্তকে রসায়নের বিষয় লইয়া অধিক গোলযোগ করিব না, কেননা, তাহাতে পাঠকের পক্ষে অনেক গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। যে সকল পাঠক কৃষি বিষয়ক রসায়ন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রসায়নের সতন্ত্র পুস্তকাদি পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক জানিতে পারিবেন। কার্য্যকরী বিষয় লইয়াই আমরা অধিকাংশ ভাগ আলোচনা করিব এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে গুরুতর কথা বিচার করিতে বসিব না।

সারের প্রয়োজনীয়তা।

ভারতের আকাশ চিরকাল সুজলা এবং ক্ষেত্র চিরকাল সুফলা বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই। এই জন্য অতি অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে ভারতীয় কৃষকগণ স্বীয় অভাবোপযোগী ফসল প্রাপ্তিমাত্রেই সন্তুষ্ট থাকে। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সাধারণ কৃষকের এখনও বোধগম্য হয় নাই। যত দিন কৃষকগণ সার বিষয়ে ইদৃশ হতাদর প্রদর্শন করিবে এবং উহার উপকারীতা বাস্তবিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, ততদিন কিন্তু তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে এবং ক্ষেত্রেরও উর্ব্বরতা স্থায়ী হওয়া অনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কথা লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সারের সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের কতদূর নিকট সম্বন্ধ। এক খণ্ড অব্যবহৃত ও পতিত জমি লইয়া তাহাতে বৎসরের পর বৎসর বিনা সারে আবাদ করিলে নিশ্চিত বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রথম আবাদ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায় ততই ফসলের পরিমাণ ও গুণ হ্রাস হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরে যে প্রকার ফসল আদায় হয়, পরবর্ত্তী বৎসরে কখনই সেরূপ হয় না, কিন্তু সাধারণ কৃষকে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগে জমির উর্ব্বরতা সাধিত হয় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ষাকালে যে সমুদায় ক্ষেত্র ডুবিয়া যায়, তাহাতে অন্য স্থান হইতে পলি রূপে অনেক সার স্বতঃই আসিয়া থাকে ও

স্থানীয় উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া সারে পরিণত হয়। এইরূপ স্বাভাবিক কারণে জমির কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা রক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সার ব্যবহার করিলে ক্ষেত্রের দ্বিগুণ লাভ হইয়া থাকে, যথা,—ক্ষেত্রের নষ্ট অংশ পুনঃ সঞ্চিত হয় এবং উল্লিখিত স্বাভাবিক উপায়ে যে যে পদার্থ আসিবার তাহাও আসিয়া থাকে।

জমিতে একবার ফসল হইলে উহার সহিত অনেক পরিমাণে জমির সারবস্তু চলিয়া যায়, কিন্তু জমিতে যদি সেই অংশ কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত করা না যায় এবং সেই অবস্থাতেই পুনঃ পুনঃ আবাদ করা যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের সারবস্তু আরো হ্রাস হইয়া থাকে। এই জন্য বিনা সারে একই ক্ষেত্রে বারম্বার আবাদ করিলে জমি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পাঠক যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, এজন্য এস্থলে একটী উদাহর দেওয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর হইতে এক খণ্ড জমিতে গহমার আবাদ হইত এবং উহাতে কোনরূপ সার কখন দেওয়া হয় নাই সুতরাং উক্ত জমির পরিণাম কিরূপ হয় তাহা দেখিবার নিমিত্ত উহার প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, সেই জমি উচ্চতল ও বর্ষায় ডুবিয়া যায় না অথবা অন্য স্থানের জল আসিয়া তথায় পড়ে না। যাহা হউক, প্রথম বৎসর দেখা গেল, গহমার গাছগুলি ৮।৯ হাত হইল এবং উহার শ্রীও সুন্দর হইল; দ্বিতীয় বৎসর দেখিলাম উহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইল, তৃতীয় বৎসর তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইল। আর দুই বৎসর পরে যাহা হইবে তাহা পাঠক বুঝিয়া লউন। একতঃই গহমার গাছ ইক্ষুর ন্যায় জমিকে এক বৎসরমধ্যেই সারহীন করিয়া

ফেলে, তাহাতে বারম্বার বিনা সারে উহার আবাদ হইলে যে উহার সারাংশ একবারেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? সকল ফসল সমভাবে জমির সারপদার্থ অপহরণ করে না। কোন ফসল অধিকপরিমাণে, কোন ফসল অল্পপরিমাণে জমির সারপদার্থ শোষণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করা গেল।

"এক বিঘা জমিতে যদি ৮ মণ ধান হয়, তবে সেই ধান ও তাহার খড় জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিলে, ঐ ছাইয়ের ওজন আন্দাজ অর্দ্ধ মণ হইবে। এক বিঘা জমিতে যদি ৫০ মণ আলু হয়, তবে ঐ আলু জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিলেও অর্দ্ধ মণ আন্দাজ ছাই হইবে। আলু ও ধান্সের মধ্যে আর একটী বিশেষ প্রভেদ এই যে, বিঘা প্রতি ৫০ মণ আলু হইলে, প্রায় দশ সের নাইট্রোজেন জমি হইতে খরচ হইয়া যায়, কিন্তু ৮ মণ ধান্যের ফসলের দ্বারা কেবল ৬ সের নাইট্রোজেন খরচ হয়। ঐরূপ, পট্যাস ধান্য ফসলদ্বারা বিঘা প্রতি কেবল ৪ সের আন্দাজ খরচ হয়; কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা ১২ সের আন্দাজ পট্যাস খরচ হইয়া যায় এবং ধান্য ফসলদ্বারা বিঘা প্রতি কেবল দেড় সের, কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা ৪ সের চুণ খরচ হইয়া যায়।"*

জমি হইতে যেমন ফসল লওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই অংশ পূরণ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। গাভীকে না খাওয়াইলে উহা দুগ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না,—মধুভাণ্ড হইতে যে

* "জমির সার" বিষয়ক উপদেশ পত্রিকা

পরিমাণে মধু বাহির করিয়া লওয়া যায় সেই পরিমাণে উহা পূর্ণ করিয়া না দিলে শীঘ্রই ভাণ্ড শূন্য হইয়া আইসে। গাভীকে অনাহারী রাখিয়া নিত্য দোহন, মধুভাণ্ডকে পুনঃ পূরণ না করিয়া ক্রমান্বয়ে মধু আহরণ এবং বিনা সারে এক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ আবাদ করা একই কথা। আশু সুবিধার জন্য যাহারা সঞ্চিত মূলধন খরচ করিয়া ফেলে তাহাদিগের ন্যায় সংসারে মূর্খ আর কে আছে ? মৃত্তিকা মধ্যে যে সারবস্তু আছে তাহাকে আমরা মূলধন মনে করি ও সেই মূল-ধনের যাহা উপসত্ত্ব তাহাই ব্যবহার করা বিচক্ষণতার কার্য্য। ক্ষেত্র হইতে ফসল লইয়া তাহাতে সার প্রদান না করিলে মূল-ধন খরচ করা হইয়া থাকে, কিন্তু পুনরায় যদি যথাপরিমাণে উপযুক্ত সারদ্বারা ক্ষেত্রের অভাব পূরণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই উহার উপসত্ত্ব ভোগ করা হয়। এই কথাটী হৃদয় মধ্যে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া রাখা উচিত এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে ক্ষেত্রের সারবস্তু কখনই নষ্ট হয় না ও তন্নিবন্ধন উহার উর্ব্বরতাও চিরদিন সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা কৃষিকার্য্যকে জীবিকা স্বরূপ ভাবিয়া থাকেন, যাঁহারা ইহাদ্বারা লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা স্থায়ীভাবে এক স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষতঃ এ কথাটী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদিগের দেশে সারের প্রথা তাদৃশ প্রচলিত না থাকায় দেশের যাবতীয় সার নষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে সার নষ্ট হওয়া অলক্ষণের বিষয় ও কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমরা দেখিতে পাই, কি সহরে কি পল্লীগ্রামে, যাবতীয় উদ্ভিজ্জের আবর্জ্জনা ও মলমূত্রাদি প্রাণীজ

সমুদায় সারই ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতার ন্যায় প্রধান প্রধান সহরে, মফঃস্বলের নগরে নগরে যাবতীয় আবর্জ্জনা তৎসমুদায়ই গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু এ সকল যদি কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের যে কত উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না এবং মিউনিসিপালিটীগণও প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

সারের প্রকৃত উপকারীতা ভারতীয় কৃষক এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। আমরা আর্য্যজাতী বলিয়া পৃথিবীতে অহঙ্কার করিয়া থাকি, কিন্তু এ বিষয়ে অনার্য্য নূতন সভ্য জাপানবাসী আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। জাপানবাসী প্রায় বিনা সারে কোন ফসলের আবাদ করে না এবং তাহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস যে, Without continuous manuring there can be no continuous production. A small portion of what I take from the soil is replaced by nature (atmosphere and rain), the remainder I must restore to the ground." * অর্থাৎ ক্রমিক সার প্রদান ব্যতিরেকে ক্রমিক ফসল জন্মিতে পারে না। ক্ষেত্র হইতে যাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ স্বভাব হইতে সঞ্চিত হয়, অবশিষ্ট অংশ আমাকে দিতে হইবে। এই যে কয়েকটী কথা, ইহার মূল্য নাই, ইহা অমূল্য এবং প্রত্যেক কৃষকেরই এই কথা হৃদয়গ্রাহী করিয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। অনুর্ব্বরা জমি হইলে ত

---

* Schrottky's Principles of Rational agriculture

সার দিতেই হইবে,—আর উর্ব্বরা জমী হইলে তাহাতে যথা পরিমাণে সার প্রদান করিলে উহার পূর্ব্বসঞ্চিত সারভাগ হ্রাস না হইয়া সমভাবে থাকিবে।

সার প্রয়োগ দ্বারা যে ক্ষেত্রের কেবল উর্ব্বরতা রক্ষিত হয় তাহা নহে। ক্ষেত্রে সার দিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে এবং তাহা এই যে, উহার দ্বারা ফসলের পরিমাণ, পুষ্টি ও আকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সার প্রয়োগদ্বারা সাধারণতঃ ফসল মাত্রেই প্রায় উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সার বিশেষ দ্বারা ফসল বিশেষের প্রভূত উপকার হইয়া থাকে ; কিন্তু মৃত্তিকার অভাব, ফসলের আবশ্যক, ও সারের কার্য্য না জানিয়া যথেচ্ছাভাবে সার প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা সার, জমী বা ফসলের দোষে নহে, ক্ষেত্রস্বামীর অনভিজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন করাইতে হইলে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে তাহার রোগ নির্ণয় করিতে হয়, এবং ধাতু ও ঔষধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, ক্ষেত্রে সার দিবার সময় ঠিক সেই প্রকার বিবেচনা আবশ্যক। অম্লবিশিষ্ট জমিতে (calcarious soil) স্বভাবতঃই চুণের আধিক্য থাকে, কিন্তু উহাতে চুণের অনাভাব সত্ত্বেও যদি চুণ সার রূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ফসলের অনিষ্ট করা হইবে। আবার ক্ষেত্রে যদি এক মণ চুণ দিলে কোন জমীর অভাব পূরণ হয়, তাহাতে দুই তিন মণ দিলে জমির অনিষ্ট হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া অবিমৃষ্যভাবে সার প্রদান করা হয় বলিয়া সার সম্বন্ধে

সময়ে সময়ে অনেক গ্লানী শুনা গিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সার চিরকালই সার আছে ও থাকিবে, ইহার পূর্ব্বে সারের যে গুণ ছিল একণেও তাহা আছে এবং ভবিষ্যতে ও তাহা থাকিবে। সকলদিক স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া সার দিতে পারিলে, মুষ্টি-যোগের কার্য্য হইয়া থাকে, এ বিষয়ে আমাদিগের কোন দ্বিধা নাই। যাঁহারা সারের গ্লানী করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা উহা প্রয়োগে কোন রূপ ত্রুটী করিয়া থাকিবেন।

ভূমির সমতলতা।

সকল স্থানের ভূমি সমতল পাওয়া সুকঠিন, এজন্য অসমতল ভূমিকে সমতল করিয়া লওয়া উচিত, নতুবা চাষ বাসের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। সমুদায় ক্ষেত্রকে একই সমতলতায় পরিণত করিতে হইলে অনেক খরচ পড়িয়া যায়। সহজে সমতল করিবার জন্য, ক্ষেত্রকে খণ্ড খণ্ডে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে সমতল করিয়া লইতে হইবে। সমতল করিবার সহজ উপায় উচ্চভূমি হইতে কার্য্য আরম্ভ করা। এরূপ করিলে উচ্চ হইতে ক্রমে নিম্নদিকে জমি সমুদায় সিঁড়ির ন্যায় দেখায়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, তত্রত্যকার চাষাগণ কিরূপ প্রণালীতে জমিকে সমতল করিয়া থাকে। জমি অসমতল থাকিলে সকল স্থানের ভূমিতে সমান পরিমাণে রস থাকিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, উচ্চ স্থানের জল গড়াইয়া নিম্নতম স্থানে আসিয়া জমে ও তাহাতে নিম্নতম স্থানের শৈত্যতা ও আর্দ্রতা বাড়ে। অন্য দিকে উচ্চভূমির কেবল যে রস শুকাইয়া যায় তাহা নহে, উহার সারাংশ ও অনেক পরিমাণে ধৌত হইয়া নিম্নদিকে চলিয়া আইসে এবং তাহাতে উহার উর্ব্বরতার হ্রাস হইয়া থাকে; কিন্তু জমি সমতল ও আ'ল বাঁধা থাকিলে ক্ষেত্রস্থ জল ক্ষেত্রেই শোষিত হয়, সুতরাং উহার কোন অংশ ধৌত হইতে পারে না এবং অনেক দিবসাবধি জমিতে রস বর্ত্তমান থাকে।

অসমতল জমিতে সমভাবে যে ফসল জন্মে না, তাহার কারণ

আর কিছুই নহে। উচ্চভূমিতে সার ও রসাভাব ঘটে কিন্তু নিম্ন-ভূমিতে তাহা ঘটে না, অথবা অতিরিক্ত আর্দ্রতা বশতঃ উভয় প্রকার জমিতে ফসলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জমির সকল স্থানেই সমভাবে ফসল জন্মাইতে হইলে, উহাকে সমতল করিয়া লওয়া বিশেষ আবশ্যক। ক্ষেত্রকে যেমন বিভাগ করিয়া লওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ উহাকে সমতল করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং জমীকে যে আ'ল দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য,—স্থানীয় সার ও জল যথা স্থানে আবদ্ধ রাখা। দ্বিতীয়তঃ ছেঁচের জল দিতে হইলে ক্ষেত্র সমতল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন নতুবা নিম্নস্থান হইতে উপর দিকে জল চালান এক প্রকার অসম্ভব; আবার উচ্চ অংশ হইতে জল সেচন করিলে সমুদায় জল গড়াইয়া নিম্নাংশে চলিয়া আসে। এই সকল কারণে অসমতল জমিকে অংশে অংশে সমতল করিয়া লওয়া উচিত।

ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় গৃহাদি।

কৃষিক্ষেত্রের জন্য বিপুল অর্থব্যয় করিয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ না করিয়া তৃণাচ্ছাদিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে কাজ চলিতে পারে। ইহাতে অনর্থক যে অর্থ ব্যয় করা যায়, তদ্দ্বারা ক্ষেত্র-কার্য্যের অনেক সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে পল্লীগ্রামোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে দৃশ্য অতি মনোহর হইয়া থাকে। সহর হইতে ক্ষেত্রে গিয়া পাড়াগাঁয়ের দৃশ্য অতি মনোরঞ্জক বোধ হয় এবং তাহাতে যে চিত্ত প্রফুল্লতা জন্মে তাহা অতুলনীয়।

ক্ষেত্রস্বামীর থাকিবার জন্য যে 'বাঙ্গালা' বা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে উহা ক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমাংশ করা উচিত। ইহাতে সুবিধা এই যে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ উন্মুক্ত থাকিলে গৃহের আর্দ্রতা থাকে না এবং পূর্ব্বদিকের আলোক ও দক্ষিণদিকের বাতাস বশতঃ স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল থাকে। 'বাঙ্গালার' চতুর্দ্দিকে এক-শত হস্ত পরিমাণ জমির মধ্যে কোন আবাদ করা উচিত নহে। এই জমিতে দূর্ব্বাদল লাগাইয়া মধ্যে মধ্যে ছোট জাতীয় ফুলের গাছ যথা, বেল, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি রোপন করিলে স্থানীয় দৃশ্য সুন্দর হয় এবং সময়ে সময়ে পুষ্পের সুগন্ধে স্থান আমোদিত হওয়ায় চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মে। গৃহের সম্মুখেই আবাদ থাকিলে, যখন ফসল উঠিয়া যায়, তখন সেই স্থান ফাঁকা থাকায় অতি অপ্রীতিকর দেখায় ও বর্ষাকালে তথায় সর্ব্বদা জল জমিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্য দূষিত করে এবং উহা হইতে যে একরূপ

পচা দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তাহাতে পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা। 'বাঙ্গালার' নিমিত্ত যে স্থান নির্ব্বাচিত করিতে হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত ভূমি অপেক্ষাকৃত এরূপ উচ্চ হওয়া আবশ্যক যে, বৃষ্টিপাতে সামান্য জলও সহজে নিকাশ হইতে পারে। নির্ব্বাচিত স্থান যদি সেরূপ উচ্চ না হয়, তাহা হইলে অপর স্থান হইতে মাটি কাটিয়া আনিয়া তাহা উচ্চ করা উচিত।

গৃহটি দুই বা চারিচালাবিশিষ্ট এবং সাধারণ গৃহাপেক্ষা উচ্চ হইলে ভাল হয়। দুই-চালা-গৃহ পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা হইলে গৃহ মধ্যে দক্ষিণে বাতাস অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত হয়। প্রাতঃকালের রৌদ্র আসিবার জন্য গৃহের পূর্ব্বদিকে কয়েকটী জানালা বা দরজা রাখিতে হইবে। দ্বার বা জানালার বিপরীতদিকে খোলা না পাইলে বাতাস খেলিতে পায় না, এজন্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণে যেরূপ জানালা বা দরজা থাকা আবশ্যক, অপর দুই দিকেও সেইরূপ রাখিতে হইবে। গৃহমধ্যে যতই নূতন বাতাস প্রবেশ করে, ততই উহা স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। গৃহের চারিদিকে বারান্দা বা দালান না থাকিলে বর্ষাকালের বৃষ্টিতে ঘরের দেয়াল ভিজিয়া যায় এবং গৃহের অভ্যন্তরও জলের ছাটে ভিজিয়া থাকে। ইহাতে শরীরের অসুস্থতা আনয়ন করিতে পারে। আবার গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে উহা এমনই উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, তন্মধ্যে বাস করা অসম্ভব হয়। গৃহটী দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একটীতে আফিস ঘর ও অপরটীতে আবাসের স্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

সুবৃহৎ ক্ষেত্র হইলে এবং তাহাতে অনেক লোক থাকিলে, ইহাদিগের জন্য এক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া, ক্ষেত্রের ভিন্ন

ভিন্ন অংশে করিলে ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সুবিধা হয়। একই স্থানে সকলে থাকিলে বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে অপর লোক আসিয়া ক্ষেত্রের ফসল বা অপর দ্রব্যাদি চুরী করিতে পারে এবং ছাগল গোরুতে ফসল লোকসান করিতে পারে, কিন্তু স্থানে স্থানে লোক থাকিলে আর এ সকল উপদ্রব হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বেতনভোগী শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। অনেকস্থলে উহাদিগের প্রতি অতিশয় হতাদর দেখা গিয়া থাকে এবং তাহারাও যে মনুষ্য, এ কথা ক্ষেত্রস্বামীর মনে থাকে না, অথবা থাকিলেও তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি করেন না। লোকহিতৈষীভাব ছাড়িয়া দিলেও, ইহারা যে ক্ষেত্রের দক্ষিণ হস্ত, ইহা ভাবিয়াও তাহাদিগের প্রতি করুণা করা উচিত। ক্ষেত্রের মজুরগণ যাহাতে স্বাস্থ্যবান্ ও বলিষ্ঠ থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রভুর পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি, কারণ শীর্ণ ও রুগ্ন লোকদ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। এমনও কোন কোন প্রভু দেখা যায়, লোকেরা পীড়িত হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে বিদায় দিয়া সে স্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করেন। সতত লোক পরিবর্ত্তনে আমাদিগের ঘোর আপত্তি আছে। লোক পুরাতন হইয়া গেলে প্রভুর প্রতি তাহাদিগের একটা মমতা জন্মে ও তন্নিবন্ধন প্রভুর কার্য্যেও কিছু যত্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য নূতন লোক আসিলে তাহাদিগকে স্বীয় মনোমত ভাবে কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে বিলম্ব হয় এবং সেই ব্যক্তি সকল ভবিষ্যতে ক্ষেত্রের কার্য্যোপযোগী হইবে কি না, তাহারও নিশ্চয় থাকে না। অনেক স্থানে

নূতন লোক আসিয়া কিছু দিবস থাকিয়া দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলায়ন করে। এই সকল কারণে আমরা লোকজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করিয়া, উহাদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে ভাল করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দিই। ইহারা স্বভাবতঃ সামান্য কুটীরে বাস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, সে অবস্থায় থাকিয়া ইহারা কিরূপ রোগ ভোগ করে এবং ইহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা কত অধিক!

ক্ষেত্রস্থিত লাঙ্গল ও শকট-বাহী গো মহিষাদির জন্য একটী সুবৃহৎ ঘর আবশ্যক। ইহা এরূপ স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যথায় আর্দ্রতা নাই এবং রৌদ্র ও বাতাস আসিবার পথে কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই। লোকালয়ের সন্নিকটে গো-শালা নির্ম্মাণ করিলে তথায় মনুষ্যের বাস করা অসম্ভব, কারণ উহা হইতে যে দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। এজন্য 'বাঙ্গালা' ও মজুর দিগের বাসস্থান হইতে গো-শালা দূরে সংস্থাপন করিতে হইবে। ক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উহা স্থাপন করিলে ক্ষেত্র-স্বামীর পক্ষে উহা পরিদর্শনের সুবিধা হয়, কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-স্বামীর গৃহ উত্তর-পশ্চিম দিকে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই অন্য স্থান অপেক্ষা 'বাঙ্গালা' হইতে গো-শালা অনেক নিকটে হইবে। গো-শালার ভূমি সাধারণ জমি হইতে কিঞ্চিত উচ্চ হওয়া আবশ্যক এবং গৃহটীর মধ্যে যাহাতে স্বাধীন ভাবে বাতাস ক্রীড়া করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অতি ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে কতকগুলি পশু রাখিলে পশুগণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং নানাবিধ রোগ জন্মে।

গৃহমধ্যে এক একটী গোরু বা মহিষের জন্য চারি হস্ত স্থান থাকা উচিত ; তাহা হইলে উহারা শয়ন করিলে বা দণ্ডায়মান থাকিলে পরস্পরের গাত্রের সহিত স্পর্শ হইতে পারে না। পশুর সংখ্যানুসারে গৃহটী উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিতে হইবে এবং প্রস্থে ১৬ হস্ত করিলেই চলিবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দেয়াল হইতে ৬॥ হাত দূরে দুই দিকে দড়ি ধরিয়া, মধ্য স্থলে যে তিন হস্ত স্থান পাওয়া যাইবে, তাহাই বরাবর লম্বা রাস্তা থাকিবে। রাস্তা সঙ্কীর্ণ হইলে গৃহমধ্যে যাতায়াতের অসুবিধা হয়। দেয়ালের দিকের ৬॥ হস্ত জমি রাস্তার দিকে ঢালু করিয়া আনিলে, গো-মূত্র সমুদায় রাস্তার কিনারা বহিয়া ঘরের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পড়িবে। গো-মূত্র বিশেষ সার, এজন্য উহা যত্ন সহকারে রক্ষা করিবার জন্য ঘরের বাহিরে এরূপ স্থানে একটী বড় গামলা রাখিতে হইবে যে, মূত্র আসিয়া তাহাতেই পড়ে। চারিদিকের দেয়ালের ভূমি হইতে দুই হস্ত উর্দ্ধে প্রত্যেক পশুর সম্মুখে এক বর্গ হাত পরিমাণ এক একটী গবাক্ষ রাখিয়া দেওয়া উচিত অথবা চারিদিকের দেয়ালে দুই হস্ত উর্দ্ধে এক হস্ত প্রস্থবিশিষ্ট জাফ্‌রি করিয়া দিতে পারিলে আরো ভাল হয়। ইহাদ্বারা গৃহাভ্যান্তরস্থিত দূষিত বায়ু বহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং সতত নূতন বায়ু প্রবেশ করিয়া পশুদিগের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। ঘরের দেয়াল ভূমি হইতে ছয় হস্তের কম উচ্চ না হয়। সকালে ও বৈকালে পশু দিগকে বহিরে রাখিবার জন্য গৃহের সম্মুখে একটী প্রশস্ত অঙ্গিনার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক এবং সেই অঙ্গিনা মধ্যেই প্রাতঃকালে ও স্বায়ং কালে তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া উচিত। মুরসিদাবাদস্থিত আমার জনৈক বন্ধু বাবু মহেশ নারায়ন রায়ের কৃষিক্ষেত্রে ইহার

বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। অঙ্গিনা মধ্যে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ত্রিশ্ হাত লম্বা, দুই হস্ত প্রস্থবিশিষ্ট বাঁশের জাকৃরি আছে এবং উহা জমি হইতে ১৷৷ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ। উহা দেখিতে ঠিক শাল্তি বা ডোঙ্গার ন্যায়। উহারই মধ্যে বড় বড় গাম্লা গাঁথিয়া দেওয়া আছে এবং তন্মধ্যে পশুদিগের আহার দেওয়া হয়। এই লম্বা 'ছেণীর' দিকে মুখ রাখিয়া গোরু বাছুরদিগকে দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিলে, উহারা যথেচ্ছামত আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে তাহা-দিগকে গৃহমধ্যে বা কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। পশুর সংখ্যানুসারে অঙ্গিনা ও গৃহের আয়তন কম বেশী করিতে হয়। ইদৃশ অঙ্গিনাকে খোঁয়াড়ও বলা যায়। খোঁয়াড় চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইলে পশুগণ কুত্রাপি চলিয়া যাইতে পারে না।

গো-শালার সংলগ্ন আর একটী গৃহ থাকা বিশেষ আবশ্যক। উহারই মধ্যে পশুদিগের আহার্য্য খৈইল, ভুষি ইত্যাদি আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা স্থানান্তরে করিলে, ঐ সকল দ্রব্য পুন-রায় আনিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। ইহারই সন্নিকটে খড়ের স্তূপ থাকিলে আরো সুবিধা। কার্য্য বিষয়ে সকল দিকে সুবিধা থাকিলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে। সময় নষ্ট হইলেই অর্থের অপব্যয় হইল জানিতে হইবে।

অস্ত্র ও যন্ত্রাদি আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত 'বাঙ্গালার' সম্মুখে বা পার্শ্বে এক খানি ক্ষুদ্র গৃহের আবশ্যক। যন্ত্রাদি প্রতিদিন লোকজনকে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে পুনরায় বুঝিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকিলে যন্ত্রাদি হারাইয়া যায় না; নতুবা ইহারা প্রায়ই একটী না একটী যন্ত্র বা অস্ত্র হারাইয়া আইসে অথবা অসাবধানতাবশতঃ কোথায় ফেলিয়া

আইসে যে আর খুঁজিয়া পায় না ; কিন্তু প্রতিদিন এইরূপে বুঝিয়া লওয়া ও বুঝাইয়া দিবার নিয়ম থাকিলে সকলের মনে ভয় থাকে, সুতরাং তাহারা উহা সাবধানে রাখে। অস্ত্রগৃহ 'বাঙ্গালার' সন্নিকটে নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখনই মজুরগণ কার্য্যে আইসে বা কার্য্য হইতে ফিরিয়া যায়, তখনই উহারা প্রভুর নজরে পড়ে ; এজন্য বিলম্ব করিয়া কাজে আসিতে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কার্য্য হইতে পালাইতে পারে না।

'বাঙ্গালার' অন্যদিকে ও নিকটে গুদাম (go-down) ও তৎ-সংলগ্ন প্রশস্ত ভূমি খণ্ডে 'খলেন' (threshing floor) করিতে হইবে। ইহা দূরে হইলে অনেক মাল চুরি হইতে পারে অথবা সদা সর্ব্বদা তদারক অভাবে নষ্ট হইতেও পারে। গো-শালার সম্মুখে যে রূপ খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা করা গিয়াছে, গুদামের সম্মুখে ও সংলগ্ন সেইরূপ 'খলেনের' বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 'খলেনে' ফসল শুষ্ক করতঃ মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া অধিক দূরে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা নিকটে গুদাম থাকিলে কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। গুদাম ঘরের মেজ্ উচ্চ না হইলে আর্দ্রতা হেতু সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; এজন্য সাধারণ জমি হইতে উহা অন্ততঃ তিন ফুট উচ্চ করিতে পারিলে ভাল হয়। আবার যদি মেজ্ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ও ফাঁপা হয় তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, কেননা শেষোক্ত প্রকার 'মেজ্' অতিশয় শুষ্ক ও তন্নিবন্ধন তন্মধ্যে যে সামগ্রী থাকে, তাহাও অনেকটা নির্ভয়ে থাকে। গুদামের মধ্যে চারিদিকে কাষ্টের বা বাঁশের মাচান আবশ্যক কেননা তাহার উপরে ক্ষেত্রজাত ফসল সমুদায় রাখিতে পারিলে উহা আর্দ্র হইবার বা পচিবার তত আশঙ্কা থাকে না। 'খলেনে'

ফসল থাকাতে অনেক সময়ে বৃষ্টির দ্বারা ভিজিয়া যায়; সুতরাং উহার উপরে আচ্ছাদন করিতে পারিলে নিরাপদ হওয়া যায়।

খলিয়ানের মেজে উত্তমরূপে ইষ্টক ও রাবিশ দ্বারা পিটিয়া সিমেণ্ট করিতে পারিলে, ফসলের সহিত অধিক মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হইতে পারে না। মাঠে মৃত্তিকার উপরে খলিয়ান থাকিলে ফসলের সহিত অনেক মাটি মিশিয়া যায় এবং তাহা ঝাড়িতে বিস্তর পরিশ্রম হয় ও সময় যায় অথচ না পরিষ্কার করিলেও ফসলের মূল্য কম হইয়া থাকে। 'খলিয়ানের' আচ্ছাদন করোগেট আয়রণ (corrugated iron) বা টিনের চাদর দ্বারা তৈয়ার করিতে পারিলে বর্ষাকালে আর তন্মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। গুদাম ঘর যদি পাকা না হয়, তাহা হইলে উহারও ছাদ ঐরূপে তৈয়ার করা উচিত কেননা উহা যে কেবল বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা নহে, অগ্নির ভয়ও বিলক্ষণ আছে। গ্রীষ্মকালের দিনে প্রায়ই খড়ের ঘরে আগুণ লাগিয়া থাকে; তাহা হইতে সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। যদিও প্রথমতঃ ইহাতে কিছু নগদ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু ভবিষ্যতে অবিরাম ক্ষতির হস্ত হইতে নির্ভয়ে থাকিতে পারা যায়।

গুদামঘরে ইন্দুরের বড় উপদ্রব হইয়া থাকে, এজন্য তাহার এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সহজে গৃহমধ্যে প্রবেশাধিকার না পায়। ঘরের ভিত্তি বা দেয়ালের চারিদিকে ঢালু করিয়া মাটী দিতে হইবে। ঐ মাটির সহিত খোলার কুচি, কাঁচ ভাঙ্গা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকিলে উহারা সহজে তাহাতে গমন করে না। এতদ্ব্যতীত গৃহমধ্যে কোন স্থানে ইন্দুর মারিবার

কল ও অন্যান্য বিষাক্ত ঔষধ রাখিতে হইবে। ইহারা এতই উপদ্রব করিয়া থাকে ও এতই অনিষ্ট করে যে, ইহাদিগের বিনাশ সাধন করিতে কোন পাপ নাই বলিয়া আমরা মনে করি। এ সম্বন্ধে আর একটী উপায় আছে। গৃহমধ্যে সময়ে সময়ে গন্ধক পোড়াইয়া ধোঁয়া দিলে উহারা পলায়ন করে। গুদামঘরে জিনিষ পত্র এক স্থানে অধিক দিন রাখিয়া দিলেই উহারা নির্ব্বিঘ্নে আপন কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং সুবিধা ও অবসর মত সমুদায় জিনিষ গৃহমধ্যেই স্থানান্তর করা ভাল এবং মাল অধিক দিবস গৃহমধ্যে না রাখিয়া সুবিধামত মূল্য পাইলেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলা উচিত; নতুবা লাভের প্রত্যাশায় অধিক দিবস মাল আটক করিয়া রাখিলে, প্রথমতঃ টাকা আবদ্ধ, থাকে দ্বিতীয়তঃ ইন্দুরগণ সম্ভবতঃ লাভ সমেত আসল ভক্ষণ ও নষ্ট করে।

লাঙ্গল ও লাঙ্গল-বাহী।

লাঙ্গলের মুখে জমির উর্ব্বরতা। লাঙ্গল ভাল হইলে ভূমি কর্ষণও ভাল রূপে হইয়া থাকে। এই জন্য লাঙ্গল সংস্করণ লইয়া আজ কাল শিক্ষিত কৃষক মহলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং দেশীয় লাঙ্গল যে কিছুই নহে ইহা প্রতিপন্ন করিবার আয়োজন হইতেছে। যে দেশেই হউক, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়াই সকল প্রথা ও প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় কঠিন জমি যে দেশে, সে দেশে বিলাতি লাঙ্গল অশ্ব বা অশ্বতর দ্বারা চালিত হওয়া শোভা পায় এবং আবশ্যক হয়; কিন্তু ভারতে সেই লাঙ্গল চালাইতে হইলে হয় অশ্বের প্রয়োজন, না হয় দুইটীর স্থলে ছয়টী বা আটটী গোরুর প্রয়োজন। ভারতের সাধারণ জমি এতদূর কঠিন নহে যে, উহাতে বিলাতি লাঙ্গল চালান আবশ্যক। আমরা প্রত্যক্ষ্য দেখিতেছি যে, দেশীয় লাঙ্গল দ্বারা উত্তমরূপে কার্য্য হইয়া থাকে, তবে সাধারণতঃ চাষীগণ যাহা ব্যবহার করে তাহা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। দেশীয় ভাল ও দীর্ঘ ফাল্ বিশিষ্ট লাঙ্গল দ্বারা নয় দশ ইঞ্চ মৃত্তিকার কাজ হইয়া থাকে। শিবপুর-লাঙ্গল দেশীয় লাঙ্গলের উন্নত অবস্থা মাত্র সুতরাং উহাকে আমরা দেশীয় লাঙ্গল মধ্যে গণ্য করি।

শিবপুর-লাঙ্গলের বিশেষ গুণ এই যে উহাদ্বারা দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা ইষৎ গভীর করিয়া মাটি খোদিত হয় এবং সেই মাটি উল্টাইয়া পার্শ্বদেশে পড়ে। উক্ত লাঙ্গলের ফাল্ এমন

বক্র ভাবে গঠিত যে, ফালের মাটি উহার সংস্পর্শে আসিলেই উল্টাইয়া যায়, কিন্তু দেশীয় লাঙ্গলে তাহা হয় না। এই কারণে দেশীয় অপেক্ষা শিবপুর-লাঙ্গলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া যাইতে পারে। অনেকে ইহা ব্যবহার করিতে অসম্মত এবং তাঁহাদিগের অসম্মতির কারণ এই যে, দেশীয় গোরুতে বাহিতে কষ্ট পায়। প্রকৃত পক্ষে উহা যে বিশেষ ভারি তাহা নহে, তবে, ক্ষেত্রে টানিবার কালে উহার ফালে মাটি ইষৎ আটক পড়ে, ইহাতেই ভারি বোধ; কিন্তু দেশীয় লাঙ্গলে চষিবার কালে ফালের মুখোগ্রে যে মাটি পড়ে, তাহা দুই পার্শ্বে সরিয়া যায় সুতরাং দেশীয় লাঙ্গল ভারি বোধ হয় না। শিবপুর-লাঙ্গল যে সামান্য ভারি বোধ হয়, তাহা সহজেই দূর হইতে পারে। চাষীদিগের যে গোরু তাহার দ্বারা উহা চালিত হওয়া একবারেই অসম্ভব, কেননা উহাদিগের গোরু সচরাচর ক্ষুদ্র জাতীয় ও দুর্ব্বল, সুতরাং দেশীয় ভাঙ্গা লাঙ্গলই উহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। শিবপুর-লাঙ্গল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, দেশীয় বড়জাতীয় ও বলিষ্ঠ গোরু উহা অনায়াসে বাহিতে পারে। মহিষ দ্বারাও সহজে বাহিত হইতে পারে। এ সকল সত্ত্বেও মফঃস্বলে উহা প্রচলিত করা সুবিধা জনক নহে, কারণ উহা ভাঙ্গিয়া গেলে আর মেরামত হইবার উপায় নাই। মফঃস্বলে এমন লৌহ কারখানা নাই যথায় উহার ফাল মেরামত হইতে পারে। উহার ফাল ঢালা লোহায় (caste iron) নির্ম্মিত সুতরাং উহা সহরেও যে মেরামত হইতে পারে তাহা আমাদিগের মনে হয় না। একবার ফাল ভাঙ্গিলে পুনরায় নূতন একটা না প্রস্তুত করাইতে পারিলে আর উপায় নাই। বিশেষতঃ ঢালা লোহা অতি অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া

গিয়া থাকে এবং মফঃস্বলে মেরামতের উপায় না থাকায় আমরা উহা ব্যবহার করিতে নিরস্ত হইয়াছি।

দেশীয় লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া যে আমরা কখন ক্ষতি গ্রস্থ হইয়াছি তাহা মনে হয় না। দেশী লাঙ্গলের ফাল্ ঈষৎ ভারি ও লম্বা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করিলে বেশ কার্য্য চলিয়া থাকে। লাঙ্গলের যে কাষ্ঠে ফাল লাগান যায় উহাও কথঞ্চিৎ ভারি হইলে মাটি গভীর ভাবে খোদিত হইয়া থাকে এবং এক ক্ষেত্রে দুই তিন বার লাঙ্গল দিলে এক ফুট পর্য্যন্ত মাটি উঠিয়া থাকে। এ প্রকারের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে হইলে বড় ও বলিষ্ঠ গোরু আবশ্যক। রৈইস-বাগে এই লাঙ্গলের দ্বারা সুচারু-রূপে চাষ আবাদ হইয়া থাকে।

এদেশের গোরু ও মহিষদ্বারা হলচালনার কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের অভিজ্ঞতা এই যে, মহিষ অপেক্ষা গোরু দ্বারা কার্য্য ভাল ও অধিক হয়। দেশীয় গোরু মহিষ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে এবং শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা ও রৌদ্রনির্ব্বিশেষে যথেষ্ট পরিশ্রম করিলেও সহজে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু মহিষগণ স্বভাবতঃ সুস্থ এবং সহজে উহার চলিতেই বিলম্ব হয়। লাঙ্গলে বাঁধিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা যতক্ষণে একবার ঘুরিয়া আইসে, দেশীয় গোরু ততক্ষণে দুইবার, অভাব-পক্ষে দেড়বার ঘুরিয়া আইসে। এতদ্ব্যতীত মহিষগণ প্রাতঃকাল ও স্বায়ং কালে কাজ করিতে পারে, রৌদ্রের উত্তাপে আদৌ কাজ করিতে সক্ষম নহে এবং অধিকক্ষণ রৌদ্রে লাঙ্গল বাহিলে ক্লান্তি বশতঃ উহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে ও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে থাকে; অগত্যা তাহাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিতে হয়।

* গোরুর মধ্যে ষণ্ড ও বলদ আছে, কিন্তু ষণ্ড অপেক্ষা বলদের দ্বারা কার্য্য অধিক হইয়া থাকে। ষণ্ডগণের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কোমরের বলও কম, এজন্য লাঙ্গলের কার্য্য করিতে ইহারা সুপটু নহে। ষণ্ড অপেক্ষা বলদের আকার বড় হইয়া থাকে এবং তাহাদিগের শক্তির আধিক্যবশতঃ লাঙ্গল বাহিতে তত কষ্ট অনুভব করে না বলিয়া বোধ হয় এবং কষ্টসহিষ্ণুতাবশতঃ অধিকক্ষণ ও সকল সময়েই কার্য্য করিতে পারে এজন্য লাঙ্গলের কার্য্যে বলদ নিযুক্ত করাই উচিত।

লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃকাল। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে লাঙ্গল জুড়িলে প্রাতঃকালের ঠাণ্ডায় কাজ করিতে পশুদিগের তাদৃশ কষ্ট হয় না। বরং শীতকালে অধিক বেলা অবধি লাঙ্গল চালাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যখন সহজেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারা যায় না, তখন উহাদিগকে অধিক বেলা পর্য্যন্ত খাটাইয়া লইলে, উহাদিগের শরীর ভগ্ন হইবার কথা। পশুদিগকে সর্ব্বদা তাজা রাখিতে হইবে, খাদ্যাভাবে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ যেন কোন মতে দুর্ব্বল হইতে না পায়। উহাদিগকে দুই বেলা না খাটাইয়া প্রাতঃকালে অধিক করিয়া খাটাইয়া লওয়া ভাল, কেননা, প্রাতঃকালে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া তাহারা সমস্ত দিবস বিশ্রাম লাভ করিয়া পরদিবস পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সকালে একবার খাটাইয়া আবার বৈকালে কার্য্যে জুড়িলে তাদৃশ ভাল কাজ হয় না ও সেরূপ করাও উচিত নহে। দিবা রাত্রি খাটিলে মানুষের শরীর যেরূপ ভগ্ন হয়, সেইরূপ উহাদের হইয়া থাকে। কোন পশু পীড়িত হইলে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সম্বৎসর মধ্যে যোল বিঘা জমিতে আবাদ করিতে হইলে, এক জোড়া বলিষ্ঠ দেশী বলদ ও একখানি লাঙ্গল দ্বারা কাজ চলিতে পারে। এই পরিমাণ জমিকে কৃষিভাষায় এক-লাঙ্গল-জমি কহে অর্থাৎ এক লাঙ্গল জমি বা ভুঁই বলিলে যোল বিঘার অধিক জমি নহে বুঝিতে হইবে।

প্রতি চারি-লাঙ্গল-জমির জন্য এক জোড়া অতিরিক্ত গোরু রাখিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, কোন সময়ে কোনটা পীড়িত হইলে ক্ষেত্রের কার্য্য আটক থাকে না এবং মধ্যে মধ্যে দুইটী করিয়া গোরুকে বিশ্রাম দিতে পারিলে সকলগুলির স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কেবল যে লাঙ্গলের জন্যই গোরুর আবশ্যক তাহা নহে উহাদিগের দ্বারা শকটের কাজ ও চলিয়া থাকে। ক্ষেত্রের কার্য্যানুসারে দুই একখানি শকট রাখা আবশ্যক। কোন সামগ্রী কোথাও হইতে আনিতে হইলে অথবা কোথাও পাঠাইতে হইলে সতন্ত্র শকটের আবশ্যক হয় না। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত-সংখ্যক গোরু না রাখিলে ক্ষেত্র-কার্য্যের জন্য সারের বিশেষ অভাব হইয়া থাকে। শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বাবু ভুপাল চন্দ্র বসু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দেশীয় সাধারণ গোরুতে এক বৎসরে ত্রিশ মণ গোবর দিয়া থাকে। বড় জাতীয় গোরু হইতে ৪৯ মণ গোবর ও ১৪ মণ মূত্র পাওয়া যায়।* ভুপাল বাবুর উক্ত পরীক্ষা-ফল সাধারণের যে বিশেষ কার্য্যে আসিবে সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্ত হিসাব দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, একজোড়া বলদের মলমূত্র দ্বারা এক বিঘা জমিরও উপযুক্ত পরিমাণ সার হয় না, কারণ

* B. C. Basu's Notes on Indian agriculture. Page 149

প্রতি বিঘাতে অনেক সময় ১০০ মণের অধিক সার দিতে হয়। এই জন্য সারের সঙ্কুলনার্থ কয়েকটী বলদ অতিরিক্ত রাখিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, আবশ্যক মত বলদের সংখ্যা রাখিয়া কতকগুলি গাভী পুষিলে উভয় দিকই লাভ আছে,—দুগ্ধ দ্বারা সাংসারিক কার্য্য চলে, ও অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত হইলে উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে এবং উহার মল মূত্র দ্বারা সার সংগৃহিত হইয়া থাকে।

গৃহস্থের বাটীতে গোরু পুষিতে যে খরচ হইয়া থাকে, কৃষি-ক্ষেত্রে তাহাপেক্ষা অনেক কম খরচে হয়। বাটীতে যে গোরু পোষা যায়, তাহার সমুদায় খোরাক প্রায় খরিদ করিতে হয়, কিন্তু ক্ষেত্রের গোরু ক্ষেত্রজ অনেক পাতা, লতা, শাক সবজী ও ঘাস খাইতে পায়, সুতরাং তাহাকে অন্য ক্রীত সামগ্রী অতি অল্প পরিমাণে দিলে চলে। ক্ষেত্রে ধান্যের চাষ থাকিলে খড় কিনিতে হয় না, শাক সবজী থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত অংশ ইহারা পায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুবিধা আছে; এজন্য ক্ষেত্রে গোরু পুষিতে হইলে অতি অল্প খরচে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহাদিগের খোরাকীর জন্য ক্ষেত্র মধ্যে কিয়দংশ জমি সতন্ত্র রাখিয়া, তাহাতে নানাবিধ ফসল লাগাইয়া রাখিলে, সম্বৎসর উহাতেই তাহারা নির্ভর করিতে পারে। প্রত্যেক গোরুর জন্য তিন বিঘা 'বারো মেসে' ফসল রাখিতে হয় এবং এব-ম্প্রকারের ফসলের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে, বিলাতি গহমা (Reana Luxurians) সর্ব্বোৎকৃষ্ট;—লুসার্ণ (lucerne) মটর যদিও আমি স্বয়ং পরীক্ষা করি নাই, কিন্তু অনেকের মতে উহাও গবাদি গৃহ পালিত পশুর পক্ষে বলকারক ও উপাদেয় খাদ্য।

বিলাতি গহমার কথা যে বলা গেল, গত বৎসর রৈইসবাগে উহার অল্প পরিমাণে আবাদ করা গিয়াছিল। উহার গাছ ৮ হাত লম্বা হয় ও বৎসর মধ্যে চারিবার কাটিয়া লইলে চলে এবং যতবার কাটিয়া লওয়া যায়, ততবারই উহা ঝাড় বাধিয়া জন্মে। প্রতি ঝাড়ে, রীতিমত যত্ন করিলে, ৪০।৫০ টী গাছ হইয়া থাকে। গাছগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হইলেই কাটিতে আরম্ভ করা উচিত নতুবা উহা পাকিয়া গেলে কঠিন হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় পশুরা উহার নিম্নাংশ পরিত্যাগ করিয়া উপরের কোমলাংশ মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। গিনি ঘাস (guinea grass) ও বৎসরে চারি পাঁচ বার কাটিতে পারা যায়; উহার আকার উলুঘাসের ন্যায়, কিন্তু উহাপেক্ষা কোমল ও উপাদেয়। মাট-বাদামের গাছ বা কলাগাছ ও সুন্দর খাদ্য। গোরুর খাদ্য ক্ষেত্রে মজুত রাখা উচিত।

অক্ষত জমির উর্ব্বরতা।

যে জমি বহুকাল পতিত ও অনাবাদী তাহাকে অক্ষত জমি কহে। অক্ষত জমির মৃত্তিকার নাম (virgin soil) বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে এরূপ পতিত জমি বিস্তর দেখা গিয়া থাকে। ইদৃশ জমি যে পতিত থাকে তাহার দুইটী কারণ আছে,—প্রথমতঃ স্থানীয় প্রদেশের বা জেলায় লোকাভাব এবং দ্বিতীয়তঃ চাষ-বাসের পক্ষে মৃত্তিকার অনুপযোগীতা।

যে সকল মৃত্তিকার স্বাভাবিক গঠন আবাদোপযোগী অথচ নানাবিধ কারণে পতিত থাকিয়া গুল্ম লতাদির দ্বারা বহু দিবস

হইতে আবৃত, তাহার উর্ব্বরতা সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। একেই ত চাষ আবাদ না হইলে জমির পূর্ব্বরক্ষিত বা স্বাভাবিক সারপদার্থ-সমূহ ক্ষেত্রমধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তাহাতে আবার বহুদিবসের জঙ্গল থাকায়, সেই জঙ্গলের পাতা লতা ও শাখা প্রশাখাদি পচিয়া গিয়া জমিতেই মজুত থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ফসলের আবাদ করিলে যেরূপ জমির উর্ব্বরতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জঙ্গল জন্মিয়াও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। এরূপ ধারণা যে অমূলক তাহা নহে, কারণ ক্ষেত্রে যাহা কিছু জন্মে, তাহাতেই জমির সারাংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে সমুদায় উদ্ভিজ্জাদি তন্মধ্যে জন্মিয়া থাকে, তাহা যদি ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতে না দেওয়া যায় অর্থাৎ যথাকার সামগ্রী তথায়ই পচিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের পূর্ব্বস্থিত সমুদায় সারাংশ পূর্ব্ববৎ না হইলেও রূপান্তরিত হইয়াও ক্ষেত্রমধ্যেই অবস্থিতি করে। অধিকন্তু সেই সকল উদ্ভিজ্জের দ্বারা বায়বীয় পদার্থও ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সেই উদ্ভিদগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরদেশ হইতে নানা-বিধ সারপদার্থ উপরিভাগে আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রকে সজীব রাখে। অক্ষত জমিতে সচরাচর নাইট্রোজেন নামক পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে, এই কারণে উহাতে যে ফসল দেওয়া যায় তাহাই সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হয়।

জমি যতই অধিক দিনের পতিত হয়,—যতই জঙ্গলময় হয়, ততই উহা সারবান হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রের জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহার উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া থাকে সুতরাং অনাবশ্যক স্থলে ক্ষেত্রের জঙ্গল কাটিয়া

ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। আর যদি নিতান্তই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা কাটিয়া ক্ষেত্রমধ্যেই পচিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে জমির সারপদার্থ জমিতেই থাকে, অধিকন্তু নানাবিধ সার জমিতে সংযোজিত হয়।

অক্ষত-জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষ যাহা লক্ষ্য করিয়াছি নিম্নে তাহা বিবৃত করিলাম। রৈইসবাগ মধ্যে কিয়দংশ জমি বহুকাল হইতে অনাবাদী ছিল এবং তাহাতে এতই উলু-ঘাস ও জঙ্গলাদি জন্মিত যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। গত ১৮৯২ সালে উপরোক্ত জমির জঙ্গল মুক্ত করতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তিন চারি মাস এতদবস্থাতেই ফেলিয়া রাখা হয়। তদনন্তর উহাতে পাটের ও তৎপরে সরিষার আবাদ করা যায়। বলা বাহুল্য যে, আবাদীক্ষেত্র অপেক্ষা নূতন ক্ষেত্রে প্রায় ত্রিগুণ অধিক ফসল হইয়াছিল এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার ও জমি কোপাইবার খরচাদি বাদে দুই ফসলে বিঘা প্রতি ২৫৲ টাকা লাভ ছিল।

যে সকল জমিতে লবণ, ক্ষার, চূণ প্রভৃতির আতিশয্যবশতঃ অনেক দিবসাবধি পতিত আছে তাহাও সারবান সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সকল জমিতে সমধিক পরিমাণে দাহ্যপদার্থ সংযোজিত করিলে অধিকতর সারবান হইয়া উঠে, নতুবা তদবস্থাতেই চাষ আবাদ করিলে ধাতবীয় পদার্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ তাদৃশ আশাজনক ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, যে কোন প্রকারের জমিই হউক, আবাদী অপেক্ষা পতিত জমির উর্ব্বরতা অধিক।

মৃত্তিকার বিশ্রাম।

প্রাণীগণের মধ্যে,—উদ্ভিদগণের মধ্যে যে রূপ ক্লান্তি আছে এবং তাহা দূর করিবার জন্য যে রূপ বিশ্রামের আবশ্যক, তদ্রূপ মৃত্তিকার ও কান্তি কাছে, সুতরাং তাহার ও বিশ্রামের আবশ্যক হয়। অবিরাম শ্রম করিলে জীব দেহ ভগ্ন হয়, উদ্ভিদ দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্তিকা ক্ষীণ হয়। অতএব ক্লান্তির পরে বিশ্রামের আবশ্যক হইয়া থাকে।

বারম্বার এক ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করিলে তাহা ক্লান্ত হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাতে সার পদার্থের অভাব হয় এবং এই অভাব মোচন করিবার জন্য জমিকে বিশ্রাম দিতে হয়। বিশ্রাম দেওয়া অসম্ভব হইলে, যথোচিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা উচিত। মৃত্তিকার ক্লান্তির সময় অনুমান করা বিশেষ কি আদৌ কষ্টকর নহে। প্রথম অবস্থায় যে রূপ উহাতে ফসল জন্মিবে যতই ক্ষেত্র পুরাতন হইবে, ততই উহার সেই শক্তি হ্রাস হইতে থাকিবে, কিন্তু সার প্রয়োগ করিলে সেই অভাব আর দৃষ্টি গোচর হয় না। সার প্রয়োগ করিলেও সময়ে সময়ে জমিকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

জমিকে ৩।৪ বৎসর অন্তর একবার বিশ্রাম দিয়া পরে উহাতে সার সংযোগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, চাষাগণ জমিকে বিশ্রাম দিলে তাহাতে আর সার সংযোগ করে না, কারণ বিশ্রাম কাল মধ্যে মৃত্তিকা আপনা হইতেই বা হইতে সমধিক পরিমাণে সার বস্তু আহরণ করতঃ

পুনরায় সজীব হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ফসল উৎপন্ন করিয়া লইলে মৃত্তিকা নির্জীব হইয়া পড়ে।

সকল ক্ষেত্রেরই যে বিশ্রাম আবশ্যক হয় তাহা নহে, কারণ এরূপ অনেক জমি আছে, যাহা প্রতিবৎসর জলে প্লাবিত হইয়া যাওয়ায়, যথেষ্ট পরিমাণে 'পলি' সঞ্চয় করে। সেই সঙ্গে মৃত্তিকার অনেক সামগ্রী সঞ্চয় হইয়া থাকে। ভিন্ন প্রস্তাবে 'পলি'র বিষয় সতন্ত্র রূপে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এ স্থানে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, যে সকল ভূমি জলপ্লাবন, বন্যা বা অতিরিক্ত বর্ষায় ডুবিয়া যায়, তাহার বিশ্রামের আবশ্যক হয় না. বরং উহার জল শুকাইয়া গেলে, তাহাতে যে ফসল হইয়া থাকে. তাহা 'ডাঙ্গা' জমির অপেক্ষা অনেক অধিক। নদীর কিনারা বা মধ্যে যে সমুদায় চর আছে, তাহা বর্ষায় ডুবিবা যায় বলিয়াই এত উর্ব্বরা ও এত শস্যশালিনী।

বেলে মাটি।

ইহার কথা একবার স্থানান্তরে বলিয়াছি, কিন্তু যে জমির কথা হইয়াছে, তাহা অল্পায়াসে উন্নত করা যাইতে পারে অথবা সে প্রকার জমিতে আবাদ চলিতে পারে। কিন্তু যে জমিতে বালির ভাগের আতিশয্য ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের নিতান্ত অভাব, তাহাতে কোন ফসল জন্মিতে পারে না, সুতরাং উহা অকর্ম্মণ্য ভিন্ন আর কি? রৈইসবাগে এইরূপ একখণ্ড জমি ছিল ও তাহাতে কোন গাছই জন্মিতে পারা যায় নাই; অধিক কি বর্ষাকালে কদাচ তাহাতে তৃণ জন্মিত। পরে উক্ত খণ্ড জমিতে

ঘনভাবে কদলীবৃক্ষ লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা উত্তমরূপে জন্মিয়াছে। ঐসকল গাছে কলা ফলিলে উহা কাটিয়া আনা যায় ও পরে অবশিষ্টাংশ জমিতেই ফেলিয়া রাখা হইয়া থাকে। কলাক্ষেত্রে সর্ব্বদা রস থাকে, ও গাছের অবশিষ্টাংশ পচিয়া যাইয়া যে সার সঞ্চিত হইতেছে, তাহাতে উহা শীঘ্রই আবাদোপযোগী হইবে সন্দেহ নাই।

বেলে-ভূমি একবারে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া পতিত ফেলিয়া রাখা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। উহাতে কলা বাগান করিলে আয়ও হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকার ও উন্নতি হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা ইদৃশ জমিতে কলা বাগান করিবার পরামর্শ দিই। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে অন্য প্রস্তাবে আমরা তাহার বিষয় বিসদৃশ রূপে আলোচনা করিয়াছি।

নোনা মাটি।

অনেক জমি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে লবণাধিক্য বশতঃ কোন রূপ আবাদ হয় না, এতন্নিবন্ধন পতিত পড়িয়া থাকে। এইরূপ নোনা জমিতে তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না, কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিজ্ঞান সাহায্যে প্রকৃতি পরাস্ত স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে অনেক নোনা ভূমিতে চাষ বাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

নোনা ভূমির প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রচণ্ড উত্তাপের দিনে উহার উপরিভাগে লবণবৎ শ্বেত বর্ণের এক পদার্থ আপনা হইতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইয়া যাইবার পরে যখন ইদৃশ জমি শুষ্ক হইয়া যায়, তখন সেই সূক্ষ্ম শ্বেত বর্ণের পদার্থ

জমির উপরে দেখা য'য়। উহা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা এখন ও সুনিশ্চিত করিয়া কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং আন্দাজ ও স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা অনুশীলন দ্বারা অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহা যে ধাতবীয় লবনের অংশ তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এই শ্বেত পদার্থকে 'রে' বা 'উষর' কহিয়া থাকে। উষর মধ্যে প্রধানতঃ সল্‌ফেট অব সোডা (Sulphate of Soda) ও কার্ব্বনেট অব সোডা (carbonate of soda) লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উহা ধাতবীয় পদার্থ ও তাহার আস্বাদন লবণাক্ত, এজন্য যে জমিতে উহার আতিশয্য দেখা যায়, তাহাতে কোন ফসল জন্মিতে পারে না। 'উষর' ভূমির সঙ্গে ভাল জমি ও থাকে, আবার ভাল জমির সন্নিকটেও 'উষর' ভূমি দেখা যায়। উষর ভূমিতে যে জলাশয় থাকে তাহা ও লবণাক্ত। কলিকাতা হইতে দমদমা যাইবার রেল পথের পূর্ব্বাংশে উল্টাডিঙ্গী নামক স্থানে কাশিপুর ইনষ্টিটিউশনের কৃষিকার্য্যের জন্য এক খণ্ড সুবৃহৎ জমি আছে। উহা প্রায় ১০০ বিঘার অধিক হইবে। পূর্ব্বে উক্ত ইনষ্টিটিউশনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় উক্ত ক্ষেত্র খণ্ড সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা আছে। এই জমির কিয়দংশ 'উষর' ছিল এবং সেই জমিতে দুই তিন বৎসর কোন রূপে কোন ফসল জন্মাইতে পারা যায় নাই ও সেই জমি চাষোপযোগী করিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ চাষ ও রাশি রাশি সার দিয়াও দুই তিন বৎসর উহাতে কোন ফসল সুচারু রূপে জন্মিতে পারে নাই। চৈত্র বৈশাখ মাসে দেখা গিয়াছে যে 'উষর' ক্ষেত্রময় ভাসিয়া আছে,

কিন্তু বৃষ্টির সময় উহা লক্ষিত হইত না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবার কারণ উহা দৃষ্টিগোচর হইত না, কি জলের ভারে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত, তাহা এক্ষণেও আমাদিগের সন্দেহ আছে; কিন্তু ডাক্তার ভোয়েল্কার সাহেব শেষোক্ত মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে, বৃষ্টি হইলে উহা মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করে এবং যতই মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইতে থাকে, ততই সূর্য্যের আকর্ষণে উহা জমির উপরে পৌঁছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে জমির আর্দ্রাবস্থায় তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত বা অনুভূত হইত না, কিন্তু জমি শুকাইয়া গেলেই ফসলের অনিষ্ট হইত; একারণ উক্ত জমিকে নিরন্তর আর্দ্র রাখা যাইত। এই জমিতে বা ইহার মৃত্তিকাতে যখনই কোন বীজ বপন করা হইত, উহা অঙ্কুরিত হইবামাত্রেই গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। লবনের ধর্ম্ম পদার্থকে ক্ষয় করা, সুতরাং স্পষ্টই আমরা দেখিয়াছি যে চারাগুলির গোড়া ক্ষয় হইয়া পড়িয়া যাইত। উক্ত জমিখণ্ড আবাদোপযোগী করিয়া তুলিতে বোধ হয় ইনষ্টিটিউশনের কর্ত্তৃপক্ষের শত শত মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও যে উহাতে নির্ব্বিঘ্নে আবাদ করিতে পারা যায়, তাহা বলিতে পারি না।

'উষর'-ভূমি খালি ফেলিয়া রাখিলে, ইহ জন্মে উহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না। উহাতে ক্রমাগত চাষ দিয়া যে কোন ফসল বুনিয়া উহাকে সর্ব্বদা আবৃত রাখা আবশ্যক। যদি কোন ফসল না হয়, অন্ততঃ দুর্ব্বাঘাস, বাবুল, ডিবি-ডিবি প্রভৃতির ঘন আবাদ করিয়া দেওয়া উচিত। অনেকে বলিতে পারেন যে, যাহাতে কোন ফসল জন্মে না, তাহাতে এ সকল গাছ জন্মিবে

কেন ? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, এই সকল গাছ 'ঊষর' ভূমির জন্য বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত। তবে প্রথমতঃ উহা রোপণ করিবার পূর্ব্বে, ক্ষেত্রে উত্তমরূপে বারম্বার লাঙ্গল ও সমধিক পরিমাণে সার প্রদান করিতে হইবে। মনুষ্যের মলমূত্র দিতে পারিলে ভালই হয়, তদভাবে গোময় বা অন্য প্রাণীজ সার, খইল ইত্যাদি দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। দূর্ব্বাদল ঘনভাবে জন্মিলে, তাহা গবাদি পশুগণ যাহাতে না খাইয়া ফেলে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিছুদিন উহা ক্ষেত্র আবৃত করিয়া থাকিলে, উহারই সারে ক্ষেত্রের 'ঊষর' ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিবে। বাবুলাদি বৃক্ষদ্বারাও এইরূপে ক্ষেত্রের উপকার হইয়া থাকে।

'ঊষর' ভূমিতে আবাদ করিবার আর এক উপায় আছে। ক্ষেত্রকে সমতল করিয়া চারিদিকে আ'ল বাঁধিয়া দিলে ক্ষেত্রের সমুদায় জল বাহির হইতে না পাইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তাহাতে 'ঊষর' সহজে উপরদিকে আসিতে পায় না। অধিক রৌদ্র লাগিলেই 'ঊষর' উপরে আইসে এজন্য ক্ষেত্র সর্ব্বদা ফসলাবৃত থাকা আবশ্যক। বর্ষাকালের ফসলের উপর 'ঊষর' বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, বৃষ্টির জলে জমি সর্ব্বদা আর্দ্র হইয়া থাকে ও ক্ষেত্রে ফসল থাকায় তন্মধ্যে রৌদ্রের উত্তাপ অধিক প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু উহাতে রবি শস্যের আবাদ করিতে হইলে ক্ষেত্রে বিস্তর পরিমাণে জল যোগাইতে হয়, এই কারণে সাময়িক ফসল না দিয়া স্থায়ী গাছের আবাদ করিতে পারিলে সুবিধা আছে। গাছ লাগিয়া গেলে জমি ছায়াযুক্ত হয়, তন্নিবন্ধন উহাতে রসাভাব হয় না এবং সূর্য্যোত্তাপ প্রবেশ করিতে না পারায় 'ঊষর' আর উপরে

উঠিয়া আসিতে পারে না। আবার সেই সমুদায় গাছের শাখা পত্রাদি ক্ষেত্রমধ্যে পড়িয়া সারে পরিণত হইয়া থাকে।

জমি পুড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্য।

আবাদ করিবার পূর্ব্বে জমি পুড়াইয়া দিবার প্রথা এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। নূতন জমি, অথবা আবাদী-ক্ষেত্রের ফসল উঠিয়া গেলে, কৃষকেরা জমি পুড়াইয়া দেয়। তদনন্তর যথাবিধি চাষ দিয়া ক্ষেত্রকে আবাদের উপযোগী করিয়া লয়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এপ্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে এবং কিপ্রকারেই বা তাহা সম্পন্ন করা উচিত তাহাই এ প্রস্তাবে আলোচিত হইবে।

অনেক দিবস হইতে আবাদ হওয়া বশতঃ যে ক্ষেত্র ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে,—যে জমিতে অতিরিক্ত তৃণাদিও বিরক্তিকর জঙ্গল জন্মে, অথবা যে জমির প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এইরূপ জমিই সচরাচর পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। সাধারণ কৃষকগণ যে প্রাণালীতে এই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, তাহা অসম্পূর্ণ বলিয়া যে কেবল আমাদিগের ধারণা তাহা নহে, কারণ পরীক্ষাদ্বারা আমরা দেখিয়াছি যে, ক্ষেত্রের অবস্থা ও গঠন নির্ব্বিশেষে জমি পুড়াইয়া দিলে কোথাও সুফল, কোথাও কুফল প্রসবিত হইয়া থাকে। এজন্য সেই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপন করা উচিত।

আবাদী ফসল উঠিয়া গেলে, ক্ষেত্রে যে অবশিষ্ট ফসলের অংশ এবং তৃণাদি জন্মিয়া থাকে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া কৃষক

নিশ্চিন্ত হয়; ইহাতে কোন স্থান পুড়ে, কোন স্থান পুড়িতে পায় না। এইরূপ অবস্থাতেই কৃষক স্বীয় ক্ষেত্রে হলচালনাদি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু মাঠে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপে যাহারা ক্ষেত্রে আগুন লাগাইয়া দেয় তাহাদের ক্লিস্ত উদ্দেশ্য সমধিক পরিমাণে বা নিশ্চয়রূপে সংসাধিত হয় না। যে জমিতে যবক্ষারজানের অভাব, তাহাতে উহা পুনরানয়ন করিবার জন্য জমি জ্বালাইয়া দিতে হয়। যবক্ষারজান জমিতে কি পরিমাণে আছে, তাহা বুঝিবার পন্য অপর কাহারও সাহায্যের আবশ্যক হয় না। যে ক্ষেত্রের গাছ সরল, সুপুষ্ট ও ঘন স্বাভাবিক-বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে যবক্ষারজানের অভাব নাই জানিতে হইবে ও ইদৃশ জমি পুড়াইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই জানিয়া, উহা হইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত, নতুবা উহা উপেক্ষা করিয়া যদি সেই জমিকে পুড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্রস্থিত যবক্ষারজান হ্রাস হইয়া যায়। এ বিষয়ে অনেক মত ভেদ দেখা যায়, কারণ তাঁহারা বলেন যে, জমি পুড়াইয়া দিলে এক দিকে যেমন ক্ষেত্রস্থিত যবক্ষারজান নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি অন্য দিকে ক্ষার সংযোগে বহুল পরিমাণে উক্ত পদার্থ বায়ু ও বৃষ্টি হইতে আসিয়া থাকে। এ কথা আমরা জানি যে, ক্ষার সংযোগে বায়ু ও বৃষ্টি হইতে উহা ক্ষেত্রে আসিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই যে ক্ষেত্রে উহার যথেষ্ট অংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে পুনরায় উহা সংযোজিত করিলে কেবল গাছেরই অবয়ব পরিপুষ্ট হইবে, কিন্তু যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য (যেমন ধান্য ও গম গাছের ফসল ধান্য ও গম) তাহার উপকার না হইয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কৃষকেরা যে প্রণালীতে ক্ষেত্র জ্বালাইয়া

দিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে এবং তদ্দ্বারা জমিতে সাক্ষাৎ ভাবে অগ্নির কোন কার্য্য হয় না, সুতরাং জঙ্গলাদি পুড়িয়া যে ক্ষার জমে, তদ্দ্বারা যবক্ষারজানই সংগৃহিত হয়। আবার যাহারা জমিতে দুই একবার লাঙ্গল দিয়া, তদুপরে জঙ্গলাদি পুরু করিয়া বিস্তৃত করতঃ জ্বালাইয়া দেয়, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ক্ষেত্রের দাহ্য-পদার্থাংশ (organic matter) জ্বালাইয়া দেয় এবং দাহ্যপদার্থ জ্বলিয়া ভস্মে পরিণত হইলে উহাতে কার্ব্বনের (carbon) অংশ কমিয়া যায়। মৃত্তিকা মধ্যে কার্ব্বনের অংশ না থাকিলে আমোনিয়া পদার্থ থাকিতে পারে না। হাইড্রোজেন (Hydrogen) ও নাইট্রোজেনের (nitrogen) সংযোগে আমোনিয়ার (ammonia) উৎপত্তি।

আবর্জ্জনাদি জ্বলিয়া একবারে ছাই হইয়া গেলে, উহার মধ্যে কেবল ধাতবীয় পদার্থের আধিক্য থাকে এবং তন্মধ্যস্থিত জলীয় যে যে পদার্থ ছিল, তাহার অভাব হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে কিছুই উপকার হয় না। মৃত্তিকা মধ্যে দাহ্যপদার্থ (organic matter) না থাকিলে, উহার রসধারণাশক্তির অভাব হয়, মৃত্তিকা কঠিন হয় ইত্যাদি অনেক দোষ ঘটে। আমরা যে প্রণালীতে জমি পুড়াইয়া দিয়া থাকি নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

ক্ষেত্রের ফসল উঠিয়া গেলে, উহাতে একবার দীর্ঘে ও প্রস্থে লাঙ্গল দিয়া থাকি, তৎপরে ক্ষেত্রের শুষ্ক আবর্জ্জনা স্থানে স্থানে একত্র করিয়া সমুদায় ক্ষেত্রময় পাতলা করিয়া বিস্তৃত করিয়া দেওয়া যায়। যে সময়ে বাতাসের কিছুমাত্র বেগ থাকে না, এরূপ সময়ে উহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলে, সেই সমুদায় আবর্জ্জনা ধীরে

ধীরে পুড়িতে থাকে। বাতাস বেগে বহিতে থাকিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে দাহ্যপদার্থ অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায় ও সমুদায় ভস্মে পরিণত হয়। ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে জমিতে দাহ্য পদার্থের অভাব হইয়া থাকে, এই কারণে সংগৃহিত আবর্জ্জনা যাহাতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে না পায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যদি জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার উপরে লাঠির আঘাত করিয়া অথবা জল ছিটাইয়া, কিম্বা অল্প পরিমাণে মাটী বা ছাই চাপা দিতে হয়। এবম্প্রকার করিলে উহা ধীরে ধীরে ও ধূমাকারে পুড়িতে থাকিবে। ক্ষেত্রময় অতি পাত্‌লা করিয়া আবর্জ্জনা বিস্তৃত করিবার কথা যে বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উহাতে মৃত্তিকার উপরে অধিকক্ষণ উত্তাপ লাগিতে পায় না। কিন্তু পুরু করিয়া দিলে ও অধিকক্ষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলে, মৃত্তিকার সারাংশ পুড়িয়া যায় এবং মৃত্তিকাও লালবর্ণে পরিণত হয়। যে মৃত্তিকা পুড়িয়া কৃষ্ণাভাযুক্ত না হইয়া লাল হইয়া উঠে তাহা অতিরিক্ত পুড়িয়াছে জানিতে হইবে। এই কারণে ক্ষেত্রের উপর পাত্‌লাভাবে আবর্জ্জনা বিস্তৃত করিতে হইবে এবং তাহা যাহাতে ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধীরে ধীরে ও বিনা প্রজ্জ্বলনে যে ক্ষেত্র পুড়িতে পায়, তাহার মৃত্তিকা লালবর্ণ প্রাপ্ত হয় না এবং উদ্ভিজ্জপদার্থসমূহ একবারে ভস্মে পরিণত না হইয়া দানাযুক্ত অঙ্গারাকার প্রাপ্ত হয়। এই প্রণালীতে জমি পুড়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বালিমাটিযুক্ত জমি স্বভাবতঃই আল্‌গা ও নীরস, সুতরাং উহাতে অগ্নি না দেওয়া ভাল। এরূপ জমিতে অগ্নি দিলে তাহার

উদ্ভিজ্জাংশ পুড়িয়া গিয়া আরো নিরস হইয়া পড়ে। তবে উহাতে ছাই দিতে হইলে, উদ্ভিজ্জাদি অন্য স্থানে উপরোক্ত প্রণালীতে পুড়াইয়া ক্ষেত্র মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। 'বোদ' ও হাল্‌কা মাটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইলে উহাকে উত্তমরূপ পুড়াইয়া লইলে উদ্ভিজ্জাংশ পুড়িয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। চিক্কণ-মাটিকে হাল্‌কা করিবার জন্য উপরোক্ত প্রণালীতে আবর্জ্জনা বিস্তৃত করিয়া দুই তিন বার অগ্নি দেওয়া উচিত। একবারে অধিক পরিমাণে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চিক্কণ মাটি স্বভাবতঃ কঠিন ও উহার সারাংশ জ্বালাইয়া দিলেও অতিরিক্ত পরিমাণে ভস্ম উহাতে সংযোজিত হইলে, জমি ততোধিক কঠিন হয় ও তাহার শিরার সূক্ষ্মতা ঘুচিয়া স্থূলতা আনয়ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিরা সূক্ষ্ম হওয়াতেই চিক্কণ-মাটির শোষণ, ধারণাদি ক্ষমতা অধিক।

অনেক দিবসের পতিত ও জঙ্গলময় জমি লইয়া যাহারা কৃষিকার্য্য করিতে সূত্র পাত করেন, তাহারা সেই জমিকে এতই নিষ্ঠুর ভাবে দগ্ধ করিয়া থাকেন যে, উহার গর্ভস্থিত অধিকাংশ সারভাগ নষ্ট হইয়া যায়। পতিত জমিতে স্বরোপিত অরণ্যজাত বৃক্ষলতাদি জন্মিয়া থাকে এবং তাহার শাখা, পত্র ও শিকড়াদি ক্রমান্বয়ে ভূপতিত হওয়ায়, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা সারপূর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহাতে হলচালনাদি করিলে স্বতঃই উর্ব্বরা হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় উহাকে না পুড়াইয়া দেওয়া ভাল, তবে উহার জঙ্গলাদি বিনষ্ট করিবার জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া ক্ষেত্রের কোন নিভৃত অংশে জ্বালাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না।

যে ক্ষেত্র অতিশয় নিকৃষ্ট ও অনুর্ব্বরা অথবা অনেক দিবস হইতে ফসল প্রদান করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ জমি পুড়াইয়া দিলে তাহার উপকার হয়, কিন্তু পুড়াইবার প্রথা যাহা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অবলম্বন করা উচিত অর্থাৎ আবর্জ্জনা পুড়িয়া যাহাতে ভস্ম না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। জমিতে দানা-যুক্ত ছাই থাকিলে তাহার আকর্ষণ-শক্তি বৃদ্ধি পায় ও তন্নিবন্ধন উহা বাতাস ও বৃষ্টি হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু উহার অভাবে বায়ু মৃত্তিকার উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না এবং যে বৃষ্টিপাত হয় তাহাও অতি শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া জমির পূর্ব্বাবস্থা আনয়ন করে।

আমরা অনেক কথা বলিলাম বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, ক্ষার দ্বারা জমির কোন উপকার নাই। ক্ষারও সকল জমিতেই অল্পাধিক পরিমাণে আছেই, কিন্তু জমি নিষ্ঠুর ভাবে পুড়াইয়া দিলে কেবল ক্ষার ও তদানুসঙ্গিক সামান্য পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ থাকিয়া যায় এবং জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ সমূহ হ্রাস হইয়া যায়। ক্ষার চূণ প্রভৃতি অদাহ্য পদার্থ দ্বারা উদ্ভিদ শরীরের কাষ্ঠ (wood) ও ফলের পুষ্টি সাধন করে, কিন্তু যবক্ষারজান ও আমোনিয়া দ্বারা উদ্ভিদের বাহ্য শরীর অর্থাৎ পত্র, শাখা, ছাল প্রভৃতি পুষ্টিলাভ করে। সুতরাং উদ্ভিদের জন্য এ সকলই আবশ্যক, তাহা বলিয়া ক্ষারের জন্য জমির দাহ্য পদার্থ নষ্ট করা উচিত নহে। অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষেত্র মধ্যে ক্ষার দিবার প্রয়োজন হইলে, স্থানান্তর হইতে ভস্ম আনিয়া দিলে সে উদ্দেশ্য সমাহিত হইতে পারে।

আর একটী কথা বলিলেই আমাদের এ প্রস্তাব শেষ হয়। ক্ষেত্র মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়া দিলে তন্মধ্যস্থিত কীটাদি নষ্ট হইয়া যায়, ক্ষেত্রের দূষিত বায়ু সংশোধিত হয় এবং যে স্থানে দুর্গন্ধ থাকে, তাহা ও অনেকাংশে হ্রাস হয়। যাহা হউক ক্ষেত্রের অবস্থা ও গঠন এবং জ্বালইবার উদ্দেশ্য মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিলে আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিয়া বা বলিয়া অন্যকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, এ সকল কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায়।

জল, বায়ু ও সারের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ।

প্রাণী জীবনের জন্য প্রথমে বায়ু, তৎপরে জল এবং সর্ব্বশেষে পুষ্টিকর আহারীয় সামগ্রীর যে রূপ প্রয়োজন, উদ্ভিজ্জীবনে ও ঠিক সেইরূপ। মনুষ্য বায়ু ব্যতিরেকে একমুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারে না; তৎপরে বাঁচিয়া থাকিলে জীবন ধারণের জন্য জলের আবশ্যক। জল পান করিয়া মানুষে প্রায় ১৫ দিবস বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থায় অর্থাৎ কেবল মাত্র জলপান করিয়া শীর্ণ শরীরে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা. সুতরাং সুস্থ ও সচ্ছন্দে থাকিতে হইলে সারবান আহারের প্রয়োজন। উদ্ভিদগণ ও বিনা সারে এবং কেবল মাত্র জল ও বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু সার ব্যতীত উহার পুষ্টি সাধন হয় না।

বায়ু হইতে উদ্ভিদ অক্সিজেন (oxygen) আহরণ করিয়া

জীবন ধারণ করে; উহার অভাবে উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। জীবন থাকিলেই তাহার আহারের প্রয়োজন এবং সেই আহার জল। কেবল মাত্র জল পান করিয়া উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকে এবং ফলও প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা তাদৃশ সারবান হয় না এবং পরিমাণেও অতি সামান্য হইয়া থাকে। এই সকল কারণে ক্ষেত্রে সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষেত্রে যতই উৎকৃষ্ট ও অধিক সার দেওয়া যায়, ততই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সার প্রয়োগে যে কেবল ফসলের উপকার হইয়া থাকে কিম্বা জমির সাময়িক উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা নহে। ইহাদ্বারা ক্ষেত্রের পূর্ব্বস্থিত সার নষ্ট না হইয়া ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান থাকে। বিনা সারে যে সকল জমির আবাদ হইয়া থাকে তাহা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ফসলও ভাল রূপে জন্মিতে পারে না। এজন্য বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, সার ব্যতীত কোন ফসল সুচারুরূপে জন্মিতে পারে না এবং অন্যান্য বিষয়ের সহিত সারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে, আবাদ করিয়া লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে।

সব্জী-সার।

সচরাচর সারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে,—যথা উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ। প্রত্যেক সারই ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জলজ ও স্থলজ যত প্রকার বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম পচিয়া যে অবশিষ্ট পদার্থ থাকে, তাহাকে উদ্ভিজ্জসার কহে। উদ্ভিজ্জসার আমাদিগের দেশ মধ্যে তাদৃশ যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হয় না ও সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাতা, লতা, প্রভৃতি লোকে সংগ্রহ করিয়া জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহার করে কিন্তু ইহাতে ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের পত্র, জঙ্গলাদি যদি সংগ্রহও না করা যায়, তথাপি উহা ক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া পচিয়া যাইলে, মৃত্তিকার সামগ্রী মৃত্তিকায় পুনরাবর্ত্তন করে। উদ্ভিদ-সারের ব্যবহার যে এত অল্প তাহার কারণ এই যে, উহা অতিশয় স্নিগ্ধ, এবং উহার শিরাদি বিগলিত হইয়া মৃত্তিকাস্থিত জল ভাগের সহিত সম্মিলিত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, যে কোন সার হউক, উহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জলের সহিত সমভাবে মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ উহা উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হয় না।

উদ্ভিদ-সারের মধ্যে সব্জী-সার (green manure) অনেক স্থলে ব্যবহার হয়। শন, নীল, অড়হর, ছোলা, পুষ্করিণীর পানা ও শেওলা প্রভৃতি কোমল জাতীয় উদ্ভিদ সদ্য আনিয়া ক্ষেত্রে বর্ষার পূর্ব্বে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, তাহাতে লাঙ্গল দিলে, বর্ষার ক্রমাগত বৃষ্টিতে উহা শীঘ্রই দ্রবীভূত হইয়া যায়, ও তাহাতে জমি

উর্ব্বরা হইয়া উঠে। সবুজী সার দ্বারা যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। * নাগপুর গবর্ণমেণ্ট ফারমে গমের ফসলে সবুজী সারের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল:—

বৎসর	যে সার দেওয়া হয়।	উৎপন্নের পরিমাণ পাউণ্ড ওজন।		বাঙ্গালা ওজন মণ হিসাবে।	
১৮৯০—৯১	নাম	শস্য	খড়	শস্য	খড়
	তারোটা গাছ (cassia auiri) culata	৬৬৫	১২৩৯	৮।২॥	১৫।৯॥
„	বিনা সারে	৪৪৩	৭২২	৫॥১॥	৯/১
„	শণ গাছ	৭৩৪	১১৮৫	৯/৭	১৪৸২॥
„	বিনা সারে	৬১২	৯৬২	৭॥৬	১২/১
১৮৯১—৯২	তারেটা	৫৭০	৯১৭	৭/৫	১১/৩॥
	বিনা সারে	৪৮৩	৭৬৭	৬/১॥	৯॥৩॥

উপরে যে পরীক্ষার ফল লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সবুজী-সার প্রদান করিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেও অনেক দিবস হইতে চাষ আবাদ করায় যে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাতে লোক অড়হরের চাষ করে; ইহাতে জমির উন্নতি হইয়া থাকে। অড়হর, বুট,

*Report ofthe Nagpur Exprimental Farm, Year 1890-91 ; 1891-92.

নীল, শন প্রভৃতি শ্রেণীর গাছ দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন হইয়া থাকে। এই সকল গাছ লিগুমিনোসা (leguminosa) শ্রেণীভুক্ত এবং এই শ্রেণীর প্রায় সকল গাছই বায়ু ও মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে পত্র ও শিকড় দ্বারা যবক্ষারজান সঞ্চয় করিয়া থাকে, সুতরাং সেই সমুদায় গাছ ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করিলে মৃত্তিকায় যবক্ষারজানের অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, অথবা ক্ষেত্রে যবক্ষারজান আনয়ন করিতে হইলে, ঐ সকল ফসল আবাদ করিয়া, তাহাতে ফল হইবার পূর্ব্বে সেই সমুদায় গাছ কাটিয়া মৃত্তিকার সহিত লাঙ্গল দিলে উপকার হইয়া থাকে। যে সকল গাছের পাতা বা শিকড়াদি স্থূল ও কঠিন তাহা মৃত্তিকায় মিলিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয়, এজন্য তাহা সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না।

খৈল।

খৈল উদ্ভিজ্জ-সারের অন্তর্গত। সর্ষপ, মসিনা, তিল, নারিকেল, মাট-বাদাম প্রভৃতি নানা জাতীয় খৈল আছে। তন্মধ্যে সর্ষপ, মসিনা, রেড়ী ও মাটবাদামের খৈল বিশেষ প্রচলিত। জলের সহিত ইহা সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং ইহাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অধিক থাকায়, সকল ফসল ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করে। ইক্ষু, আলু, পাট, ধান প্রভৃতি ফসলে আমরা বারম্বার খৈল সাররূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি, সুতরাং সাধারণে যাহাতে ইহা ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ চেষ্টা। খৈল দ্বারা ত সবিশেষ উপকার

হইয়াই থাকে, অধিকন্তু যে সকল গোরু উহা ভক্ষণ করে, তাহা-দিগের মল-মূত্রও বিশেষ বা তদনুরূপ উপকারী। খৈল-ভক্ষিত ও খৈল-অভক্ষিত গোরুর মল-মূত্র অনেকে সতন্ত্রভাবে সতন্ত্র ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, খৈল ভক্ষিত গোরুর সার শেষোক্ত গোরুর সার অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের ও সারবান। এ পরীক্ষা করিবার আমাদিগেরও সুবিধা হইয়াছিল, কারণ একবার রৈইসবাগে গোরুর সার অল্প পরিমাণে থাকায়, অন্যস্থান হইতে উহা আনা হইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে রইসবাগের গোরুকে খৈল খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু যে স্থান হইতে অন্য সার আনিত হইয়াছিল, তথাকার গোরুকে আদৌ খৈল দেওয়া হইত না। এই দুই প্রকার গোবর-সার ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, রৈইসবাগের খৈল-ভক্ষিত গোরুর সার শেষোক্ত প্রকার অপেক্ষা সারবান, সুতরাং গোরুকে অধিক পরিমাণে খৈইল খাওয়াইলে দুইদিকে লাভবান হওয়া যায়;—প্রথমতঃ গোরু সকল সবল হয়, দ্বিতীয়তঃ উহার মল-মূত্রও অধিকতর সারবান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বলদ বা ষণ্ডগণ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে এবং গাভীগণ অধিক পরিমাণে সারবান দুগ্ধ প্রদান করে। এতাধিক সুবিধা ও লাভ সত্বেও যাহারা গো জাতিকে খৈল দিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী ও দৃষ্টি-কৃপণ।

খৈল ব্যবহার দ্বারা কেবল আমরাই যে উপকার লাভ করিয়াছি তাহা নহে। আজ কাল অনেকেই ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং সকলেই একবাক্যে উহার প্রশংসা

করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-ফারম সমুদায়ে খৈল প্রতি বৎসর ব্যবহৃত হইতেছে এবং প্রতি বৎসরই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। খৈলের মূল্য অধিক নহে, সচরাচর পাঁচ সিকা হইতে দেড় টাকা মূল্যে প্রতি মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। সকল সময়ে মফঃস্বলের অনেক স্থানে খৈল পাওয়া যায় না, এজন্য সুবিধা মত পাওয়া গেলে, একবারে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। যত্ন করিয়া কোন আবৃত স্থানে রক্ষা করিলে, খৈল নষ্ট হয় না ও অনেক দিবস পর্য্যন্ত থাকে। প্রকৃত ও বিচক্ষণ কৃষকমাত্রেই উহা সর্ব্বদা ক্ষেত্রে মজুত রাখিবেন।

ক্ষেত্রে খৈল দিবার পূর্ব্বে চূর্ণ করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়, নতুবা বড় বড় টুকরা বিগলিত হইতে বিলম্ব হয় এবং ক্ষেত্রময় সমভাবে ছড়াইয়া না পড়িয়া কোথাও বেশী পড়ে, কোথাও কম পড়ে; ফলতঃ ফসলও ক্ষেত্রময় সমভাবে না জন্মিয়া কোথাও ভাল, কোথাও সাধারণভাবে জন্মিয়া থাকে। যাহারা মনে করেন যে, ভাঙ্গিয়া দিলে সার শীঘ্র নিস্বঃ হইয়া পড়ে, অতএব উহা বড় বড় টুকরা সমেত দেওয়া ভাল, আমরা তাঁহাদিগের সহিত একমত নহি। আমরা উহার শীঘ্র ফল চাহি, সুতরাং যাহাতে উহা শীঘ্র ফল প্রসব করিতে পারে, এরূপ করিয়া ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিতে হইবে।

প্রাণীজ-সার।

মনুষ্য, অশ্ব, গো, মেষাদির মল মূত্র এবং মৃত জীব মাত্রেই প্রাণীজ-সারের অন্তর্গত। এই সকল সার উদ্ভিদ শরীরে অতি শীঘ্র কার্য্য করিয়া থাকে। যদিও উপরোক্ত সার সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থের রূপান্তর মাত্র এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের সহিত সম্বন্ধ, তথাপি ইহার গুণ ও কার্য্য উদ্ভিজ্জ-সার হইতে অনেক দ্রুত ও ফলদায়ক। বাঙ্গালা দেশে প্রাণীজ-সারের মধ্যে অশ্ব, গো এবং মেষের মল-মূত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয় এবং মনুষ্যের মল-মূত্রের একবারে কোন ব্যবহার নাই বলিলেই হয়, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। মনুষ্য-সার ব্যবহার না থাকিবার অনেক গুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে যে দুই একটী প্রধান তাহাই আমরা বলিতেছি। মনুষ্যের মল-মূত্র হিন্দুর পক্ষে একবারেই অস্পৃশ্য এবং কোন প্রকারে স্পর্শিত হইলে স্নান না করিলে শরীর শুদ্ধ হয় না, সুতরাং হিন্দুর পক্ষে উহা ব্যবহার করা একবারে সম্ভব নহে। মুসলমান বা নিকৃষ্ট জাতিতে উহা ব্যবহার করিতে নারাজ। যদিও উহাদিগের অন্য কোন সংস্কার নাই তথাপি উহার যে দুর্গন্ধ, তাহাতে সহজে কেহ ব্যবহার করিতে সম্মত হয় না। আমরা অনেকবার এই সার ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু লোকদিগের অসম্মতি বশতঃ উক্ত নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপন করিতে ভরসা পাই নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদিগের আদৌ পরীক্ষাজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই।

তাহা বলিয়া যদি আমরা এ বিষয় ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে অনেক পাঠক অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এইজন্য এ স্থলে আমাদিগকে পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতে হইল। এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন, যিনি ইহার উপকারীতা বুঝিয়া কোন উপায়ে স্বীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারেন। মেথর চাকর রাখিতে পারিলে ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা চলিতে পারে। মেথর রাখিয়া অনায়াসে কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু তথাপি অনেকের আপত্তির কারণ এই যে, ক্ষেত্রে উহা প্রদান করিলে ফসলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ কথাটী সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। কোন ফসলের শেষ অবস্থায় যদি ক্ষেত্রে উহা প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উহার দুর্গন্ধ ফসলকে আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের অন্যান্য সার বিষয়ের অভিজ্ঞতা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ফসলের প্রথম বা মধ্যম অবস্থায় যদি প্রদান করা যায়, তাহা হইলে উহার সে দুর্গন্ধ ফসলের উপর কোন কার্য্য করিতে পারে না, কারণ অধিক দিবস বাহিরে থাকিলে, উহার যে দুর্গন্ধ থাকে তাঁহা নষ্ট হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, ক্ষেত্রে উহা বিস্তৃত করিলে তাহার দুর্গন্ধে তথায় বাস করা কঠিন, কিন্তু আমরা বলি যে, ক্ষেত্রে 'বিষ্ঠা' ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপরে যথেষ্ট পরিমাণে ছাই অথবা অল্প পরিমাণে চূণ চাপা দিলে, সে দুর্গন্ধ আর বাহির হইতে পারে না। ছাই ও চূণ দুর্গন্ধযুক্ত বায়বীয় (ammonia) পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখে, কিন্তু 'বিষ্ঠা' অমনি ছড়াইয়া রাখিয়া দিলে, উহার অনেক বায়বীয় সারাংশ উড়িয়া যায়, সুতরাং ছাই বা চূণ চাপা

দিয়া সেই বায়বীয় পদার্থকে ধরিয়া রাখা উচিত। অনেক স্থানে উহা গুঁড়ার আকারে প্রস্তুত করিয়া পরে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উল্লিখিত গুঁড়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী সহজ। ক্ষেত্রের কোন প্রান্তভাগে 'বিষ্ঠা' বিস্তৃত করিয়া উহার সহিত ছাই, চূণ, বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ রাখিয়া দিলে অবশ্যক মত ব্যবহার করা যাইতে পারে 'উষর' ভূমির সহিত বিষ্ঠা অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে উহার অনেক দোষ কাটিয়া যায়।

কৃষি কার্য্যের জন্য গোরুর সার বিশেষ প্রয়োজনীয়, এই জন্য উহা না জ্বালাইয়া, যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা উচিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, গোবর কেবল গৃহস্থের জ্বালানীর কার্য্য করে। ইহাতে গৃহস্থের সাশ্রয় হয় বটে, কিন্তু কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরের যাবতীয় গোবর ও গো-মূত্রাদি প্রায় নষ্ট হয়, আর পল্লী গ্রামের লোকেরা প্রায় উহা পুড়াইয়া ফেলে। পল্লী-গ্রামের লোকেরা যে উহা পুড়াইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তথায় জ্বালানী কাষ্ঠের সকল সময় সচ্ছলতা থাকে না এবং দরিদ্র লোকেরা অর্থাভাব বশতঃ কাষ্ঠ খরিদ না করিয়া, বারমাসই গোবর হইতে ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া পুড়াইয়া থাকে। গোয়াল-ঘরে ধূম দিবার জন্য ও অনেক গোবর পুড়ান হয়। এইরূপ নানা কার্য্যে গোবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ও তন্নিবন্ধন ক্ষেত্র উহা হইতে বঞ্চিত হয়। যাঁহাদিগের কৃষিক্ষেত্র আছে, তাঁহাদিগের পক্ষে গোবর বিশেষ সার, এজন্য যাহাতে তাঁহাদিগের স্ব স্ব ও প্রতিবেশী-দিগের গৃহপালিত পশু হইতে যে গোমায়ু পাওয়া যায় এবং কোন মতে নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রতিবেশীগণ

উহা দিতে অসম্মত হইলে, মূল্য দিয়া অথবা তাহার বিনিময়ে জ্বালানী কাষ্ঠ দিয়া স্বীয় ক্ষেত্রে আনয়ন করা উচিত। প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করা যেমন অতীব প্রয়োজন, উহাতে সার প্রদান করা ততোধিক আবশ্যক।

গবাদি পশুর মল-মূত্র প্রতিদিন গোয়ালঘর হইতে বাহির করিয়া যথা ইচ্ছা ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। যে সার কৃষি কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা যত্ন পূর্ব্বক তৈয়ার করা উচিত, নতুবা এক্ষণে সচরাচর যে ভাবে প্রাণীজ আবর্জ্জনাদি রক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত কদর্য্যপ্রথা এবং অনেক সারাংশ আবর্জ্জনা হইতে বাহির হইয়া গিয়া সারকে সারত্ব বিহীন করে। সমতল ভূমিতে ও অনাবৃত স্থানে সার স্তূপীকৃত হইলে, উহা হইতে জলীয় অংশ, জল ও বাস্পাকারে বাহির হইয়া যায় এবং যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহাও তাদৃশ কর্ম্মণ্য হয় না। এতদ্ব্যতীত সার স্তূপ করা থাকিলে, স্বতঃই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, ও তন্নিবন্ধন উহার সারাংশ কতক জলাকারে ও বাস্পাকারে বাহির হইয়া যায়। তদতিরিক্ত আরো এই অনিষ্ট হয় যে, সেই উত্তাপে সার (solid) ভাগ পুড়িয়া যায়। সার অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যে ফল হয়, উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও, যদিও ভস্মে পরিণত না হউক, সারবস্তু পুড়িয়া যায়। সংগৃহিত সার-রাশি যখন উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন উহার মধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করান দুষ্কর। তাপমান যন্ত্র (thermometer) উত্তপ্ত স্তূপ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, উহার উত্তাপের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। স্তূপের মধ্যে যখন উত্তাপের কার্য্য (Fermentation) আরম্ভ হয়, তখন উহার উপরে লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া

যায় যে, তাহা হইতে বাস্প উঠিতেছে এবং উহা যতই উত্তপ্ত হইতে থাকে, ততই উহা হইতে অধিকতর বাস্প নির্গত হয়, ও অবশেষে উত্তাপের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, অর্থাৎ দাহ্য পদার্থ সমুদায় দগ্ধ হইয়া গেলে, আর উত্তাপ দেখা যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, যতক্ষণ সার মধ্যে জলীয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ উহার অভ্যন্তর দাহ হইতে থাকে, যেমন জলের অভাব হয়, তেমনি উত্তাপ হ্রাস হয়। সারের প্রথমাবস্থার সহিত এই অবস্থার তুলনা করিলে স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে, টাট্‌কা সার হইতে দগ্ধ-সার কত লঘু ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়াও যদি কেহ সারের তারতম্যতা নিরাকরণ করিতে না পারেন, তবে টাট্‌কা সার ও দগ্ধ সার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিয়া পরীক্ষা করিলে, সকল সংশয় আপনা হইতেই মীমাংসিত হইবে এবং তখন পরীক্ষাকারী ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, দগ্ধ সারের কার্য্য টাট্‌কা সারাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট,-অনেক কম। তাই বলিয়া একবারে টাট্‌কা সার (fresh dung) ব্যবহার করিতে আমরা পরামর্শ দিই না, কারণ উহারও কয়েকটী দোষ আছে এবং সেই দোষ ক্ষালন না হইলে যদি উহা ক্ষেত্রে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্র ও ফসল উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হয়।

টাট্‌কা সার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহাকে কথঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইতে দেওয়া উচিত, কেন না, তাহা হইলে সেই উত্তাপে সারের গর্ভস্থিত যে কিছু শস্যাদি পুড়িয়া যায়, অর্থাৎ সেই উত্তাপে উহার অঙ্কুরিত হইবার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা দ্বিতীয় উপকার এই যে, স্তুপস্থিত সার বায়বীয় পদার্থের সংস্রবে আসিয়া

ও রাসায়নিক ক্রিয়াবলে অপেক্ষাকৃত সারবান হইয়া উঠে। এই স্তূপকে অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে, এবং যদি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই স্তূপে আবশ্যক মত জল দিয়া উহা নিবারণ করিতে হইবে। উত্তপ্ত স্তূপে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে উহা শীতল হয় এবং উত্তাপ আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমে উপশমিত হয়।

সারের যাঁহারা মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহারা সার রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইবেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সার অনাবৃত স্থানে রক্ষা করা বিধি নহে। সার রক্ষার জন্য একটী ইষ্টক নির্ম্মিত হৌজ করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, এবং সার রক্ষার পক্ষেও নিরাপদ হওয়া যায়। হৌজের ভিতর সিমেণ্ট ধরান হইলে আর সারের জলীয় অংশ উহা শোষণ করিতে পারে না। এরূপ হৌজ নিৰ্ম্মাণ করা ব্যয় সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহার আর্থিক অবস্থার সঙ্কুলান আছে, তাঁহাকে আমরা ঐ রূপ হৌজ নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। যেখানে হৌজ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব, তথায় একটী গভীর ও প্রশস্ত গর্ত্ত খনন করতঃ উহা উত্তমরূপে মাটী ও গোবর দ্বারা লেপন করিয়া, তন্মধ্যে নিত্য সার জমা করিতে হইবে। এই-রূপে সার সংগৃহিত হৌজ বা গর্ত্তের উপরে একটী আবরণ থাকা উচিত এবং তাহা খড়ের 'চালা' হইলেও চলিবে। হৌজ বা গর্ত্তের অধিক উপরে 'চালা' নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক নাই, তবে এরূপ ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে রৌদ্র ও বৃষ্টি সারে না লাগিতে পারে। সাররাশি মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা উল্টাইয়া দিলে, অনেক পরিমাণে উহার উত্তাপ হ্রাস হইয়া যায়, ও সমুদায়

সার সমভাবে উত্তপ্ত হইয়া থাকে, নতুবা ভিতরের সার হয়ত অধিক উত্তাপ পাইয়া এক প্রকার হয়, আর উপরিভাগের সার অন্য প্রকার হয়।

টাট্‌কা সার (long dung) ও পুরাতন সারের (muck) কার্য্য সতন্ত্র। টাট্‌কা সার দ্বারা জমি আল্‌গা ও সারবান হয় এবং পুরাতন সারে তাদৃশ হয় না। চিক্কণ মৃত্তিকায় টাট্‌কা সার দিলে উহা আল্গা হয়, কিন্তু বেলে মাটিতে দিলে উহা আরো আল্গা হইয়া গিয়া নীরস হইয়া পড়ে, সুতরাং শেষোক্ত প্রকারের জমিতে সদ্য টাট্‌কা সার না দিয়া পুরাতন গলিত সার দিলে বালির আল্গা স্বভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। পুরাতন সারে সার পদার্থ অল্প থাকে, এজন্য উহার শক্তিও অধিক দিন থাকে না। সার দুই তিন মাস স্তূপ মধ্যে থাকিলেই ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, আর অধিক দিবস স্তূপ মধ্যে রাখিতে হইলে, উপরোক্ত প্রণালীতে উহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সদ্য টাট্‌কা সার অপেক্ষা পুরাতন সারে স্নিগ্ধতা অধিক, এজন্য পরস্পরের ফল সতন্ত্র। সবজী-ক্ষেত্রে নূতন ও পুরাতন সার ভিন্নরূপে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহার ফলে জানিয়াছি যে, নূতন সারে গাছের শীঘ্র শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু সেই সকল সবজীর আস্বাদন কথঞ্চিৎ বিকৃত হয়, সুতরাং সবজী পক্ষে অপেক্ষাকৃত পুরাতন সারই প্রশস্ত।

ঘোড়ার সার বড় তেজস্কর ও খনিজ নানাবিধ লবণবিশিষ্ট। স্তূপমধ্যে কিছুকাল রাখিয়া উহার তেজ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইলে পরে উহা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। অন্যথা ব্যবহার করিলে

শস্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গালাদেশে ঘোড়ার সার ব্যবহার হইতে দেখা যায় না, ইহার কারণ এই যে, উহা সাধারণ চাষীগণের আয়ত্ত্বাধীন নহে। ধনীদিগের আস্তাবলে অনেক ঘোড়া-সার উৎপন্ন হয়, কিন্তু সহিস ও কোচমানেরা তাহা রাত্রিকালে জ্বালাইয়া দেয়। যাহা হউক, উক্ত সার কোন মতে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। নিস্তেজ ভূমিতে অথবা যে ভূমিতে গহমা, ইক্ষু, ভূট্টা জন্মে; তাহাতে উহা প্রদান করিলে উপকার হইয়া থাকে।

ভেড়ী সার অতি অল্প পরিমাণে জন্মে, এজন্য উহা কৃষকের পক্ষে সহজে সুবিধাজনক নহে। যাহারা সব্জীর আবাদ করে, তাহারা ইহা ব্যবহার করিলে লাভবান হইতে পারে। তামাকের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট সার। ভেড়ী ও ছাগলের সার অত্যন্ত নীরস এজন্য উহার স্তূপ সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিবার জন্য জল দেওয়া আবশ্যক। উক্ত সার অতি অল্প স্থান মধ্যে রক্ষিত হইতে পারে, সুতরাং ইহা বড় বড় গামলায় সংগ্রহ করতঃ জল পূর্ণ করিয়া রাখিলে শীঘ্রই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। যাহাতে উহার বাষ্পীয়-সার ভাগ উড়িয়া না যায়, সে জন্য তাহার উপরে কোন আচ্ছাদন দেওয়া উচিত এবং সমভাবে পচিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গামলার মধ্যস্থিত সার উল্টাইয়া দিয়া পুনরায় ঢাকিয়া দিতে হয়। ভেড়ীর সার অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে উহা অমূল্য সার। যাহারা ভেড়ী পুষিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ মাসিক বন্দোবস্তে কৃষকগণ যদি তাহা সংগ্রহ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মূত্র বিষ্ঠা অপেক্ষা মূল্যবান। মূত্রের মধ্যে আমোনিয়ার অংশ অধিক থাকাতেই উহার এত মূল্য, কিন্তু মূত্র সংগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, যাবতীয় মূত্র গোয়ল-ঘরের জমিতেই শুকাইয়া যায়। গোয়াল-ঘরের ভূমিতে সিমেণ্ট দেওয়া থাকিলে, উহা জমিতে না শুকাইয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হইতে পারে। মেটে গোয়াল-ঘরের মূত্র সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য এক সহজ উপায় আছে তাহা এই যে, প্রতি দিবস প্রাতঃকালে গোয়াল-ঘর ব্যাপিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ছাই ছড়াইয়া দিতে হয়, ও পরদিবস উহা উঠাইয়া গোমায়ূর স্তূপে ফেলিতে হয়। এইরূপ প্রতিদিন ছাই দিলে সমুদায় মূত্র উহা কর্ত্তৃক শোষিত হয়। যেখানে মূত্র সংগ্রহের পাকা বন্দোবস্ত আছে, সেখানে প্রতিদিন সংগৃহিত মূত্র স্তূপের উপর ঢালিয়া দিলে, মল ও মূত্রে সুন্দর সার প্রস্তুত হয়। সংগৃহিত মূত্রের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিলে অতি শীঘ্র কার্য্য দর্শিয়া থাকে। সকল প্রকার মলই জলে গুলিয়া এই প্রকারে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন সারই ঘন (solid) থাকিতে উদ্ভিদের ব্যবহারে আইসে না, কিন্তু যতই তরল পদার্থের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই উহা উদ্ভিদের ব্যবহারে আইসে। ঘন-সার উপরোক্ত অবস্থায় পরিণত হইতে বিলম্ব হয়, বলিয়াই উহার কার্য্য উদ্ভিদ শরীরে প্রতিফলিত হইতে বিলম্ব হয়। কোন গাছ বা ফসলের প্রথম অবস্থায় উহা অধিক পরিমাণে আহরণ করিলে উহার অবয়ব বৃদ্ধি হয়, সুতরাং উহা ফসলের সময় বা কিছু পূর্ব্বে প্রদান করিলে ফলনের পরিমাণ অধিক

হয়। তরল-সার গাছের গোড়ায় দিলে পাঁচ ছয় দিবসের মধ্যে উহার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। একরাত্রি মধ্যে ইহার কার্য্য হইতে আমরা দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার শীতকালে কয়েকটী গোলাপের গাছে গোবর গুলিয়া দেওয়া যায়। এই সময়ে গাছে ১০।১২ টী কুঁড়ি বা মুকুল ছিল, কিন্তু উহা প্রস্ফুটিত হইতে ৪'৫ দিবস বিলম্ব ছিল। তরল-সার অধিক পরিমাণে দেওয়াতে পর দিবস প্রাতেই সকল কুঁড়িগুলি যে কেবল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা নহে, উহার বর্ণ ও জ্যোতীর আধিক্য বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছিল। তরল-সার ফুল বাগানে ও সব্‌জী ক্ষেত্রে সমধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তরল-সার গাছের পূর্ণাবস্থায় অর্থাৎ ফল বা ফুলের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা সময়ে দিতে হয়, নতুবা গাছের অবয়ব বৃদ্ধি হইয়া ফল ধারণ পক্ষে উদ্ভিদগণ অসমর্থ হয়। ফল বা ফুল ধরিবার অধিক দিবস পূর্ব্বে তরল-সার গাছের গোড়ার দিলে অবিলম্বে উদ্ভিদ তাহার সার পদার্থ আহরণ করিয়া লয় সুতরাং উহার আর অধিক দিবস শক্তি থাকেনা।

তরল-সার যে কেবল জীবের মূত্র ও গবাদি পশুর মল হইতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নহে। মূত্রের সহিত মনুষ্যের ও পশুর মল, খইল, পচা মাছ, মাংসাদিও তন্মধ্যে দিয়া কিছুদিন পচিতে দিতে হয়। তাহা উত্তমরূপে পচিলে ক্ষেত্রে প্রদান করিতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-রাসায়নিক সাহেব (Sir Humfrey Davy) বলেন যে, অধিক দিবস তরল সার রাখিয়া দিলে তাহার অনেক সার পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু পচিলে উহাতে আমো-

নিয়া বিশিষ্ট লবনের আবির্ভাব হয়, কিন্তু উক্ত লবণ (ammon-iacal-salts) তত কার্য্যকরী নহে, সুতরাং তরল-সার সদ্য সদ্য ব্যবহার করা উচিত। সার উত্তপ্ত হইয়া পড়িলে যে তাহার অনেক তেজ কমিয়া যায়, ইহা অন্য প্রস্তাবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চীন দেশে তরল সারের বিশেষ আদর। তথায় গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য পশুদিগের উপর সারের জন্য নির্ভর করা চলে না। চীনবাসীগণ মনুষ্যের মল-মূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া তরল করে। তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চতম কর্ম্মচারী (mandarin) সেই তরল-সার-বিশিষ্ট পাত্র কোন ঢাকণী দ্বারা বদ্ধ করতঃ শীল-মোহর করিয়া দেন। পাঁচ ছয় মাস পরে যখন উহা তৈয়ার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি স্বয়ং সেই মোহর ভাঙ্গিয়া পাত্রস্থিত সার ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে কি না পরীক্ষা করেন। ব্যবহারোপ-যোগী হইয়া থাকিলে, তিনি এক সার্টিফিকেট দেন, ও তখন তাহা বোতল মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়।

আল্‌গা জমিতে তরল-সারের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়, এবং অনেক পরীক্ষার ফলে বলিতে পারি যে, উহা যে কোন ফসলে প্রদান করা গিয়াছে তাহাতেই দেখা গিয়াছে যে, গাছের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং অতিরিক্ত পরিমাণে ফসলও জন্মিয়াছে। অন্যান্য জীবের মল-মূত্র অপেক্ষা মনুষ্যের মল-মূত্র তেজোবান সুতরাং মূল্যবান। জাপান দেশেও মনুষ্যের মল-মূত্রই প্রধান সার এবং এজন্য প্রত্যেক কৃষকের ক্ষেত্রে একটী পায়খানা থাকে,—পথিক-গণ তথায় ইচ্ছামত আসিয়া শৌচ প্রস্রাবাদি কার্য্য সারিয়া যায়। ক্ষেত্র-স্বামী প্রতি দিন সেই পায়খানার মল-মূত্র হয়

কোন স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেন, কিম্বা ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া দিয়া আবাদ করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামবাসীদিগের নিকট মনুষ্যের মল-মূত্রের গুণের বিষয় অজ্ঞাত নাই, কারণ, তথায় অধিকাংশ লোকই শৌচ প্রস্রাবাদি কার্য্য ময়দানে মাঠে সারিয়া আসে। এতন্নিবন্ধন তথায় যাহা কিছু জন্মে তাহাই ভাল হইয়া থাকে। অনেক পতিত ক্ষেত্র, যথায় লোকে এই সকল কার্য্য করে, সে স্থান উহার প্রভাবে এত জঙ্গলময় হয় যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায় না।

মনুষ্যের মল-মূত্র সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, কারণ আজ কাল প্রায় সকল সহরেই মেথরে ময়লা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যায়। অনেক সহরে মিউনিসিপালিটী দ্বারাও একার্য্য হইয়া থাকে। এই মেথর বা মিউনিসিপালিটীর সহিত কোন আর্থিক বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, তাহারা ক্ষেত্রে গিয়া সেই ময়লা ঢালিয়া আসিতে পারে, এবং তাহার দুর্গন্ধ উপশম হইলে ক্ষেত্র-স্বামী অনায়াসে তাহাতে চাষ আবাদ করিতে পারেন। দুই চারিটা, ক্ষেত্রের আকার অনুসারে,—মেথর চাকর রাখিলে এই সারের দ্বারা ক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। আমরা শুনিয়াছি, পশ্চিম ও বোম্বাই অঞ্চলের অনাবাদী ও পতিত জমি, যাহা লোকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া গ্রহণ করিত না, উক্ত সার ব্যবহার করায় এক্ষণে তাহার খাজনা ৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এক্ষণে যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, যে প্রকার দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহাতে বিঘা প্রতি ৫।৭।১০ মণ ধান্য উৎপন্ন করিলে চলে না, সুতরাং তাহার উর্ব্বরতা সাধন করিবার জন্য নূতন ব্যাপারে হস্তক্ষেপন করিতে হইবে। আমরা

শুনিয়াছি, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে চালের মূল্য ছিল ১॥ বা ২৲ টাকা করিয়া মণ, কিন্তু এক্ষণে তিন টাকার নিম্নে ভারতের কুত্রাপি পাওয়া যায় কি না জানি না। এই অতিরিক্ত খরচ উঠাইবার জন্য অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন না করিলে আর উপায় নাই, সুতরাং সেই অতিরিক্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিতে হইলে ক্ষেত্রের সেবা আবশ্যক,—ক্ষেত্র যাহাতে উর্ব্বরা হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। বৃথা আলস্য, বৃথা ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে। অন্নাভাবে দেশের লোকের হাহাকার সত্ত্বেও যদি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি রাজনীতিজ্ঞ হয়েন, পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হয়েন, তথাপি দেশকে সভ্য বলা যায় না। দেশে অন্ন চাই,—অর্থ চাই, তবে দেশে উন্নত হইবে, এবং সেই অন্ন ও অর্থের একমাত্র উপায়,—কৃষিকার্য্য ও তাহার উন্নতি সাধন।

অস্থি-সার।

যাবতীয় মৃত প্রাণীর অস্থি চূর্ণ করিলে যে পদার্থ হয়, তাহাকে অস্থি-সার বলে। অস্থি-সার ব্যবহার দ্বারা অনেকে অনেক প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, এজন্য তাহার কার্য্য সম্বন্ধেও মত-ভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক পক্ষ সমর্থন করেন যে, উহার ব্যবহার মাত্রেই উপকার পাওয়া যায়; অপর পক্ষ বলেন যে, মৃত্তিকার গঠণের উপর উহার কার্য্য নির্ভর করে। এই ভিন্ন মত অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যতই দিন যাইবে ও উহার পরীক্ষা হইবে, ততই উভয় মতাবলম্বীদিগের এ সম্বন্ধে নানা শাখা প্রাশাখা বাহির হইবে।

অস্থি মধ্যে চূণের আধিক্য থাকায়, সকল জমিতে একই ভাবে কোন মতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। চূণবিশিষ্ট জমিতে (Calcareous soil) স্বভাবতঃ ২০ ভাগের অধিক চূণ বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং অবিবেচনার সহিত উহাতে চূণ বিশিষ্ট সার মিশ্রিত করিলে, কোন কোন ফসলের অনিষ্ট হইতে পারে। বেলে-মাটীতে দিলে, মাটী অধিকতর আল্‌গা হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন জমির অবস্থা নীরস হইয়া পড়ে, এবং ক্ষেত্রের শিরা (Capillary tubes) আল্‌গা হইয়া যাওয়ায়, উপরের উত্তাপ মৃত্তিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অতিশয় উত্তপ্ত করে, ও তাহাতে ক্ষেত্র স্থিত ফসলের অনুপকার হয়। একদিকে যেরূপ অস্থিসার দ্বারা অপকার হইয়া থাকে, অন্যদিকে, স্থানবিশেষ আবার তাহার দ্বারা সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অস্থি চর্ণকে যদি সতন্ত্রভাবে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উহাকে আমরা সার মধ্যে না গণিয়া, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবার পক্ষে সাহায্যকারী বলিলেও বলিতে পারি। প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ-সার যেরূপ সাক্ষাৎভাবে উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে, অস্থি-সার সেরূপ পারে কি না, তাহা এখনও বিবেচ্য ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। যতদূর আমরা স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি, এবং অপরাপর কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার ফল শুনিয়াছি, তাহাতে কোন প্রকারে বলিতে পারি না যে, অস্থিচূর্ণ সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য করিতে পারে। একই ফসল দুই খণ্ড জমিতে, অস্থিচূর্ণ ভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করিয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতেই এই ধারণা। এক ক্ষেত্রে কেবল অস্থিচূর্ণ, অপরক্ষেত্রে অস্থিচর্ণ ও উদ্ভিজ্জসার একত্র মিলাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে

দেখা গেল যে, যে খণ্ড জমিতে কেবল মাত্র অস্থিসার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অপর খণ্ড জমির ফলনের পরিমাণ ও গুণ অধিক ছিল। ইহাও পরীক্ষিত হইয়াছে যে, বিনা সারে যে পরিমাণে ফলন হইয়া থাকে, অস্থিচূর্ণপ্রদত্ত জমিতে তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশ্বাস যে, মৃত্তিকার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত হওয়ায়, মৃত্তিকার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, কেবল মাত্র অস্থিচূর্ণের উপরে কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে কি না? তাহাতে বীজ রোপন করিলে গাছ জন্মে, কিন্তু কিছু দিবস পরে তাহা মরিয়া যায়, সুতরাং ইহাদ্বারা আমরা বুঝিয়াছি যে, অস্থির মধ্যে যতদিন দাহ্য (organic) পদার্থ থাকে ততদিন গাছটী বাঁচিয়া থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সেই দাহ্য পদার্থ উদ্ভিদ কর্তৃক আহৃত হইলে উহা মরিয়া যায়। বিনা অস্থিসারে যে ফসল কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এবং জমিতে অস্থিচূর্ণ যে মিশ্রিত করিয়া দিলে জমির ফসল অধিক ও অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, তাহার একমাত্র কারণ, অস্থিচূর্ণের সংসর্গে মৃত্তিকার কার্য্যকারী শক্তি প্রফুল্লিত ও বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অস্থি সাক্ষাৎ সার নহে, পরোক্ষ সার, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে সারের কার্য্য করিয়া থাকে, এবং সেই কারণেই উহাকে সার শ্রেণী মধ্যে গণনা করা যায়। যাহা হউক, সাধারণ পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত আমরা উহাকে সার রূপে আলোচনা করিব। অস্থি মধ্যে চুণ ও খনিজ লবণ থাকায় উদ্ভিদের কাষ্ঠ ও ফল সংগঠনের সুবিধা হইয়া থাকে। যে জমিতে এতদুভয় বস্তুর অভাব ও নাইট্রোজেনের

আধিক্য তাহাতে ফসল ভালরূপে জন্মে না, এবং যে সকল শস্যে চূণ, লবণ ও ফস্‌ফরিক্ এসিডের (Phosphoric acid) অভাব বা তাহা অল্প পরিমাণে অবস্থিত, তাহা জীব শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর নহে, সুতরাং ফসলকে পুষ্টিকর করিতে হইলে, ক্ষেত্রে অস্থি-সার দেওয়া আবশ্যক।

অস্থি-সার দুই প্রকার জন্মিয়া থাকে,—একপ্রকার সূক্ষ্ম গুঁড়া ও অন্যপ্রকার পাত্‌লা কুচি। অস্থির গুঁড়া শীঘ্রই মৃত্তিকাতে মিলিত হইয়া যায়, কিন্তু অস্থির কুচিবিশিষ্ট যে সার তাহা বিগলিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইতে অধিক সময় লাগে, এ জন্য যে স্থলে উহার কার্য্য শীঘ্র আবশ্যক, সেখানে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ। অস্থি-সার কুচিবিশিষ্ট হইলে বর্ষার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে বিস্তার করিয়া দিলে, বর্ষার জলে উহা শীঘ্রই গলিত হইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে যখন মৃত্তিকার রস কমিয়া যায়, তখন উহা গলিয়া যাইতে তিন চারি মাস সময় লাগে। গুঁড়া-সার বর্ষাকালে এক মাসের মধ্যেই মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। আমাদিগের মতে গুঁড়া সার ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, মোটা সার দিলে উহা অনেক দিবস পর্য্যন্ত কার্য্য করে। এ কথা সত্য, কিন্তু উহার আকারানুসারে কার্য্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। মোটা সার যেমন এক দিকে অনেক দিবস কার্য্য করে, অন্য দিকে আবার দেখা যায় যে, তদ্দ্বারা যে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য, সুতরাং উদ্ভিদগণ আবশ্যক মত যথা সময় মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে সার না পাওয়ায় তাদৃশ ফল প্রসব করিতে পারে না। অস্থি-সারকে শীঘ্র দ্রবীভূত করিবার জন্য অনেক স্থানে উহার

সহিত তেঁতুল, আমড়া-পাতা, বা গোবর মিশাইয়া কিছু দিন রাখে। অস্থিচূর্ণ বা অস্থি-ভস্মের সহিত সাল্‌ফিউরিক (Sulphuric acid) মিশ্রিত করিয়া যে সার উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সুপার' বা সুপার-ফসফেট-অব-লাইম (Super-phosphate-of-lime) কহে। অস্থি-ভস্মও সাররূপে ব্যবহার হয়।

অস্থি-সার সকল জমিতে ও সকল অবস্থায় যে নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করে তাহা নহে, সুতরাং উহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সামান্য পরিমাণ জমিতে পরীক্ষা করিয়া, যদি অশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়, তবেই উহা ব্যবহার করা উচিত, নতুবা ক্ষেত্রের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

ফসল রোপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিতে অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহাতে সবিশেষ ফল লাভ হয় না। ইংরাজি ১৮৯৩ সালে রৈইসবাগে যে আলুর চাষ করা যায়, তাহাতে এই প্রণালীতে অর্থাৎ বীজ রোপন করিবার সময় মৃত্তিকার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। এস্থলে বলিয়া রাখি যে, সেই অস্থিচূর্ণ কুচিবিশিষ্ট ছিল, সুতরাং উহার দ্বারা আলুর বিশেষ উপকার হয় নাই, বরং কয়েক মাস পরে সেই ক্ষেত্রে তুলার চাষ করা হইলে, তাহাতে অস্থি-সারের কার্য্য দেখা গিয়াছিল। অতএব উহা ব্যবহার করিতে হইলে, ফসল রোপন করিবার ২।৩ মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রদান করিতে হইবে এবং তাহা হইলে উক্ত ফসল যথা সময়ে উহা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সুফল প্রসব করিবে। চাউল, ডাল প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী অপাক অবস্থায় যেরূপ মানুষের কোন কাজে আইসে না, সেই রূপ যে

কোন সারই হউক, তাহা উত্তমরূপে গলিত না হইলে, উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয় না। এই কথাটী স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক, এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে সার দ্বারা সবিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে।

চূণ।

কৃষিকার্য্যে চূণ একটী আবশ্যকীয় সামগ্রী। উহা সাক্ষাৎ সার না হইলেও গৌণ ভাবে সারের কার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চূণ প্রয়োগ করিলে, মৃত্তিকার অন্যান্য পদার্থকে উহা কার্য্যকারী করিয়া থাকে;—মৃত্তিকার কোন দোষ থাকিলে তাহা কাটিয়া যায়, এবং পোকা মাকড় ও গাছের শিকড়াদি গরিয়া গিয়া ক্ষেত্রের উপকার হয়। যে ক্ষেত্র অনেক দিবস চাষ আবাদ হওয়ায় দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাতেই চূণ দেওয়া উচিত, উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী জমিতে চূণ প্রদান করিলে উহার সারাংশ প্রথমতঃ জ্বলিয়া যায়, ও আপাততঃ আবাদ হইবার পক্ষে অনুপযোগী হয়। এঁটেল মৃত্তিকাবিশিষ্ট জমিতে চূণ প্রদান করিলে উহা আল্গা হয়, কিন্তু বালি মাটীতে দিলে অনেক সময় চূণ ও বালিতে জমাট বাঁধিয়া যায়।

চূণ দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে,—প্রথমতঃ শামুক ও গুগ্‌লী অগ্নি সাহায্যে ভস্ম করিলে এক প্রকার চূণ হয়, এবং অন্য প্রকার হয়, পার্ব্বতীয় কঙ্করবিশেষ দগ্ধ করিয়া। নূতন চূণ (Fresh or Unslaked lime) ব্যবহার করিবার পক্ষে বিশেষ আপত্তি আছে, কারণ উহার তেজ এতই অধিক যে, ক্ষেত্রে প্রদান করিবা-

মাত্র অগ্নিবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। যদিও অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে না, তথাপি উহার উগ্রতাবশতঃ ক্ষেত্রস্থিত যাবতীয় দাহ্য-পদার্থ অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু পুরাতন বা হীনতেজ চূণ ব্যবহার করিলে ক্ষতি না হইয়া উপকার হইয়া থাকে। পুরাতন চূণ তাদৃশ উগ্র নহে এবং তাহার কার্য্যও তত-দূর দ্রুত বা অধিক নহে। চূণ ব্যবহার পক্ষে দুইটী মত আছে; এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, ক্ষেত্রে হীনতেজ চূণ দেওয়াই ভাল, কারণ তাহা হইলে জমির তত অনিষ্ট হয় না; অন্য সম্প্রদায়ের মতে নূতন চূণ দেওয়া ভাল। আমরা নূতন ও হীনতেজ উভয়বিধ চূণ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, এবং তাহার ফলে আমরা নূতন চূণের পক্ষপাতী হইয়াছি। চূণ, জল ও বাতাসের সংস্পর্শ আসিলে জমাট বাঁধিয়া যায়, এবং তাহা পুনরায় চূণ করা ব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। জমাট অবস্থায় কিন্তু রোপন করিলে ক্ষেত্রময় তাহা সমভাবে ও সূক্ষ্মভাবে বিস্তারিত হয় না। নূতন চূণ সূক্ষ্ম ধূলা-বৎ, সুতরাং মৃত্তিকা কণার সহিত মিশ্রিত হইতে বিলম্ব হয় না, এবং যত সূক্ষ্ম ও ঘনভাবে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় ততই অধিক পরিমাণে তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু গাছের গোড়ায় সার রূপে প্রদান করিতে হইলে, চূণকে হীনতেজ করিয়া অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা বা অন্য কোন উদ্ভিজ্জসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। গত বৎসর রৈইসবাগে ইক্ষুর আবাদে পুরাতন হীনতেজ চূণ ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। প্রত্যেক ইক্ষুর ঝাড়ে এক সের পরিমাণ চূণের সহিত গোবর-সার ও খৈল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। এক মাসের মধ্যে তাহার শুভ ফল গাছে প্রতিফলিত হইতে দেখা

গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী অপর কতকগুলি ঝাড়ে অন্য সারও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু যে সকল গাছে চূণ ব্যবহার করা হইয়াছিল, দুই তিন মাসের মধ্যে তাহার বৃদ্ধি এত অধিক ও সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট হইয়াছিল যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত; এবং প্রত্যেক ঝাড়ে প্রায় ৩০।৩৫ টী করিয়া গাছ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু অপর গুলিতে ১০।১৫ টীর অধিক হয় নাই।

'উষর' ভূমিতে বিবেচনা মত চূণ প্রয়োগ করিলে নোনা কাটিয়া যায়।

ক্ষেত্রে চূণ দিবার পূর্ব্বে কয়েকটী বিষয় ধীর ভাবে বিবেচনা করা উচিত। ক্ষেত্রের অবস্থা ও অভাব, এবং ভাবী ফসলের অভাব, ঋতু ইত্যাদি না বুঝিয়া, যদি খাম্‌খেয়ালী ভাবে জমিতে চূণ দেওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। হাল্‌কা বা চূণ বিশিষ্ট কর্দ্দমময় (Calcareous soil) মাটিতে বিশেষ আবশ্যক না হইলে, কথনই চূণ দেওয়া উচিত নহে। শস্য বপন করিবার অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয়, নতুবা উহা প্রদান করিবার অব্যবহিত পরেই শস্য বপন করিলে, শস্য দগ্ধ হইয়া যায়। আবার ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতি বৎসর ক্ষেত্রে চূণ দিতে হয় না;—এক ক্ষেত্রে প্রতি দশ বৎসরে একবার চূণ দিলেই যথেষ্ট। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত্রে চূণ দিয়া রাখিলে, এবং তাহার উপর দিয়া একটী বর্ষা অতীত হইলে ক্ষেত্র ব্যবহারোপযোগী হয়।

লবণ।

কৃষিক্ষেত্রে লবণ অতিশয় শীঘ্র কার্য্য করিয়া থাকে। লবণাক্ত ভূমিতে লবণ প্রদান করিলে ফসল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক দিতে পারিলে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। লবণ যে কেবল উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করে তাহা নহে, উহাদ্বারা ক্ষেত্রের পোকা মাকড় ও তৃণাদিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

লবণ দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। এক দফা বীজ বপনের সহিত,—অপর, গাছে ফল আসিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়।

লবণের দ্বারা জমি সরস থাকে, এবং মৃত্তিকাস্থিত উদ্ভিজ্জ পদার্থকে উহা সহজে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। জমি সরস থাকিতে লবণ প্রদান করিলে, শীঘ্র উহা গলিয়া যায়, কিন্তু মৃত্তিকা শুষ্ক থাকিলে গলিতে বিলম্ব হয়, এবং প্রখর সূর্য্য কিরণে গলিত অংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, এজন্য যাহাতে শীঘ্রই উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

লবণ-সার সবজী-ক্ষেত্রে প্রদান করিলে, সবজী সুস্বাদু হয়, এজন্য অনেকে সবজী-ক্ষেত্রে লবন দিয়া থাকেন। কৃষিক্ষেত্রে প্রদান করিলেও অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যায়। গবাদি পশু-দিগের আহারীয় তৃণ, কলাই প্রভৃতি ফসলের জমিতে উহা প্রদান করিলে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা পশুগণ আগ্রহ সহকারে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে লবণ-সার কৃষকের পক্ষে বড় আবশ্যকীয় দ্রব্য। কৃপণতাপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার

করিঁতে পশ্চাৎপদ হওয়া বুদ্ধিমান কৃষকের কার্য্য নহে। কৃষি-ক্ষেত্রের জন্ত পরিষ্কার সাদা লবন না হইলেও চলিতে পারে। বাজারে যে খাঁড়ি নিমক বিক্রয় হয় তাহাই যাথষ্ট। খাঁড়ি নিমকের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম, এজন্ত সাধারণে অল্পব্যয়ে অনায়াসে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

সোরা।

নাইট্রোজেন ও ক্ষারের রাসায়নিক সম্মিলনে সোরার উৎপত্তি। পুরাতন কাঁচা ঘরের দেয়ালে, ও অন্যান্ত অনেক স্থানে ইহা জন্মিয়া থাকে। বিহার প্রদেশে বহুল পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হয়। ব্যবসায়ীগণ উহা সংগ্রহ করতঃ পরিষ্কার করিয়া, বাজারে বিক্রয় করে।

যে জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব, তাহাতে সোরা প্রদান করিলে সেই অভাব দূর হয়। নিম্ন ভূমি স্বতঃই সার পূর্ণ, সুতরাং সে জমিতে সোরা দিলে ফসলের উপকার না হইয়া অপকার হইবার সম্ভবনা। ভাদুই ফসলে সোরা দিবার কোন আবশ্তক হয় না, কারণ সেই সময়ের বৃষ্টি দ্বারা জমিতে অনেক পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। ফসলের মধ্যমাবস্থায় জমিতে সোরা প্রদান করিলে তাহার ফলন অধিক হইয়া থাকে, কিন্তু প্রথমা-বস্থায় দিলে গাছের বৃদ্ধি ও তেজ এতই অধিক হয় যে, ফলনের পরিমাণ সমধিক কমিয়া যায়।

গত বৎসর গমের ফসলে আমরা অল্প পরিমাণে সার রূপে সোরা ব্যবহার করিয়া সবিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা

যে ক্ষেত্রে সোরা ব্যবহার করিয়া ছিলাম, তাহাতে চারি মণ স্থলে নয় মণ গম উৎপন্ন হইয়াছিল।

শুষ্ক জমিতে সোরার কোন কার্য্য হয় না, এজন্য ক্ষেত্রে সোরা দিবার পরে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হইবে। জলের সংশ্রবে আসিলে সোরা অতি অল্প সময়ে গলিয়া গিয়া বৃক্ষ শরীরে কার্য্য করে। সোরা ব্যবহার করিয়া কাহাকে ও আমরা ক্ষতি গ্রস্থ হইতে শুনি নাই, বরং তাহাতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ফারমে প্রতি বৎসরেই প্রায় বিবিধ ফসলে সোরা-সার দেওয়া হইয়া থাকে, এবং তাহাতে সকল ফসলের যে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে তাহা বার্ষিক রিপোর্টে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কানপুর ফারমের রিপোর্ট দেখিলেও তাহার দ্বারা আশাপ্রদ ফল ফলিয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর একই জমিতে সার প্রদান করিলে, প্রথম প্রথম বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পরে ক্রমশঃ জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; সুতরাং ফসলের পরিমাণ ও কমিয়া যায়। ক্রমাগত সোরা প্রদান করায় গাছ সবল হয় এবং সেই বলে মৃত্তিকা হইতে নানাবিধ খনিজ সার উঠাইয়া লওয়ায় মৃত্তিকা সেই সকল পদার্থের অভাব অবশেষে বিশেষ অনুভব করে। এজন্য অধিক দিন এক ক্ষেত্রে সোরা ব্যবহার করা উচিত নহে; কিন্তু অভাব পক্ষে যদি নিতান্ত করিতেই হয়, তবে সেই সঙ্গে জমিতে অন্য কোন পদার্থ সংযোজনা করা উচিত। অস্থিচূর্ণ প্রদান করিলে এ অভাব অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। সোরার সহিত সমধিক পরিমাণে ছাই মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে প্রদান করিলে অধিকতর ফসল

উৎপন্ন হইয়া থাকে। *ডুমরাঁও ফারমের ইক্ষুক্ষেত্রে তাহার সবিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে, এবং এই পরীক্ষা এক বৎসরের নহে,—চারি বৎসরের, সুতরাং ইহার উপর অনেক নির্ভর করা যাইতে পারে।

সোরার মূল্য অধিক নহে,—১৷৷০ হইতে ৩৲ টাকা। ইহাপেক্ষা অধিক মূল্যের যে সোরা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা পরিষ্কার ও তাহার মূল্য প্রতিমণ ৫৲ টাকা। অপরিষ্কার সোরার মূল্য একদিকে যেমন কম, অন্য দিকে তেমনই পরিমাণে অধিক লাগে, সুতরাং ভাল ও মন্দ সোরা ব্যবহারে একই খরচ। এ স্থলে ভাল জিনিষ ব্যবহার করাই যুক্তি সঙ্গত। সাধারণতঃ যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য ৩৲ টাকা মণ, এবং ইহা দ্বারা যথেষ্ট কাজ চলিতে পারে। বিঘা প্রতি ১৫।১৬ সের সোরা দিলেই যথেষ্ট।

দুই ভাগ লবনের সহিত একভাগ সোরা মিশ্রিত করিয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা অনেক ফসলের বিশেষ উপকার হয়। ক্ষেত্রস্থিত কোন ফসল সাধারণভাবে বিবর্ণ হইয়া গেলে, তাহাতে এই মিশ্রিত সার ছড়াইয়া দিলে, উহা আবার সতেজ হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সোরা সহজেই গলিয়া যায়, এজন্য উহাকে অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে। ঠাণ্ডা বাতাসে পর্য্যন্ত উহা গলিয়া যায়, সুতরাং গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিবস থাকিতে পারে।

---

* Mr. B. C. Basu's Notes on Indian Agriculture.

ঝুল ও ভুষা।

ঝুল ও ভূষার ব্যবহার এ দেশে অতি অল্পই দেখা যায়, কিন্তু এতদুভয়ের উপকারীতা যিনি এক বার উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা ইহা বারম্বার ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

নানাবিধ কলের চিম্‌নী, পাকশালা ও গৃহ মধ্যে ইহা জন্মিয়া থাকে। বাস গৃহ অপেক্ষা চিম্‌নী ও পাকশালায় যে ঝুল বা ভূষা জন্মে তাহা মূল্যবান, কারণ শেষোক্ত স্থানের পদার্থে অধিক পরিমাণে কার্ব্বন (Carbon) ও আমোনিয়া (Ammonia) থাকায়, উদ্ভিদ শরীর পোষণ পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে; এজন্য ইহা সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সার রূপে ব্যবহার করিতে হইলে উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া পরে জমি চষিতে হয়, কিম্বা কোন কোন ফসল রোপন করিবার সহিতও অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। আলু, গাজর প্রভৃতি মূল বিশিষ্ট ফসলের গোড়ায় গোড়ায় অল্প পরিমাণে দিলে মূলের বিশেষ উপকার হয়। কেবল যে ইহা সার রূপে ফসলে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা নহে,—মূলে কোন রূপ পোকা মাকড় লাগিতে পারে না, কারণ ইহা কীটাদির পক্ষে বড়ই তিক্ত ও বিষাক্ত, সুতরাং উহা আহার ও ঔষধরূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঝুল ও ভুষা যে ক্ষেত্রে প্রদান করা যায়, তথাকার ফসল সুন্দর, শ্রীসম্পন্ন ও পুষ্ট হইয়া ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে,—

ফসলকে রোগ হীন করে, এবং ফসলের আকারও বৃদ্ধি করে। ইহা দুই প্রণালীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—প্রথম সদ্য আনিত অবস্থায় ক্ষেত্রে বপন, এবং দ্বিতীয়, তরল অবস্থায়। সদ্য অবস্থায় ক্ষেত্রে বপন করিতে হইলে, জমিতে ফসল লাগাইবার পূর্ব্বেই দেওয়া ভাল, কারণ, তাহা হইলে সকল স্থানে সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তরল অবস্থায় দিতে হইলে, উহাকে জলে মিশ্রিত করিতে হয়, কিন্তু উহা এত হাল্‌কা যে, সহজে জলের সহিত মিশিতে চায় না, সুতরাং ঝুল বা ভূষা গুলিকে একটী গুন-চটের মধ্যে অথবা কোন কাপড়ে বাঁধিয়া কোন বৃহৎ পাত্রস্থিত জলে ডুবাইয়া রাখিলে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে তন্মধ্যস্থিত সমুদায় ঝুল ভিজিয়া যাইবে। তখন তাহাকে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়া সহজ। এই তরল পদার্থ ইচ্ছা ও আবশ্যক মত গাছের গোড়ায় গোড়ায় দেওয়া যাইতে পারে।

ঝুল ও ভূষা অতি অল্প দিনের মধ্যেই উদ্ভিদ শরীরে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু উহার শক্তি অতি অল্পকাল স্থায়ী, এবং এক ফসল-কাল মধ্যেই উহার সমুদায় শক্তি ও কার্য্য-কারীতা নিঃশেষিত হইয়া যায়। এজন্য প্রত্যেক ফসলের জন্য উহা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা উচিত।

ভূষা, কল ও ইঞ্জিনাদিতেই সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে আয়ত্বাধীন করা সহজ নহে। ঝুল সকল বাটীতেই পাওয়া যায়। ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে, গৃহ পরিষ্কারও হয়, সার সংগ্রহও হয়, সুতরাং তাহা কোন মতে নষ্ট হইতে না দিয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। পাকশালায় ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং পূর্ব্বেই

বলিয়াছি যে, বাস-গৃহের অপেক্ষা পাকশালায় ঝুল ও ভুষা অধিকতর মূল্যবান সুতরাং তাহা আদৌ নষ্ট হইতে দেওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে।

'পলি' মাটি।

'পলি' মাটি সাধারণ মৃত্তিকার অন্তর্গত নহে বলিয়াই আমরা এ বিষয়ের অবতারণা এত বিলম্বে করিলাম। জলের মধ্যে যে মাটি মিশ্রিত থাকে, তাহাকে 'পলি' কহে। বর্ষাকালে নদীর জলে ইহা প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ষাকালের জলে, পাহাড় ও নানা স্থানের মাটি ধৌত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং সেই ধৌত সূক্ষ্ম পদার্থ যে স্থানে সংস্থিত হয়, তাহাকে 'পলি' পড়া জমি কহে।

'পলি' পড়া জমি অতিশয় উর্ব্বরা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাহা নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও খনিজ সার পদার্থে পূর্ণ। নানা স্থানের জমি ধৌত হওয়ায়, মৃত্তিকার সহিত অনেক সার পদার্থ চলিয়া আইসে, সুতরাং যে জমিতে উহা সঞ্চিত হয়, তাহাও উর্ব্বরা হইয়া উঠে। 'পলি'র সহিত সমূহ পরিমাণে ধাতবীয় ও দাহ্য-পদার্থ থাকে, এজন্য 'পলি' পড়া জমিতে যে ফসলের আবাদ করা যায়, তাহাই সুন্দর রূপে জন্মে।

নদীর জলেই যে কেবল 'পলি' পড়ে তাহা নহে। বর্ষার জলে অনেক পুষ্করণী, বিল, ডোবা প্রভৃতি ভাসিয়া উচ্চ হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত জল হেতু জলাশয় ও জমি এক হইয়া যায়, ও তান্নিবন্ধন নানা স্থানের সার পদার্থ সেই জলের সহিত মিশিয়া যায়, এবং

সেই জল শুষ্ক হইবার সঙ্গে 'পলি'ও জমিতে থাকিয়া যায়; এই জন্য ডোবা-জমি উচ্চ জমি অপেক্ষা সারবান। যে জমি বর্ষায় বন্যা-প্লাবিত হয়, অথবা অপর স্থানের জলে ডুবিয়া যায়, তাহাতে দুই তিন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে।

যে জমিতে 'পলি' পড়িবার সম্ভাবনা নাই, স্থানান্তর হইতে 'পলি' মাটি কাটিয়া আনিয়া দিতে পারিলে, তাহা উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

জমি চষিবার উদ্দেশ্য ও সময়।

কার্য্যের কারণ যে পর্য্যন্ত না বুঝিতে পারা যায়, ততক্ষণ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হয় না এবং কার্য্য করিয়া ইচ্ছানুরূপ উদ্দেশ্য সফল হয় না। সাধারণ কৃষক জমিকে আল্‌গা করা ভিন্ন চাষের অন্যতম উদ্দেশ্য অবগত নহে; এজন্য তাহারা অনেক সময়ে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যদি চাষ দিবার উদ্দেশ্য তাহারা জানিত, তাহা হইলে চাষের বিষয়ে তাহারা বিশেষ যত্ন করিত।

কঠিন মৃত্তিকাকে আল্গা করা চাষের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, ততোধিক আবশ্যকীয় আর একটী কারণ আছে; এবং তাহা এই যে, ক্ষেত্রের মৃত্তিকা বিচলিত হইলে উহা বায়ুর সংস্পর্শে আইসে, ও তন্নিবন্ধন উহাতে বায়বীয় পদার্থ সংযুক্ত হইয়া উহার দিন দিন উন্নতি হয়। যে মৃত্তিকা যত কঠিন তাহাতে সেই পরিমাণে বায়বীয় পদার্থের অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। মৃত্তিকা গর্ভে প্রভূত পরিমাণে অপরাপর সার পদার্থ অবস্থিতি করিলেও, যাবৎ বায়ুর সংস্পর্শে না আইসে তাবৎ উহা নির্জীব, সুতরাং

শক্তিহীন। এই জন্য জমির উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নদেশ নির্জীব ও শক্তিহীন। যে পরিমাণে গভীররূপে মৃত্তিকা কর্ষণ করা যায়, সেই পরিমাণে উহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গভীর ও ভাসা-চাষের ফলাফল সম্বন্ধে সতন্ত্র প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, এ জন্য সে বিষয়ে এখানে অধিক বলিব না।

মৃত্তিকা উত্তমরূপে কর্ষণ করিলে আরো কি কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিবৃত করিতেছি। মৃত্তিকা আল্গা হইলে কোমল হয় এবং উদ্ভিদগণ অনায়াসে মৃত্তিকাভ্যন্তরে শিকড় চালাইয়া মৃত্তিকাস্থিত সার পদার্থ বহুল পরিমাণে আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ ও জীবনঃ ধারণ করিতে পারে। তৎপরে, ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে, তন্মধ্যাস্থিত জঙ্গলাদি বিনষ্ট হয় এবং মৃত্তিকা সমধিক পরিমাণে শিশির ও বৃষ্টির জল আহরণ করিতে সমর্থ হয়।

মৃত্তিকা বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে কেন উর্ব্বরতা লাভ করে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। মৃত্তিকা মধ্যে যে সমুদায় পদার্থ অবস্থান করে, তাহা বায়ুর সংস্পর্শে না আসিলে, কার্য্যকরী হইতে পারে না। বায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, সেই সমুদায় পদার্থ মুক্ত হইয়া গিয়া উদ্ভিদের আহারোপযোগী হইয়া থাকে। সংসারের সমুদায় পদার্থই বায়বীয় অক্সিজেন (oxygen) নামক পদার্থের সংস্রবে আসিলে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া সাময়িক কার্য্য করিয়া থাকে, এবং অবস্থা অতীত হইলেই পুনরায় উহা নির্জীব হইয়া পড়ে। এই সকল কারণের জন্যই মৃত্তিকা কর্ষণ করা গিয়া থাকে।

মৃত্তিকা কর্ষণে অবহেলা করিলে ফসল ভাল রূপে জন্মে না। কৃষকগণ যেরূপ ক্ষুদ্র ফালবিশিষ্ট লাঙ্গল দ্বারা জমি চষিয়া থাকে,

তাহাতে ৩।৪ বা ৫ অঙ্গুলির অধিক মাটি বিচলিত হয় না, সেজন্য তাহাতে ভাল রূপে ফসলও জন্মে না। মাটির স্থূলতা যতই ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে, ততই তাহার অভ্যন্তরস্থিত দাহ্য-পদার্থ (Organic matter), ফস্‌ফরিক এসিড (phosphric acid) পোটাসিয়াম (potosium) কার্য্যকরী হইবে, এবং এই সমুদায় পদার্থ কার্য্যকরী হইলেই মাটি উর্ব্বরা হইয়া থাকে ও তাহাতে যে ফসলের আবাদ করা যায় তাহারও ফলন অধিক হয়। এই জন্য চাষ করিয়া লাভবান হইতে হইলে উত্তমরূপে যাহাতে জমি কর্ষিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষাড়ে চাষ হইতে ইহার খরচ অধিক হইলেও, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রথাই অনুমোদন করি।

যে সে সময়ে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া বিধি নহে। জমি যখন অতিশয় আর্দ্র থাকে, সে অবস্থায় লাঙ্গল চালাইলে, মাটি অতি সহজে খুঁড়িয়া যায় সত্য, কিন্তু পরে সেই মাটি শুষ্ক হইলে, এতই কঠিন ঢেলা হইয়া যায় যে, উহাকে আর সহজে ভাঙ্গা যায় না, এরূপ অবস্থায় তাহাতে কোন ফসলেরই আবাদ করা উচিত নহে, কারণ, ঢেলা যুক্ত জমিতে ভাল রূপে আবাদ হয় না। মাটি ঢেলা বাঁধিয়া গেলে তাহাতে গাছের শিকড় প্রবেশ করিতে পারে না,—উহার জল শোষণ করিবার শক্তি থাকে না, এবং উহা বায়ু হইতে কোন পদার্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। একদিকে যেমন আর্দ্র মৃত্তিকায় হলচালনা করায় নানা প্রতিবন্ধক আছে, অন্য দিকে সেইরূপ কঠিন ও শুষ্ক মৃত্তিকায় হলচালনা করা বিশেষ অসুবিধাজনক। শুষ্ক মাটিতে লাঙ্গল চালান এক বারেই অসম্ভব, কারণ, উহা এতই কঠিন হইয়া থাকে যে, মৃত্তিকা মধ্যে

লাঙ্গলের ফাল্ প্রবেশ করিতে পারে না, তথাপি তাহাতে বলপূর্ব্বক লাঙ্গল চালাইলে লাঙ্গলবাহী বলদ বিশেষ কষ্ট পাইয়াও অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে পারে না। মাটির আর্দ্রতা শুষ্ক হইয়া গেলে, এবং তাহাতে সামান্য রস থাকিতে হলচালনা করিলে সুচারুরূপে মাটি খুঁড়িয়া যায়। কঠিন মৃত্তিকায় হলচালনা করিতে হইলে, উহাতে পূর্ব্ব দিবস উত্তম রূপে জলসেচন করিয়া রাখিতে হয়, এবং সেই জল মৃত্তিকার দ্বারা শোষিত হইয়া গেলে, লাঙ্গল উত্তম রূপে চলিতে পারে।

ক্ষেত্রে একবার লাঙ্গল দিয়া অধিক দিবস ফেলিয়া রাখিলে মাটি শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়, সুতরাং লাঙ্গল দিবার দুই চারি দিবস মধ্যে রস শুকাইয়া গেলে, পুনরায় লাঙ্গল দিলে, ঢেলা সমুদায় ভাঙ্গিয়া যায়। এইরূপে যতবার চাষ দেওয়া যাইবে, ততই উহা চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং ততই উহা বায়বীয় পদার্থ আহরণে সমর্থ হইবে।

'মই।'

পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালা দেশে যে 'মই' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা দ্বারা যে বিশেষ ফল লাভ হয় বলিয়া বোধ না, কারণ, সেই 'মই' এতই হালকা যে, তাহার ভারে সকল ঢেলা ভাঙ্গে না, কিন্তু ইংরাজি 'ড্রিলে'র অনুসরণে মুরসিদাবাদে এক প্রকার 'মই' প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার গুণ এই যে, মৃত্তিকা চূর্ণ হইয়া ক্ষেত্রস্থিত তৃণ শিকড়াদি কাঁটার সহিত লাগিয়া যায়, সুতরাং সতন্ত্র পরিশ্রমে আর তাহা পরিষ্কার করিবার

আবশ্যক হয় না। এই যন্ত্রটী অতি সহজে ও অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। এই যন্ত্র তৈয়ারির জন্য দুইটী সামগ্রীর আবশ্যক ;—একখানি কাষ্ঠ লম্বে ৩ হাত, প্রস্থে ৩॥ ইঞ্চ এবং স্থূলতায় ২॥ ইঞ্চ ; এবং ১০টী একফুটে গজাল বা মোটা লৌহের পেরেক। উক্ত কাষ্ঠ খণ্ডে ৫।৬ ইঞ্চ অন্তর ছিদ্র করিয়া প্রত্যেক ছিদ্রে একটী গজাল আঁটিয়া দিয়া, কাষ্ঠের দুই শেষাংশে দুইটী দড়ী বাঁধিয়া বলদের স্কন্ধস্থিত কাষ্ঠের সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়। 'মই'-এর ন্যায় বলদের স্কন্ধে উহা বাঁধিয়া দিয়া, চাষী সেই কাঁটা বিদ্ধ কাষ্ঠের উপর দাড়াইলে, বলদ যখন চলিতে থাকিবে, তখন কাঁটার সংঘর্ষণে ঢেলা ভাঙ্গিতে থাকিবে, জমি সমতল হইতে থাকিবে এবং শিকড়াদি কাঁটায় আট্‌কাইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে কাঁটা সংলগ্ন জঙ্গল বা শিকড় গুলিকে সতন্ত্র করিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিবে। ইহা অতি সহজে তৈয়ার হইতে পারে, এই জন্য আমরা আশা করি, কৃষিকার্য্য-নিরত পাঠক উহা স্বীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

গভীর ও ভাসা-চাষের তারতম্য।

গভীর ও ভাসা-চাষের বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, এবং সে সম্বন্ধে এখনও মত ভেদ আছে। এক সম্প্রদায়ের মতে জমিকে গভীররূপে কর্ষণ করা উচিত, কিন্তু অপর সম্প্রদায় বলেন যে, তাহাতে মৃত্তিকার সার পদার্থ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া থাকে ; কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের মতই আমরা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ মৃত্তিকার প্রাকৃতিক অবস্থা, ও ফসলের

আবশ্যক অনুসারে জমি চষিতে হয়। এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া গভীর বা ভাসা, যে কোন প্রকারেই হউক, ভূমি চষিলে কোন স্থলে উপকার হয়, আবার কোন স্থলে ঘোর অপকার হইয়া থাকে।

যে সকল জমির গর্ভ ভাল মাটিতে পূর্ণ, এবং অনেক দূর নিম্নে ও তাহা অবস্থিত, এরূপ জমিকে গভীর রূপে কর্ষণ করা যাইতে পারে, কারণ, জমির উপরিভাগের মাটিতে যতই ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যায়, ততই উহা সার হীন হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রতি-বার লাঙ্গল দিবার সময় যদি পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নদেশস্থিত সারবান পদার্থ সকল উপরিভাগস্থিত মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া, উহাকে ও সার-বান করে। ক্ষেত্রের উপরিভাগস্থিত মৃত্তিকা হইতে ভিতরের মৃত্তিকা সারবান কেন, তাহা পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে, এজন্য আমরা তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। উপরিভাগের মাটি সর্ব্বদা কার্য্যশীল এবং তাহাতে প্রতিনিয়ত চাষ আবাদ হইয়া থাকে; অগত্যা তাহার সার পদার্থ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। চাষবাস না হইলেও তৃণ ও জঙ্গলাদি জন্মিয়া তাহার সার অপহরণ করিয়া থাকে। আর নিম্নদেশের মাটির মধ্যে স্বভাবতঃ যে সার পদার্থ অবস্থিতি করে, তাহা ক্ষয় না হইয়া বরাবর মজুত থাকে। এতদ্ব্যতীত, উপরিভাগের মৃত্তিকাস্থিত অনেক পদার্থ জলের সহিত নিম্নদেশে চলিয়া গিয়া, সেই মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হয়। এই দুই কারণেই নিম্নদেশের মাটি অপেক্ষাকৃত সারবান। নিম্নদেশস্থিত মৃত্তিকা অনেক সময়ে অতি কদর্য্য মাটিতে পূর্ণ থাকে। কোথাওকার জমির অতি অল্প নিম্নে,

এমনকি ৯। ১০ ইঞ্চ নিম্নে, বালি, চুণে মাটি প্রভৃতি দৃষ্টি গোচর হয়। যে জমির নিম্নদেশ এই সকল জিনিষে পূর্ণ, তাহাকে গভীর রূপে কর্ষণ করিলে সেই সকল পদার্থ উপরদিকে আসিয়া পড়ে, সুতরাং উহাদিগের সংমিশ্রনে ভাল মাটি ও খারাপ হইয়া যায়। অন্যদিকে আবার দেখা যায় যে, কতক গুলি জমির উপরিস্থিত মৃত্তিকা চাষ-বাসের পক্ষে একবারে অনুপযোগী হইলেও, তন্নিম্ন-স্থিত মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত ভাল। এরূপ স্থলে গভীর-কর্ষণে ক্ষেত্রের উপকার হইয়া থাকে।

গভীর ও ভাসা-চাষে যে লাভ বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল, কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ক্ষেত্র গভীর রূপে কর্ষণ করিলে, শীঘ্রই উহা অসার হইয়া পড়ে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন, কারণ ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইয়াছে যে, উপরি অপেক্ষা নিম্নভাগে অধিকতর সার সঞ্চিত হয়, সুতরাং উহাকে উপরিস্থিত মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া লইলে উপকার ভিন্ন অপকার হওয়া সম্ভব নহে, তবে, ভিতরের মৃত্তিকার অবস্থা অবগত না হইয়া, গভীররূপে চাষ করা উচিত নহে।

যে ফসলের আবাদ করিতে হইবে, তাহার মূলের স্বভাব বুঝিয়া জমি কর্ষণের তারতম্য করা উচিত। যে সকল গাছের মূল-শিকড় (tap root) মৃত্তিকার নিম্নদেশে চলিয়া যায় তাহার জন্য গভীর কর্ষণ নিতান্ত আবশ্যক, এবং তাহা না করিলে ফসলের পক্ষে হানি হয়; কিন্তু যে সকল গাছের শিকড় গুচ্ছের ন্যায় অর্থাৎ কাণ্ডের শেষভাগে অনেক গুলি শিকড় বাহির হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে লঘু বা ভাসা চাষই প্রশস্ত। শেষোক্ত প্রকার শিকড়ের ইংরাজি নাম (lateral বা surface roots)।

গভীর-চাষের আর একটী গুণ এই যে, উহা সমধিক পরিমাণে জল আহরণ করিতে পারে; একারণে উহার মৃত্তিকা শীঘ্র রস হীন হইতে পারে না, কিন্তু ভাসা-চাষের জমিতে অধিককাল রস থাকে না, সুতরাং সামান্য জলাভাবেই ফসলের জলের আবশ্যক হয়। এই সকল বিষয় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বীজ নির্ব্বাচন।

চাষবাসের সহস্র সুবিধা থাকিলেও, এবং অপরিমিত যত্ন ও পরিশ্রম করিলেও, বীজের দোষে অনেক স্থলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বীজ ভাল হইলে, ফসল সারবান হয়, এবং ফলন অধিক হয়। অপুষ্ট, অপরিপক্ক ও কীটগ্রস্থ বীজ রোপন করিলে, অনেক বীজ অঙ্কুরিত হয় না,—অনেক গাছ রুগ্ন ও শীর্ণ হয়, তন্নিবন্ধন তাহার ফসল ও সুপুষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত রোগগ্রস্থ বীজোৎপন্ন গাছ হইতে যে ফসল হইয়া থাকে, তাহাও যে রুগ্ন হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। এই কারণে বীজ সুনির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। ফসল সংগৃহিত হইলে তন্মধ্য হইতে সুপুষ্ট, সুপক্ক ও নীরোগ বীজগুলি আবাদের জন্য নির্ব্বাচন করিয়া অতি সাবধানে রাখিতে হইবে। এবিষয়ে অস্মদ্দেশীয় কৃষকগণ বড়ই উদাসীন; ফলতঃ অনেক ফসলের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে।

এক ক্ষেত্রের বীজ খারাপ হইলে সমুদায় গ্রামের, তৎপরে জেলার, পরিশেষে সমুদায় দেশের ফসল খারাপ হইয়া যাইবার

সম্ভাবনা, কারণ এক ক্ষেত্রের দূষিত বীজ অপর লোক লইয়া স্বীয় ক্ষেত্রে রোপন করিতে পারে, এবং তদুৎপন্ন বীজ ও ক্রমে স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপে একস্থান হইতে দেশময় উহা ব্যপ্ত হইয়া পড়িলে জাতীয় মহাক্ষতি হইতে পারে। ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ ক্ষেত্রস্বামী যদি আর কাহাকেও না দেন, এবং কেবল স্বীয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন, তথাপি ইহা স্থির যে, সেই বীজ হইতে ভবিষ্যতে যে আবাদ হইবে, তাহা নিকৃষ্ট হইবে এবং যতই পর্য্যায়ক্রমে সেই বীজ ব্যবহৃত হইবে, ততই উহার অবনতি হইবে।

উপরোক্ত কারণ ব্যতীত, স্থানীয় জলবায়ু ও মৃত্তিকার পরিবর্ত্তনে বীজের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। স্থানীয় স্বাভাবিক ফসলে এরূপ না ঘটিতে পারে, কিন্তু স্থানান্তর হইতে আনিত বীজ শীঘ্রই স্থানীয় প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়ে, সুতরাং তিন চার বৎসর ব্যবধানে নূতন বীজ আমদানী করা উচিত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে যদি গমের বা যে কোন বীজই আমদানী করা যায়, তাহা বাঙ্গালা দেশে দুই চারি বৎসর বেশ ফসল প্রদান করিবে বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, প্রথম বীজ হইতে যে ফসল হইয়াছে তৎপরবর্ত্তি ফসল সমূহ নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইবে। আবার ইহাও সম্ভব যে, নিকৃষ্ট বীজ স্থানান্তরে গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা হইলে কৃষক তাহাতে লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বীজ নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় যথা স্থান হইতে নূতন ও ভাল বীজ আনাইতে হইবে।

বীজ নির্ব্বাচন বিষয়ে অমনোযোগীতা হেতু বাঙ্গালা দেশে

ইক্ষুর পরিণাম দিন দিন শোচনীয় হইতেছে, এবং এখনও সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বাঙ্গালায় ইক্ষুর আবাদ যে আর চলিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, এদেশীয় কৃষকগণ অতিশয় অবহেলার সহিত বীজ সংগ্রহ করে অর্থাৎ ফসলের মধ্যে যাহা অকর্ম্মণ্য ও অবিক্রেয় তাহাই বীজের জন্য রাখিয়া থাকে, ফলতঃ তাহাদিগের বীজ ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে; কিন্তু যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিতে পারিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বীজ পাওয়া যাইতে পারে।

বীজ রক্ষা।

ভবিষ্যতে আবাদের জন্য যে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক। আর্দ্রাবস্থায় উহাকে গৃহমধ্যে রাখিলে শীঘ্র পচিয়া যাইবাব সম্ভাবনা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, গম, সরিষা, মসিনা, প্রভৃতির মধ্যে সামান্য আর্দ্রতা থাকিলে, অতি অল্প সময় মধ্যেই এতই উষ্ণ হইয়া উঠে যে, তন্মধ্যে হস্ত প্রবেশ করান অসম্ভব হয়, এবং সেই উত্তাপে কতক বীজ অঙ্কুরিত হয় ও অবশিষ্ট পচিয়া যায়। এই কারণে বীজকে উত্তম রূপে শুষ্ক না করিয়া গৃহজাত করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।

তৎপরে দেখিতে হইবে, যে, যে স্থানে বীজ রাখিতে হইবে, তাহা যেন কোন মতে আর্দ্র না হয়, অথবা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের অধীন না হয়। গৃহমধ্যস্থিত বায়ু কখন উষ্ণ, কখন ঠাণ্ডায় পরিবর্ত্তিত হইলে বীজের অনিষ্ট হয়, এই কারণে বীজ

রক্ষিত গৃহ সর্ব্বদা আবদ্ধ রাখা আবশ্যক। বিশেষতঃ বর্ষাকালে আর্দ্র বাতাসে বীজের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা, আর্দ্রক, আলু প্রভৃতি মূল জাতীয় বীজ গৃহমধ্যে বিস্তৃত করিয়া রাখা উচিত। এই জাতীয় বীজের একটীতে 'পচ' ধরিলে যদি তাহা অবিলম্বে না ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদায় গুলি পচিয়া যাইবে। এই সকল বীজ রাখিবার জন্য শুষ্ক ছাই, বা বালি বিশেষ উপকারী।

সর্ষপ, গম প্রভৃতি জাতীয় বীজকে জালা বা কলসীর মধ্যে রাখিয়া, তন্মধ্যে কর্পূর অথবা আর্দ্ধোন্মুক্ত শিশির মধ্যে বাইসল্‌-ফাইড-অব-কার্ব্বন (Bisulphide of carbon) রাখিয়া দিলে, বীজ বেশ তাজা থাকে এবং তন্মধ্যে কীট প্রবেশ করিতে পারে না।

বীজ-রোপন।

ভিজা, ঢেলাবিশিষ্ট বা অসমতল ভূমিতে বীজ রোপন করিলে অনেক দোষ ঘটিয়া থাকে। মাটি অতিশয় ভিজা থাকিলে জমাট বাঁধিয়া যায়। অতএব সে অবস্থায় বীজ রোপন করিলে, হয় ত বীজ উপরিভাগে থাকিয়া যাওয়ায় পক্ষীতে উহা খাইয়া ফেলে, কিম্বা আলোক ও উত্তাপের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হেতু বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অতিরিক্ত ভিজা জমিতে বীজ অঙ্কু-রিত না হইবার একটী কারণ এই যে, এ অবস্থায় মৃত্তিকা মধ্যস্থিত উত্তাপের পরিমাণ হ্রাস হইয়া থাকে। মৃত্তিকা মধ্যস্থিত উত্তাপ বীজ অঙ্কুরিত হইবার বিশেষ সহায়তা করে, সুতরাং তাহার অভাব হইলে বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া ক্রমশঃ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ঢেলাবিশিষ্ট বা অসমতল ভূমিতে বীজ সমভাবে অঙ্কুরিত হয় না, কারণ, স্থানে স্থানে ঢেলা থাকিলে তাহা ভেদ করিয়া অঙ্কুর উঠিতে পারে না, এজন্য কোন স্থানে বীজ অঙ্কুরিত হয়, আবার কোন স্থানে আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অসমতল ভূমির্তেও বীজ রোপন করিলে সমভাবে ফসল জন্মে না, তাহার কারণ এই যে, উচ্চ স্থানের উত্তাপ অধিক ও অপেক্ষাকৃত নীরস। আর নিম্ন স্থানের আর্দ্রতা অধিক সুতরাং উত্তাপ অল্প। এতদ্ব্যতীত আর এক কথা এই যে, উচ্চ স্থানের মাটি ধৌত হইয়া যাওয়ায়, তন্মধ্যস্থিত অনেক সার-পদার্থ নিম্ন স্থানে চলিয়া যায়। এই সকল কারণে একই ফসল একই ক্ষেত্রে ভিন্ন ফল প্রসব করে।

সমতল ক্ষেত্রেও বীজ বপন করিবার দোষে সমভাবে ফসল জন্মে না। কোথাও বীজ অধিক পরিমাণে, কোথাও অল্প পরিমাণে পতিত হয়, আবার কোথাও আদৌ বীজ পড়ে না। অতএব ফসলের সমভাব রক্ষা করিতে হইলে শুষ্ক, অলগা ও চূর্ণ মৃত্তিকায় এবং সমতল ভূমিতে সমভাবে বীজ রোপন করিয়া মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রের রোপিত বীজ ঢাকিবার জন্য কৃষকেরা বীজ রোপন করিবার পরে পুনরায় "মৈ" ব্যবহার করে। আলু, ইক্ষু, প্রভৃতির বীজ সতন্ত্র ভাবে হস্তদ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়, কারণ, তাহাতে লাঙ্গল ও 'মৈ' ব্যবহার করিলে তৎসমুদায় উঠিয়া পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং সে সকল বীজের জন্য পূর্ব্বে জমি ঠিক করিয়া সতন্ত্র ভাবে যথাবিধি রোপন করিয়া পালন করিতে হয়।

নিড়ানির ফল।

নিড়ানি করিলে ক্ষেত্রস্থিত তৃণাদি নষ্ট হয়, এবং মাটী আল্‌গা হয়। ভিতরের মাটি যতই আল্‌গা, সারবান ও সরস হউক, উপরের মাটি কঠিন হইয়া গেলে তৎসমুদায় কোন ফলদায়ক হয় না। উপরের মাটি আল্‌গা থাকিলে ভিতরের মাটি কার্য্যকরী হয়,—মৃত্তিকায় রস থাকে, ও উদ্ভিদগণও আবশ্যক মত মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাড়িতে থাকে এবং সেচ্ছামত শিকড় চালনা করিতে পারে। এইজন্য নিড়ানির বিশেষ প্রয়োজন এবং নিড়ানি দ্বারা ক্ষেত্রকে যতই পরিষ্কার ও আল্‌গা রাখিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিড়ানিতে অবহেলা করিলে কেবল যে ক্ষেত্র কঠিন হইয়া যায় তাহা নহে,—উহাতে তৃণাদি জন্মিয়া মৃত্তিকা মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ রূদ্ধ করে,—মৃত্তিকার সার পদার্থ তদ্দ্বারা অপহৃত হয় ও আবাদী গাছ ঢাকিয়া গিয়া ক্রমশঃ মরিয়া যায়।

চারাগুলি যতদিন অতিশয় ছোট অবস্থায় থাকে, ততদিন ক্ষেত্রকে বিশেষ ভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত। চারা বড় হইয়া গেলে সামান্য জঙ্গলে আর তাদৃশ অনিষ্ট করিতে পারে না। বর্ষাকালের যে সকল ফসল (যথা, ধান্য, পাট, শন, ইত্যাদি) তাহাদিগের বিশেষ রূপে তদ্বির না করিলে আবাদ করিয়া লাভবান হওয়া যায় না। বর্ষাকালে এত অধিক ও এত শীঘ্র শীঘ্র জঙ্গল জন্মে যে, সামান্য অবহেলায় ক্ষেত্র জঙ্গলেপূরিয়া যায়।

এজন্য সাধারণতঃ রবি ফসল অপেক্ষা খারিপ বা ভাদুই ফসলে অধিক নিড়ানির আবশ্যক হয়, এবং সচরাচর ইহাদিগের জন্য তিন চারিটী নিড়ানি করিতে হয়।

চারাগুলি চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বাড়িলেই ক্ষেত্রে নিড়ানী দিতে হইবে। নিড়ানির ফল, পাঠক, হাতে হাতে দেখিতে পাইবেন, এইজন্য এসম্বন্ধে আর আমরা অধিক কথা বলিব না।

কৃষিক্ষেত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কৃষিক্ষেত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তামাক।

আধুনিক সভ্য জগতের মধ্যে প্রায় এরূপ কোন দেশ বা জাতি নাই যথায় কোন না কোন রূপে তামাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব বশতঃই দিন দিন ইহার চাষ আবাদ ও ব্যবসায় বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গালাদেশেও ইহার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। অন্যান্য চাষ ও আবাদ অপেক্ষা তামাকের চাষে বিশেষ পরিশ্রম আছে এবং সামান্য অবহেলায় সমুদায় পরিশ্রম ও অর্থ পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

জমি।—তামাকের জন্য দো-আঁশ ও আল্‌গা মাটি সংযুক্ত উচ্চ জমি বিশেষ প্রশস্ত। আরো ইদৃশ জমির চতুর্দ্দিকে বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ কোন রূপ বৃক্ষাদির দ্বারা অবরুদ্ধ না থাকে। জমির চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদি থাকিলে, জমিতে বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে, ও তন্নিবন্ধন তামাকের পক্ষে ইহা অস্বাস্থ্যকর ও অপ্রীতিকর হয়। অতিরিক্ত এঁটেল বা বালুসংযুক্ত জমিও তামাকের পক্ষে অনুপযোগী। যদি এবম্বিধ জমি পরিত্যাগ করা অসুবিধাজনক হয়, তবে উহাকে

নানাবিধ সার প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। এঁটেল-মাটির সহিত চূণ, পাতা-সার, ছাই, নূতন গোবর বা অন্য উদ্ভিজ্জ-সার মিশ্রিত করিলে ইহার কঠিন ভাব তিরোহিত হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হয়; এবং বেলে-মাটিতে এঁটেল-মাটি, পুরাতন প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ-সার প্রয়োগ করিলে তাহার উন্নতি হইয়া থাকে।

চাষ।—যে জমিতে তামাকের আবাদ করিতে হইবে, তাহাতে বৈশাখ মাস হইতে বারম্বার লাঙ্গল দিতে হইবে। জমিতে যতই চাষ দেওয়া যায়, ততই তাহার মাটি চূর্ণ ও আল্গা হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যদি জমিতে উলু ঘাসের বা ইক্ষুর অথবা অন্য বৃহজ্জাতীয় ফসল জন্মিয়া থাকে বলিয়া অবগতি থাকে, তাহা হইলে ঐ জমির মাটি গভীর করিয়া লাঙ্গল অথবা কোদাল দ্বারা উল্টাইতে হইবে এবং উহার মধ্যস্থিত জঙ্গল ও শিকড়াদিতে অগ্নি দিতে হইবে।

সার।—প্রথম দুই একবার লাঙ্গল দিবার পরে জমিতে সার ছিটাইয়া পুনরায় লাঙ্গল দিতে হয়। তাহা হইলে মাটির সহিত সার মিশ্রিত হইয়া জমি শীঘ্রই আবাদোপযোগী হইয়া থাকে। তামাকের জমিতে চূণ বিশিষ্ট (Limey) ও যবক্ষারজান-বিশিষ্ট (nitrogenous) সার বিশেষ উপকারী। পূর্ব্বোক্ত সারের মধ্যে অস্থিচূর্ণ ও অস্থিভস্ম গণনা করা যায়। এতদ্ব্যতীত চূণ ও উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রাণীজ-সার মাত্রেই, যথা,—মনুষ্য, গো, অশ্ব, মেষাদির মলমূত্র প্রভৃতি যবক্ষারজান জাতীয়।

অস্থিচূর্ণ, মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে, এ কারণ বর্ষার পূর্ব্বেই উহা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারম্বার লাঙ্গল দিলে অস্থিচূর্ণ বৃষ্টিতে পচিয়া বৃক্ষাদির

আহারোপযোগী হইয়া থাকে। টাট্‌কা সার গাছের গোড়ায় দিলে উপকার না হইয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা। চূণও উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করা উচিত, নতুবা উহার তেজে জমি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং গাছের সবিশেষ অনিষ্ট হয়। এমন কি, উহার তেজে গাছ মরিয়া যায়। নূতন চূণকে বাতাসে রাখিলে অথবা তাহাতে সমূহ পরিমাণে জল সেচন করিলে উহার তেজ নষ্ট হইয়া যায়; তখন উহা জমির সংস্পর্শে আসিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তামাকের চাষে প্রাণীজ-সারের মধ্যে মনুষ্যের মল-মূত্র বিশেষ উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, উহা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত নাই। কৃষকগণ ঘৃণা বশতঃ উহা ব্যবহার করিতে নারাজ, কিন্তু উহা বিশেষ তেজস্কর ও উদ্ভিজ্জীবনের পরিপুষ্টিকর। গোবর-সার ও গো-শালার আবর্জ্জনা বাঙ্গালাদেশের সাধারণ সার হইলেও, উহা তামাকের পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে, তবে অভাবপক্ষে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অশ্ব-সার তেজস্কর, এজন্য উহা পুরাতন করিয়া ব্যবহার করা উচিত। গত দুই বৎসর রৈইসবাগে একই তামাক ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় লাগান হইয়াছিল, এবং তামাকের উপর কোন প্রকার সারের কিরূপ কার্য্য, তাহা পরীক্ষা কবিবার জন্য প্রত্যেক চৌকায় সতন্ত্র সার দেওয়া হইয়াছিল। চূণ, খইল, গোবর, অস্থিচূর্ণ ও ভেড়ী-সারের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ ভেড়ীর সারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, মনুষ্যের মল-মূত্র লোকজনেরা ব্যবহার করিতে রাজি হয় নাই, সুতরাং তাহা একবারেই ব্যবহৃত হয় নাই। যাহা হউক, যাঁহাদের সুবিধা হইবে, তাঁহারা মনুষ্যের বিষ্ঠা ও মূত্র ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

বীজবপন।—তামাকের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এজন্য উহা একবারে ক্ষেত্রে না বপন করিয়া, 'ভাঁটিতে' বপন করিয়া, চারা কিঞ্চিত বড় হইলে জমিতে লাগান কর্ত্তব্য। নতুবা, সেই ক্ষুদ্র বীজ ক্ষেত্রে বপন করিলে বৃষ্টিপাতে মাটি চাপা পড়িয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না, এবং বিস্তৃত স্থানে তাহার তদ্বির করাও সুবিধা জনক নহে।

ভাদ্র মাসে বীজ বপন করিতে হয়। এই সময়ে বর্ষার আতিশয্য হেতু কোন আবৃত স্থানে বীজ বপন করিলে সুশৃঙ্খলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে তিন চারি দিবস লাগে। মাটি চাপা পড়িলে অথবা রৌদ্রোত্তাপে মাটি কঠিন হইয়া গেলে, বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, সুতরাং তিন চারি দিবস মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত না হইলে, তাহাকে অযত্ন না করিয়া, বরং স্থানীয় মাটি কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা উস্‌কাইয়া বা আল্‌গা করিয়া দিলে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়। বীজ গুলি ঘন করিয়া বপন করিবে না; কেননা তাহা হইলে উহা অঙ্কুরিত হইবার অব্যবহিত পরে গাছ গুলি এত ঘন হইয়া পড়িবে যে, তাহাতে নিড়ানি চালান অসম্ভব হইবে, এবং পরস্পর পাতায় পাতায় লাগিয়া চারা গুলির স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির পক্ষে হানি করিবে। আবার সেই রূপ ঘন ভাবে থাকিতে দিলেও দলে দলে গাছগুলি মরিয়া যায়। এই জন্য বীজ গুলি রোপন করিবার পুর্ব্বে, যতগুলি বীজ, তাহার ৫।৬ গুণ সূক্ষ্ম মৃত্তিকা, সার বা ছাই মিশ্রিত করিয়া ধীর ভাবে অল্প অল্প করিয়া ভাঁটির উপর ছড়াইয়া দিলে বীজগুলি অনেক পরিমাণে সমভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বীজ রোপন করা হইলে, মাটিকে হস্তদ্বারা ধীরতার সহিত চাপিয়া দিয়া

তদুপরে অতি সূক্ষ্ম মাটি ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। বীজ রোপন করিবার পরে যাবৎ অঙ্কুরিত না হয়, তাবৎ জল সেচন বিধি নহে। এরূপ অবস্থায় জল সেচন করিলে মাটি আঁটিয়া যায় ও তাহাতে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তবে, মৃত্তিকা যদি নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস থাকে, তাহা হইলে বীজ বপন করিবার ৩।৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাতে জল সেচন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ জল টানিয়া গেলে, সেই মাটি উলটপালট ও চূর্ণ করিয়া লইলেই চলিবে।

ভাঁটির মাটি বিশেষ আলগা ও সারবান হওয়া উচিত। সমুদায় মাটি না হইলেও, অন্ততঃ উপরিভাগের ছয় ইঞ্চ মাটি ঝুরা, সরস ও সার-সংযুক্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অবহেলা পূর্ব্বক যে সে মাটিতে, ও যে সে প্রকারে চারা উৎপন্ন করিলে উহার ভবিষ্যৎ বড় আশাজনক হয় না। অল্প পরিমাণ চারার আবশ্যক হইলে মাটির গাম্‌লা বা কাষ্টের বাক্সে বীজ রোপন করিলে চলিতে পারে।

বীজ অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভাঁটী সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। চারা যত বড় হইতে থাকিবে, ততই উহাকে ক্রমশঃ রৌদ্র ও বাতাস সহ্য করাইতে হইবে। প্রাতঃকাল ও স্বায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দুই এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দিলে রৌদ্র ক্রমশঃ সহ্য হইয়া যাইবে। একবারে অন্ধকার হইতে সমস্ত দিবস বাতাস বা সূর্য্যালোক লাগিলে চারা জখম হইয়া যায়।

দুই তিনটী পত্রবিশিষ্ট হইলে চারাগুলি সতন্ত্রস্থানে ৫।৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে বসাইয়া কিছু দিবস লালন পালন করিলে উহা শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে ও তেজোবান হয়। মৃত্তিকার অভাবানুসারে

মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল সেচন আবশ্যক। ৪।৫টী পাতা বিশিষ্ট হইলে গাছ গুলি ক্ষেত্রমধ্যে লাগাইতে হইবে।

ক্ষেত্রে রোপন। ইতিপূর্ব্বে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে এইবার আর একবার লাঙ্গল ও 'মই' দিয়া তাহাতে দুই হাত অন্তর ছয় ইঞ্চ গভীর করিয়া উত্তর দক্ষিণে 'জুলি' কাটিবে। 'জুলি'গুলি সরল করিবার জন্য ক্ষেত্রের দুই পার্শ্বে রজ্জু ধরিয়া জমিতে দাগ দিয়া 'জুলি' কাটিতে আরম্ভ করিবে। ইহাতে যে কেবল ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা নহে, বরং এতদ্বারা উপকার এই যে, ক্ষেত্রের মধ্যে মনুষ্য গমনাগমনের বিশিষ সুবিধা হয় এবং গাছগুলিও সমভাবে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈকালে ভাঁটি হইতে চারাগুলি যত্ন পূর্ব্বক উঠাইয়া কোন পাত্র বা টুকরিতে লইয়া ক্ষেত্র মধ্যে গমন করিবে। অপর একজন কোন পাত্রে উত্তম শুষ্ক সার লইয়া 'জুলি'র মধ্যে ২॥০ হস্ত অন্তর অর্দ্ধসের আন্দাজ করিয়া দিয়া যাইবে, এবং সেই সেই স্থানে অল্প গর্ত্ত খনন করতঃ সারের সহিত মাটি মিশ্রিত করিবে। তদনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানে এক একটী চারা বসাইয়া কিঞ্চিৎ জলসেচন করিবে। দুই চারি দিবসের জন্য প্রাতঃকালে চারাগুলি কলা গাছের ছাল বা পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে ঢাকিয়া দিবে এবং সন্ধ্যার সময় তাহা সমস্ত রাত্রের জন্য খুলিয়া দিয়া আবশ্যক মত জল দিবে। ৪।৫ দিবস এই রূপে কাটিয়া গেলে, চারাগুলি মাটিতে লাগিয়া যাইবে এবং তখন আর ক্ষত ভঙ্গের কারণ থাকিবে না। জমিতে চারা একবার লাগিয়া গেলে উহাতে আর জল সেচন করিতে হয় না। বরং অধিক

জলে তামাকের গুণ হ্রাস হইয়া যায়,—গাছ অতি শীঘ্র বাড়িয়া যায় এবং শাখা প্রশাখা নির্গত হয় ও নানাবিধ দোষ ঘটে।

গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে নিড়ান দ্বারা উস্কাইয়া ও তৃণাদি উঠাইয়া দিতে হয়। তাবৎ জমি কঠিন হইয়া গেলে কোদাল দ্বারা মাটি উল্টাইয়া দিলে গাছগুলি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিবে। গাছের গোড়ায় বা ক্ষেত্রে তৃণ বা জঙ্গল জন্মিলে গাছ তেজহীন হইয়া পড়ে, এজন্য সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। গাছে তেজের অভাব হইলে, পাতাগুলির বর্ণ হরিদ্রাভ হইয়া উঠে, ও নিম্নদেশ হইতে পাতা খসিতে আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থা দেখিলে গাছের গোড়ায় গোড়ায় জলীয় সার দেওয়া উচিত।

পাতাভাঙ্গা। অগ্রহায়ণ মাসে অথবা গাছে যখন ১০।১২ টী পাতা হইবে তখন তাহার 'ডগা' ভাঙ্গিতে হয়। পাতার সংখ্যা গাছের অবস্থানুসারে রাখিতে হইবে। সকল গাছেই যে ১০।১২ টী পাতা রাখিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। গাছ সতেজ ও সুপুষ্ট থাকিলে উপরোক্ত সংখ্যক পাতা রাখায় ক্ষতি নাই। দুর্ব্বল গাছে অনেক পাতা থাকিলে সকল পাতাই ক্ষীণ ও শিরাপূর্ণ হয়। তবে সুপুষ্ট গাছে ১০ টীর অধিক পাতা রাখা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। গাছের 'ডগা' অর্থাৎ মস্তক ভাঙ্গিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই যে, গাছ আর উর্দ্ধে বাড়িতে না পারিয়া সংগৃহিত রস দ্বারা অবশিষ্ট অঙ্গ সৌষ্টবকে পোষণ করে; তাহাতে পত্রগুলি পুরু হইয়া থাকে। ডগা ভাঙ্গিবার কয়েক দিবস মধ্যেই পত্রগ্রন্থি হইতে শাখা ফুটিতে আরম্ভ হয়, সে গুলিও ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। গাছে যতগুলি সবল ও শ্রীসম্পন্ন পাতা থাকিবে, কেবল তাহাই থাকিতে দেওয়া উচিত। নিম্নের পাতা

শুষ্ক হইলে তাহাও ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে মায়াবশতঃ পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে ইহাতে তামাকের তেজ হ্রাস হইয়া থাকে। পাতার সংখ্যার উপর লক্ষ্য না রাখিয়া, বরং তাহার গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। দশ মণ অকর্ম্মণ্য পাতা অপেক্ষা এক মণ উত্তম ও সুগন্ধবিশিষ্ট পাতা সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

'ডগা' ভাঙ্গিবার ২।৩ সপ্তাহ পরে গাছ কাটিবার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু গাছগুলি কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাতা স্পর্শ করিলে অঙ্গুলিতে আটা চট্ চট্ করিতে থাকে এবং পাতার স্থানে স্থানে ছিট্ লক্ষিত হয় অর্থাৎ পাতার সর্ব্বস্থানের বর্ণ সমান থাকে না। গাছগুলির পাতা তখন জমির দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ হয়। গাছের এই অবস্থা লিখিয়া বোধগম্য করান সহজ নহে, তবে দুই একবার ক্ষেত্রে দেখিলে কৃষক অনায়াসে ইহা বুঝিতে পারিবেন। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পাতার গুণ হ্রাস হইতে থাকে, এজন্য উপযুক্ত সময়ে পাতাগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। গাছ কাটিবার সময় উপস্থিত হইলে যদি শীঘ্র অর্থাৎ ২।৪ দিবসের মধ্যে বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে সত্বর গাছ কাটিয়া সংগ্রহ করা উচিত। তামাকের শেষ অবস্থায় বৃষ্টিপাত হইলে বড় অনিষ্ট হইয়া থাকে। তামাকের পাতা লইয়াই কার্য্য, সুতরাং তাহা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া গেলে উহার আদর ও মূল্য হ্রাস হয়। এজন্য বৃষ্টির দুই চারি দিবস পূর্ব্বে তাহা কাটিয়া গৃহজাত করা উচিত। বৃষ্টির সময় অথবা বৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তামাক কাটা নিষিদ্ধ। তামাকের পরিপক্কাবস্থায় যদি বৃষ্টি হইয়া যায়

তাহা হইলে বিশেষ ব্যস্ত না হইয়া, অগত্যা আরো ১০।১২ দিন উহাদিগকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিলে, সম্পূর্ণ না হউক, কতক পরিমাণে পাতাগুলি আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

'কুয়াশা' বা মেঘাচ্ছন্ন দিবস পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার সূর্য্যালোকবিশিষ্ট দিবসে তামাক গাছ কাটিতে হয়। প্রাতঃকালই তামাক কাটিবার প্রশস্ত সময়। পাতায় যদি শিশির থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের দুই এক ঘণ্টা পরে৷ তামাক কাটিতে আরম্ভ করা উচিত। তামাক গাছ কাটিবার জন্য বিশেষ কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কেবল এক খানি সুতীক্ষ্ণ কা'স্তে হইলেই চলিবে। বাম হস্তে গাছটী ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কা'স্তে দ্বারা সর্ব্বনিম্নস্থিত পাতা ঘেঁসিয়া গাছের গোড়া কাটিয়া দিবে। তদনন্তর গাছের কর্ত্তিত অংশ সূর্য্যমুখী করিয়া রাখিয়া পুনরায় দ্বিতীয় গাছ, ক্রমে সমুদায় গাছ কাটিতে থাক। গাছ কাটা হইবার পরে তিন ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা উচিত। কেননা তাহা হইলে উহার অনেক রস শুকাইয়া যায়। উক্ত তিন ঘণ্টা সময় উত্তীর্ণ হইলে গাছগুলি সংগ্রহ করতঃ বোঝা বাঁধিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে হয়। রৌদ্রের তেজ তীক্ষ্ণ হইলে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা অল্প সময় বাহিরে রাখা উচিত। অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে পাতাগুলি এক বারে নীরস হইয়া ও ঝলসিয়া যায়, ও তাহাতে তামাকের গুণ অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তামাকের পাতা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিকৃত হইয়া যায়, এমন কি ৩।৪ ঘণ্টার তীক্ষ্ণ রৌদ্রে উহা যে কেবল বিবর্ণ হয় ও ঝিমাইয়া যায় তাহা নহে,—একবারে এত শুষ্ক হইয়া যায় যে, হস্ত দ্বারা ধরিলে চূর্ণ হইয়া যায়। এই জন্য বিশেষ বিবেচনা

সহকারে পাতাগুলি আবশ্যক মত দুই তিন ঘণ্টার অধিক বাহিরে না রাখিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া যাইবে।

গৃহটী উচ্চ মেজ্ (floor) যুক্ত ও আলোকবিশিষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। গৃহের চারিদিকে জানালা দরজা থাকা চাই, যেন ইচ্ছামত তাহা খুলিয়া দিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় বাতাস ও আলোক লইয়াই আমাদের কার্য্য, সুতরাং গৃহ মধ্যে এতদুভয়ের স্বাধীনভাবে প্রবেশের পথ রাখিতে হইবে। সাধারণ জমি হইতে গৃহাভ্যন্তরস্থিত 'মেজে' ৩।৪ ফুট উচ্চ না হইলে ঘর বড় ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, এবং তাহার মধ্যে কোন সামগ্রী রাখিলে শীঘ্রই আর্দ্র হইয়া যায় ও পচিয়া যাইবার বা 'ছাতা' ধরিবার সম্ভাবনা। যদি ঘরের মেজে নিতান্তই ঠাণ্ডা ও নিম্নতল হয়, তবে তাহাতে ছাই বিস্তৃত করিয়া তদুপরে গমের বিচালি বা খড় বিস্তৃত করিয়া দিলে, গৃহের অনেক শৈত্যতার হ্রাস হইয়া থাকে। অথবা, অধিক জানালা দরজা থাকিলে ও গৃহের তাদৃশ শৈত্যতা থাকে না। মোট কথা, ঘরটী বিশেষ শুষ্ক ও হাওয়া বিশিষ্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

আপাততঃ গৃহমধ্যে আনিয়া গাছগুলি পৃথক পৃথক করিয়া 'মেজ' শুষ্ক হইলে ভূমিতে, অথবা তক্তা বা বাঁশের মাচানে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে এক একটী গাছ লইয়া, তাহার গোড়ার দিক হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি উর্দ্ধে গুণ-সূচ বা অন্য কোন লৌহের সূক্ষ্ম ভাগ দ্বারা ছিদ্র করতঃ তন্মধ্যে দড়ি দিয়া গাছগুলি গাঁথিয়া, দড়ির দুই শেষাংশ গৃহের দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিতে হয়। এইরূপ গাছগুলি দড়িতে গাঁথিয়া স্তরে স্তরে গৃহমধ্যে টাঙ্গাইয়া দাও। গাছগুলি নিতান্ত ঘনভাবে গাঁথা হইলে; অথবা গাছ সমেত দড়িগুলি

পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকিলে তন্মধ্যে বাতাস প্রবেশের ব্যাঘাত হয়, এজন্য উভয় দড়িতে একহস্ত পরিমাণ ব্যবধান থাকিলে ভাল হয়। ভিতরে বাতাস প্রবেশের পথ যত উন্মুক্ত থাকিবে, ততই গাছগুলি শুকাইবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

গাছগুলি শুষ্ক করিবার জন্য আর একটী সহজ উপায় আছে। দুই অঙ্গুলি ঘন ও চারি অঙ্গুলি প্রস্তে এরূপ গৃহ-পরিমাণ লম্বা কাষ্ঠে অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে লৌহের পেরেক মারিয়া উক্ত কাষ্ঠ ঘরের মধ্যে আটকাইয়া দিতে হয়। পরে গাছগুলির গোড়া কাষ্ঠস্থিত পেরেকে প্রবেশ করাইয়া দিলে আর অধিক কষ্ট করিতে হয় না। এতদুভয় প্রথার মধ্যে সুবিধা এই যে, কাষ্ঠগুলি গৃহমধ্যে সংলগ্ন থাকায় গাছগুলি দুলিতে পারে না এবং উক্ত কাষ্ঠ গুলি ভবিষ্যতে পুনরায় ব্যবহারে আইসে, এবং পূর্ব্ব প্রথা অপেক্ষা ইহাতে মজুরী কম পড়ে।

পৌষ মাঘ মাসে গাছ কাটিলে, উহা শুষ্ক হইতে প্রায় দুই মাস, এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে কাটিলে একমাস লাগে। গাছ যতই শুকাইবে, ততই তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিবে, এবং তাহার সবুজবর্ণ ঘুচিয়া বর্ণান্তর হইবে। পাতা শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু ডাঁটা শুকায় না; সুতরাং পাতা শুষ্ক হইলেই গাছ গুলিকে উপর হইতে নামাইয়া ডাঁটা হইতে পাতা গুলি সতন্ত্র করিতে হইবে।

পাতা শুষ্ক করিবার অপর প্রণালী পরিশ্রমসাধ্য হইলেও আমরা তাহার পক্ষপাতী, কেননা, ইহা দ্বারা পাতার আঘ্রাণ, বর্ণ ও স্থূলতা অতি সুন্দর হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কৃষক ইহাতে সামান্য অবহেলা করিলে সমুদায় শ্রম পণ্ড হইবে। এ প্রণালী-

মত পাতা তৈয়ার করিতে হইলে, বেতনভোগী লোকজনের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা চলে না। লোকজন শিক্ষিত হইলেও কৃষক দুইবেলা তামাকের ঘর পরিদর্শন করিবেন। কৃষকের যত্ন ও পরিশ্রম এই প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। পরে, পূর্ব্ব রীতি অনুসারে ক্ষেত্র হইতে গাছগুলি উঠাইয়া গৃহমধ্যে আনিয়া, মূল ডাঁটা (stalk) হইতে পাতা গুলি অস্ত্র সহায্যে সতন্ত্র করিতে হইবে। পাতার গোড়ায় ডাঁটার কিয়দংশ কেহ কেহ রাখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে শুষ্ক হইবার পক্ষে বিলম্ব হয়, এই জন্য পত্রগুলি মাত্র ডাঁটা হইতে সতন্ত্র করিয়া গৃহমধ্যে ঝুলাইয়া দিবে অথবা শুষ্ক মেজে'তে কিম্বা মাচানের উপর পাত্‌লা করিয়া বিস্তৃত করিয়া দিবে। পাঁচ ছয় দিবস অতীত হইলে পাতার অনেক রস মরিয়া আসিবে। তখন সেই পাতা সংগ্রহ করিয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া দুই কি আড়াই ফুট উচ্চ করিবে। পাতার বোঁটা বা গোড়াগুলি বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। স্তূপের নিম্নে ৮ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ করিয়া খড় বা বিচালি বিছাইয়া দিবে, এবং উপরে ও খড় চাপা দিবে। এই স্তূপকে 'জাগ' কহে। তামাক 'জাগ' দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার কাজ নহে। 'জাগ্' দিবার ২৪ ঘণ্টা পরে উহার অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হইবে। 'জাগে'র উপরিভাগের খড় তুলিয়া ও উপরি ভাগ হইতে কতকগুলি পাতা নামাইয়া 'জাগে'র ভিতরের উত্তাপ অনুমাণ করিতে হইবে। কতকক্ষণ সেই উত্তাপ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সেই উত্তাপেই বা পাতার বর্ণ কি রূপ পরিবর্ত্তিত ও হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যদি এরূপ বুঝা যায় যে, আর ক্ষণকাল থাকিলে উহার অনিষ্ট হইবে, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ 'জাগ' ভাঙ্গিয়া পাতাগুলি টাঙ্গাইয়া বা মাচানে বিছাইয়া দিবে। অধিক ক্ষণ জাগের মধ্যে থাকিলে পাতা ঝলসিয়া যায় ও কৃষ্টবর্ণ ধারণ করে। এতদ্ব্যতীত পাতার স্থূলতা হ্রাস হয় ও আঘ্রাণ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 'জাগ' অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে পাতা পচিতে আরম্ভ হয় এবং তাহা হইতে জলীয় অংশ নির্গত হইয়া যায়। জলীয় ভাগ বাহির হইয়া গেলে তাহার সহিত তামাকের সারভাগও চলিয়া যায়। এই সকল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 'জাগ'কে অধিক উত্তপ্ত হইতে দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। সামান্য উষ্ণ হইবামাত্র তাহা ভাঙ্গিয়া পাতা গুলি সতন্ত্র করিয়া 'মাচানে' বিস্তৃত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। চব্বিশ ঘণ্টা আন্দাজ ইদৃশ অবস্থায় রাখিলে পাতার ঘর্ম্ম শুকাইয়া যাইবে। তদনন্তর পুনরায় 'জাগ' দিবে। আবার চব্বিশ ঘণ্টার জন্য উল্লিখিত প্রণালীতে 'জাগ' দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় বিস্তারিত করিয়া দিবে। এইরূপ ৩।৪ বার করিলে পাতার সমুদায় বর্ণ একই ভাব ধারণ করিবে; তখন আর 'জাগ' দিবার আবশ্যক হইবে না।

প্রতিবার 'জাগ' ভাঙ্গিবার সময় সমুদায় পাতা একটী একটী করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষা কালে তাহার মধ্যে পচা বা গলিত যে সকল পাতা দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বাছিয়া ফেলিয়া না দিলে, এই দোষ অন্য পাতাকেও আক্রমণ করিবে। পাতা অর্দ্ধ শুষ্ক হইয়া আসিলে, এবং যাবৎ সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক না হয় তাবৎ ৫।৬ দিবস অন্তর পাতাগুলিকে শিশির সিঞ্চিত করিবার জন্য ঘরের বাহিরে সমস্ত রাত্রি রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গৃহমধ্যে আনিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিয়া দিবে। শীঘ্র শীঘ্র

শুষ্ক করিবার জন্য গৃহমধ্যে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির সময় অথবা আর্দ্র বাতাসের সময় গৃহের দ্বার সকল বন্ধ করিয়া রাখিবে, কারণ, জলীয় বাতাসে তামাকের এ অবস্থায় অনিষ্ট হইয়া থাকে।

এ স্থলে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, 'জাগ' কখনই বৈকালে ভাঙ্গিবে না, তাহার কারণ এই যে, পাতাগুলি 'জাগে'র মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং গরম হইতে সহসা বৈকালে ও রাত্রির ঠাণ্ডা লাগিলে পাতায় দাগ ধরে; অধিকন্তু পাতার ঘর্ম্ম শুষ্ক হইতে না পারিয়া পচিতে আরম্ভ হয়। সকালে জাগ ভাঙ্গিলে এ সকল আপদের ভয় অতি অল্প। দিবসের উষ্ণতা উষ্ণ পাতাদগকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাহার ঘর্ম্ম ও অল্প সময় মধ্যে টানিয়া যায়। বৈকালে বা রাত্রিকালে 'জাগ' ভাঙ্গিবার পক্ষে যে আপত্তি, বৃষ্টির অথবা ঠাণ্ডা বাতাসের দিনে ভাঙ্গিতে ও সেই আপত্তি। আবার সকল সময়ে স্বভাবের দিকে তাকাইলে কাজ চলে না, কারণ এরূপ সচারচর ঘটিয়া থাকে ও ঘটিবার সম্ভাবনা যে 'জাগ' ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে অথবা 'জাগ' অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে না ভাঙ্গিলে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, অথচ বায়ু অতিশয় ঠাণ্ডা,—এরূপ স্থলে গৃহের সমুদায় দ্বার রূদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে বৃহৎ পাত্রে অগ্নি রক্ষা করিতে হইবে। এই অগ্নি কেবল অঙ্গার হওয়া উচিত, নতুবা উহা ধূম উদ্গীরণ করিলে, তামাকের পাতায় ধূমের গন্ধ আসিবে। আবার ইহাও দেখিতে হইবে যে, অগ্নি যেন গৃহাভ্যন্তরে প্রজ্জলিত না হয়। দুই এক ঘণ্টা অগ্নিপাত্র গৃহমধ্যে থাকিলে ঘর গরম হইয়া উঠিবে, তখন উক্ত অগ্নি গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

ক্ষেত্র হইতে তামাক কাটা হইয়া গৃহমধ্যে একবার প্রবেশ করিলে, আর তাহাতে কোন মতে সূর্য্যালোক লাগিতে দেওয়া উচিত নহে। সূর্য্যোত্তাপে পাতা অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়, এবং পাত্‌লা ও আঘ্রাণহীন হয়। এজন্য ইহাকে কোন মতে রৌদ্র লাগিতে না দিয়া, সম্পূর্ণ রূপে গৃহমধ্যে বা ছায়া-যুক্ত স্থানে শুষ্ক করিয়া লইবে।

বাছাই। পাতা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পর, গুণের তারতম্যানুসারে ১, ২, ৩, ও ৪ শ্রেণীতে উহাদিগকে বিভাগ করিতে হইবে। উত্তম বর্ণ, তীক্ষ্ণ আঘ্রাণ, ও পূর্ণ আকার বিশিষ্ট পাতাগুলি ১ নম্বরোপযোগী; উহাপেক্ষা যাহার বর্ণ, আঘ্রাণ ও আকার নিরেস, তাহাদিগকে ২ নম্বর ভুক্ত করিবে; এবং এইরূপে ৩।৪ নম্বর ও পূর্ণ করিবে। ইহার মধ্যে যে সকল খারাপ পাতা দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা একবারে বাচিয়া পৃথক করিয়া ফেলা উচিত।

বাঁধাই। পাতা বাছাই হইলে, প্রতি নম্বর তামাক সতন্ত্র করিয়া বাণ্ডিল বাঁধিতে হইবে। প্রত্যেক বাণ্ডিলে পাতার আকারানুসারে ২০ হইতে ৫০ টী করিয়া পাতা থাকা উচিত। প্রত্যেক পাতার গোড়া একত্র করিয়া কলা গাছের 'ছোটা' বা সরু দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। সকল পাতা এইরূপ বাণ্ডিল বাঁধা হইলে, উহাদিগকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া ১ বা ১।০ মণ ওজনের এক একটী বোঝা বাঁধিতে হইবে। বোঝা বাঁধিবার সময় বাণ্ডিলের গোড়াগুলি যেন বাহিরের দিকে থাকে। পাতাগুলির সুরক্ষার জন্য বোঝার চারিদিক উলুঘাস বা খড়দ্বারা ঢাকিয়া, তবে দড়ি দিয়া যত্ন সহকারে বাঁধিতে হইবে। এই

প্রণালীতে ১, ২, ৩, ও ৪ নম্বরানুসারে বোঝা বাঁধিয়া বাজারে মাল প্রেরণ করিতে হয়।

তামাক উত্তম রূপে জন্মিলে এবং কোনরূপে নষ্ট না হইলে, বিঘা প্রতি ১০ মণ পর্য্যন্ত শুষ্ক তামাক উৎপন্ন হইতে পারে। ভাল তামাক বাজারে ৬ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত এক মণের মূল্য হইতে পারে। কিন্তু প্রতি বৎসর যে ক্ষেত্রে ভালরূপ তামাক জন্মিবে, অথবা বাজারে ১০ টাকা হিসাবে প্রতি মণের মূল্য হইবে, তাহা সম্ভব নহে। এজন্য আপদ বিপদ ও দুর্ঘটনার জন্য আমরা কিছু উভয় দিকে বাদ দিয়া ন্যূন কল্পে বিঘা প্রতি ৮ মণ পাতা ধরিতেছি, এবং উহার মূল্য মণ প্রতি ৭৲ টাকা ধরিয়া লইলে, বিঘা প্রতি ৫৬৲ টাকা আদায় হইতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে যে যে খরচ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

জমির খাজনা.................... ২৲
সার.................... ৩৲
লাঙ্গল.................... ২॥০
বীজ.................... ১৲
গাছ রোপন.................... ৸০
জমি কোপান্.................... ২৲
জল সেঁচ.................... ৩৲
'ডগা' ভাঙ্গাই.................... ৸০
কাটাই.................... ॥০
শুকাই.................... ৫৲

মোট——২০॥০

উপরের হিসাব আমরা অধিক পরিমাণে ধরিয়াছি। চারি আনা হিসাবে লোক প্রতি মজুরি কেবল কলিকাতায় হইতে পারে, কিন্তু মফঃস্বলে বিঘা প্রতি ১৫।১৬ টাকা তামাকের ক্ষেত্রে খরচ করিলে যথেষ্ট হইল। মুরসিদাবাদ সহরে যখন মজুরীর বাজার মহার্ঘ হয়, তখনই কেবল প্রতি টাকায় ৫টী মজুর, নতুবা সচরাচর ৬।৭টা মজুর পাওয়া গিয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছি, মফঃস্বলের মজুরি আরো অল্প। আরো এখানে বেতন করিয়া লোক রাখিলে ৩৷৷০ বা ৪ টাকার অধিক পড়ে না। কোন সময়ে ক্ষেত্রে একবারে অধিক লোকের আবশ্যক হয়, আবার কোন সময়ে ক্ষেত্রে আদৌ কোন কাজ থাকে না, এজন্য বেতনভোগী লোক রাখা সুবিধাজনক নহে। বলা বাহুল্য যে, আমাকে রৈইসবাগে কো চাষের জন্য ঠিকা লোক লাগাইতে হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, তথায় বারমাসই যথেষ্টসংখ্যক লোক নির্দ্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত আছে।

গত বৎসর তিন প্রকার বিদেশীয় তামাকের চাষ করিয়াছিলাম। ১। Rose muscatalle (পারস্য দেশীয়), ২। কিউবা (cuba) ৩। কনেক্‌টীকট্ (Connecticut)। পূর্ব্ব বৎসর ভার্জ্জিনিয়া ও করিয়াছিলাম। এ সমুদায়ই চুরুটের উপযোগী তামাক। কয়টীর যে নামোল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে পারস্যদেশীয় তামাকের পাতা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার হইয়া থাকে এবং গজকাটী দ্বারা আমি অনেক পাতা মাপিয়া দেখিয়াছি যে, প্রায় উহা ২৭।২৮ ইঞ্চ লম্বা এবং বোঁটা হইতে ছয় ইঞ্চ উপরে ১৩ ইঞ্চ প্রশস্ত। কিউবা তাদৃশ লম্বা না হইলেও, প্রস্থে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং স্থূলতর। কনেক্টীকটের আকার প্রায় পারস্য দেশীয়

Rose muscatalle'র স্থায়। আর ভার্জ্জিনিয়া মধ্যমাকার বিশিষ্ট। গত পূর্ব্ব বৎসর অল্প পরিমাণে রইসবাগে জন্মিয়াছিল, কিন্তু উহার বীজ এ বৎসর অঙ্কুরিত হয় নাই। উল্লিখিত কয় প্রকার তামাকই অতি সুস্নিগ্ধ আঘ্রাণ বিশিষ্ট, এবং চুরুটের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

দেশীয় প্রণালীতে যে তামাকের চাষ হইয়া থাকে, এইবার তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া, যশোহর, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও ফরিদপুর জেলায়, এবং ত্রিহুত্র, ও মান্দ্রাজের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তামাকের চাষ হইয়া থাকে। এ সকল স্থানে প্রায় দেশীয় তামাকেরই চাষ হয়, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী জাতির নামোল্লেখ করা গেল:—

১। পানবাট্টা	৬। কপিপাতা
২। কৃষ্ণকলি	৭। ধালসা
৩। দক্ষিণবারণ	৮। কন্থা
৪। হীঙ্গলী	৯। হাতীকানি
৫। হনুমানজটা	১০। ছোট্না

'হিঙ্লী' নামক বাঙ্গালার যে প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট তামাক জন্মিয়া থাকে, রাণাঘাটের অন্তর্গত বনগ্রাম সবডিবিজানের এলাকায় হীঙলী নামক গ্রামে তাহার উৎপত্তি। উল্লিখিত কয়েক প্রকার ব্যতীত আরো অনেক জাতীয় তামাক বাঙ্গালায় জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল জিনিষের বাজারে তাদৃশ আদর নাই এজন্য তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনার আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কৃষকগণ ফাল্গুন মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তামাকের

ভাবি ক্ষেত্রে বারম্বার চাষ দিতে থাকে। আশ্বিন মাসে চারা বসাইবার পূর্ব্বে গোবর-সার আবর্জ্জনাদি ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া আর একবার লাঙ্গল ও মই দেয়।

স্বতন্ত্র স্থানে চারা উৎপন্ন করিয়া ক্ষেত্র মধ্যে ১ বা ১।৷০ হস্ত ব্যবধানে একটী ছারা লাগাইয়া যথোচিত পা'ট করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত ক্ষেত্রে জল সেচন করিবারও ব্যবস্থা আছে।

পৌষ মাঘ মাসে পাতা পাকিয়া উঠিলে যথা নিয়মে গাছগুলির গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দুই তিন ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিতে হয়; পরে দুইটী করিয়া পাতা রাখিয়া ডাঁটা খণ্ড খণ্ড করতঃ স্তূপ করিয়া দুই তিন দিবস বাহিরেই রাখিয়া দেওয়া হয়। পাতাগুলি এতদবস্থায় থাকিয়া কিছু শুষ্ক হইলে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া বিধি। মাসাবধি এই রূপ থাকিলে পাতাগুলি শুষ্ক হইয়া যায়। তখন তাহাকে বোঝা বাঁধিয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

আগামী বৎসর যে পরিমাণে বীজের আবশ্যক, তাহা অনুমাণ করিয়া ক্ষেত্র মধ্যে কতকগুলি গাছ একবারে রাখিয়া দিবে ও তাহাতে ফুল ও ফল ধরিতে দিবে। যে কয়েকটী গাছ বীজের জন্য রাখা হইবে তাহা যেন সতেজ ও বলিষ্ঠ হয়। ভাল গাছের বীজ হইতে ভাল গাছ জন্মিয়া থাকে। ফলগুলি শুষ্ক হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া উত্তম রূপে পরিষ্কার করতঃ বোতল বা সিসির মধ্যে রাখিয়া সোলার ছিপি দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিবে। মধ্যে মধ্যে বোতল হইতে বীজ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলে আর পোকা লাগিয়া বীজ নষ্ট হইতে পারে না। বীজে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে সর্দ্দি লাগে ও খারাপ হইয়া যায়।

তামাকের গাছের অনেক শত্রু আছে, তন্মধ্যে দুই জাতীয় পোকায় ইহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণের পোকা বিস্তর সংখ্যায় পাতার উপর দৃষ্ট হয়। ইহারা পাতা কাটিয়া ফেলে, সুতরাং ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দুই একটী পাতায় বা গাছে মাত্র যদি ইহা দেখা যায়, তবে সেই সেই পাতা বা গাছ ক্ষেত্র হইতে একবারে উঠাইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া আসা উচিত, নতুবা উহারা অন্যান্য গাছকেও আক্রমণ করিবে। ইহারা পতঙ্গজাতীয়। অপর জাতীয় কীট ২।৩ যব পরিমাণ লম্বা, ও সূত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট; ইহারাও পাতা কাটে, এবং ডিম্ব প্রসব করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়ে। এই কীট‍ঃতামাকের পুষ্প ও ফলের উপর আক্রমণ করে। ইহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা সহকারে ধরিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। এই সকল শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষেত্র মধ্যে সন্ধ্যাকালে গন্ধকের ধূম দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

ইক্ষু।

ইদানী ইক্ষুর চাষ ভারতের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি কিন্তু ইহার দ্বারা স্থানীয় অভাব মোচন হয় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণে চিনি আমদানি হইয়া থাকে। ইক্ষু হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।

ইক্ষু সংস্কৃত শব্দ। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহাকে Sacharum offici-

narum কহিয়া থাকে। হিন্দিতে 'উক' গন্না,—মহারাষ্ট্রে 'ঊষ' এবং আরবী ভাষায় 'শক্কর' বলিয়া অভিহিত। মুরসিদাবাদে 'কুশর' নামে খ্যাত।

অতিরিক্ত বেলে মৃত্তিকা ব্যতীত সকল স্থানেই ইক্ষু জন্মিতে পারে। ঈষৎ হাল্‌কা-এঁটেল ও দো-আঁশ মাটি সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। যে এঁটেল মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় তাহাকেই হাল্‌কা-এঁটেল কহে। হাল্‌কা-এঁটেল অতিরিক্ত জল সঞ্চয়ও করে না, অথবা অল্প রৌদ্রেই নীরস হইয়া পড়ে না, এজন্য ইক্ষুর পক্ষে ইদৃশ জমি বিশেষ উপকারী। লবনাক্ত জমিতে ইক্ষু উত্তম জন্মিয়া থাকে। অনেক ফসল ইদৃশ জমিতে জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে ইক্ষুর চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়, ও জমিরও সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশিপুর হর্টিকলচার্‌ল ইন্‌ষ্টিটিউশনের উল্টাডিঙ্গির বাগানে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। উক্ত বাগানের জমি এতই লবনাক্ত যে তথায় অন্য কোন ফসল ইতিপূর্ব্বে সুচারু রূপে জন্মিত না, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, তথায় ইক্ষু অতি সুন্দর জন্মিয়াছিল। রৈইসবাগমধ্যে প্রায় বিঘা দুই ভূমি অতিশয় লবনাক্ত ছিল, তথায়ও কোন ফসল হইত না; কিন্তু ইক্ষু এরূপ বৃহদাকার ও স্থূল হইয়াছিল যে, ইতিপূর্ব্বে সেরূপ কখনও হয় নাই। কেবল ইক্ষু কেন, ইদৃশ জমিতে ইক্ষু জাতীয় প্রায় সকল গাছই সুন্দর রূপে জন্মিয়া থাকে। গত বৎসর সেই ক্ষেত্রে রিয়ানা (Reana luxurians) নামক ইক্ষু জাতীয় গাছের তথায় চাষ করা হইয়াছিল। সেই সকল গাছ প্রায় বারো ফুট অর্থাৎ আট হাত লম্বা হইয়াছিল।

ইক্ষু চাষের জন্য সাধারণ নিম্নতল অপেক্ষা কিছু উচ্চ জমি হওয়া আবশ্যক, এবং অতিরিক্ত বর্ষা হইলে যাহাতে ক্ষেত্রের জল অনায়াসে নিকাশ হইয়া যায়, তাহার বিশেষ উপায় রাখা উচিত। নিম্নতল জমিতে যথায় বর্ষায় জল জমিয়া থাকে, তথাকার উৎপন্ন ইক্ষু জলীয় আস্বাদন বিশিষ্ট, ও তাহাতে শর্করার ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। এই স্থানের ইক্ষু আয়তনে বৃহৎ হয় বটে, কিন্তু শর্করাভাগের অল্পতাবশতঃ তাহার মূল্য অল্প। উচ্চ জমির ইক্ষুকে উপযুক্তরূপে পা'ট করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাতে শর্করার ভাগ অধিক থাকায় অতিশয় সুমিষ্ট হইয়া থাকে। যে ইক্ষুতে শর্করার অংশ অধিক তাহারই বাজারে মূল্য অধিক, কেননা, তাহা হইতে অধিক পরিমাণে গুড় ও চিনি বাহির হইয়া থাকে।

'আওতা' বা ছায়া যুক্ত জমি ইক্ষুর পক্ষে প্রশস্ত নহে, কেননা এরূপ জমিতে যে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে, তাহাও নিম্নতল জমির উৎপন্ন ইক্ষুর ন্যায় জলীয় ও অনাস্বাদন যুক্ত হইয়া থাকে। অনেকে কেবল গাছের আকার দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সন্তোষে সন্তোষ লাভ করিতে পারি না। কেননা, গাছের আকারই কেবল আমাদের লক্ষ্য নহে; উহার শর্করাধিক্য দেখিয়া আমরা ভাল মন্দ স্থির করিয়া থাকি।

রোপন করিবার সময়।—চৈত্র বৈশাখ মাস ব্যতীত বৎসর মধ্যে সকল সময়েই ইক্ষুর বীজ রোপন করা যাইতে পারে। উক্ত দুই মাসে রোপন করিবার পক্ষে আপত্তি এই যে, এই সময়ে রৌদ্রের তেজ অতিশয় প্রখর ও তাহাতে বীজের সমুদয় রস শুষ্ক হইয়া যাইবার সময়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের

দারুণ শীতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়, এজন্য কেহ কেহ সে দুই মাস বীজ রোপন করিতে অগ্র পশ্চাৎ করেন, কিন্তু রোপন করাতে কোন ক্ষতি নাই। আশ্বিনের প্রারম্ভ হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগ, এবং জৈষ্টমাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইক্ষু রোপন করিবার প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে মৃত্তিকার অবস্থা অতিশয় আর্দ্র থাকা প্রযুক্ত বীজ রোপন বা তদানুসঙ্গিক কার্য্যসমুহের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য আশ্বিন মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বীজ রোপনের সময় নির্ব্বাচন করিতে পারিলে সকল দিকেই সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ, কয়েক মাসে গাছ গুলি বেশ সতেজ ও বড় হইয়া উঠে, ও পরে বর্ষা পাইলে তাহা আরো শীঘ্র বাড়িতে থাকে। কিন্তু বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বীজ রোপন করিলে বীজ পচিয়া যাইতে পারে, এবং বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাহির হইলেও চারা গাছ বর্ষার তাবৎ জল আহরণ করিতে পারে না, ও গাছগুলি সমধিক বড় হইবার পূর্ব্বেই বর্ষা অতীত হইয়া শীত আসিয়া পড়ে। তন্নিবন্ধন গাছ আর তাদৃশ বাড়িতে পারে না। এই জন্যই আমরা আশ্বিন কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বীজ রোপনের পক্ষপাতী।

বীজবপনের দুই মাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ইক্ষু গভীর মৃত্তিকায় স্ফূর্ত্তিতে থাকে, এজন্য ইহার জমি গভীররূপে কর্ষণ করিতে হইবে। দেশীয় লাঙ্গলে কিন্তু তাহা হয় না, অথচ বিলাতি লাঙ্গল ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক স্থানে শিবপুর-লাঙ্গল প্রচলিত আছে। সুতরাং বড় কোদাল দ্বারা ১ বা ১॥ দেড় হস্ত মাটী গভীর করিয়া উল্টা-ইতে হইবে। এক দিক হইতে সমুদায় ক্ষেত্র এইরূপে কোদালা-

ইয়া দশ পনর দিবস সেইরূপ অবস্থায় মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বায় কোদাল দ্বারা অথবা লম্বা ফাল্‌যুক্ত লাঙ্গল দ্বারা সেই ক্ষেত্রকে চূর্ণ করিতে হইবে। ক্ষেত্র মধ্যে বারম্বার লাঙ্গল ও 'মই' ফিরাইলে জমি ক্রমশঃ তৈয়ার হইবে। লাঙ্গল উপর্য্যুপরি প্রতি দিবস চালাইলে মাটীর তাদৃশ উপকার হয় না। ভালরূপে জমি তৈয়ার করিতে খরচ অধিক পড়ে সত্য, কিন্তু তাহাতে যে জমির সমূহ উন্নতি হয় ইহাও ততোধিক সত্য, এবং জমি উর্ব্বরা হইলে তদুৎপন্ন ফসলও অধিক পরিমাণে জন্মিবে ইহা নিশ্চয়। যাঁহারা মনে করেন যে, জমিকে কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অধিক ব্যয় করা বাহুল্য, অথবা অধিক ব্যয় করিলে তদুৎপন্ন ফসলে সে খরচ ও পরিশ্রমের মূল্য আদায় হইবে না তাঁহারা ভ্রান্ত। যে কোন কাজেই হউক, প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিলে আশানুরূপ যে ফল পাওয়া যায় না, একথা তাঁহারাই বিশ্বাস করিতে পারেন যাঁহাদের কার্য্যে ক্রটী ও অবহেলা আছে। পঞ্জাব প্রদেশে এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর কথা আছে, তাহা এস্থলে আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম,—

সাত চাষ গাজরে, শ ১,—চাষ কুশরে ২,
গমের ভূঁয়ে ৩ যত চাষ, তত লাভ তত আশ।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইক্ষুর ক্ষেত্রে একশত চাষ দিলেও লোকসান নাই। একশত চাষ দিয়া উঠা সহজ নহে, কিন্তু উহাতে অন্ততঃ বীজ রোপনের পূর্ব্বে ১০।১৫ চাষ দেওয়া আবশ্যক। দুই তিনবার চাষ দিবার পরে জমিতে সার দিয়া,

---

১। শ=শত। ২। কুশর=ইক্ষু। ৩। ভূঁয়ে=জমিতে।

যাবৎ বীজ রোপন করা না যায়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল চালাইতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেত্রে গোবর, অস্থিচূর্ণ, খৈল, সোরা এবং লবণ দেওয়া গিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চূণ প্রয়োগ করিলে ইক্ষুক্ষেত্রের বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। বিঘা প্রতি গোবর ২০০ মণ, অস্থিচূর্ণ ৫।৬ মণ, খ'ল ১০ মণ, সোরা পনর সের, এবং লবণ পনর সের দেওয়া গিয়া থাকে। লাঙ্গল দিবার কালে জমিতে গোবর ও অস্থিচূর্ণ দেওয়া উচিত; খৈল বীজ রোপনকালে, এবং লবণ ও সোরা গাছ বাহির হইবার ২।৩ মাস পরে গাছের গোড়ায় দেওয়া গিয়া থাকে। চূণ দিতে হইলে এ সকল সার দিবার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে দেওয়া উচিত, কারণ চূণ দিলে জমির পূর্ব্বস্থিত সার-পদার্থ প্রথমতঃ নষ্ট হইয়া যায়, ও পরে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকে। এ সময়ে অন্য সার দিবামাত্র জমি আগ্রহসহকারে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এসকল সার দিবার পরে যদি চূণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে সমুদায় চূণ সংস্পর্শে নিস্বঃ হইয়া পড়ে। অবশেষে যাহা কিছু কার্য্য হয়, তাহা কেবল চূণের দ্বারাই হইয়া থাকে। রৈইসবাগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইক্ষু গাছে চূণের কার্য্য অতি দ্রুত ও সুফলদায়ক। তথায় ইক্ষুক্ষেত্রের কতকগুলি গাছ উল্লিখিত প্রকারের নিস্তেজ চূণ এক সের করিয়া দেওয়া যায়, অপর গাছ অমনই থাকে। চূণ দিবার কয়েক দিবস পরে ক্ষেত্রে এক মাসের মধ্যে ২।৩ বার 'পাটান' বা ছেঁচ দেওয়া হয়। আন্দাজ এক মাস বাদে ক্ষেত্রস্থিত যাবতীয় গাছে রেড়ীর খ'ল, গোবর ও অস্থিচূর্ণ দিয়া মধ্যে জল সেচন করা হইত। ইহা হইতে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল

গাছে সার দিবার পূর্ব্বে চূণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার আকার অন্য গাছ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্পন্ন, এবং ঝাড়বিশিষ্ট হয়। লাঙ্গল দিবার সময় ইহা দিতে হইলে ২০ হইতে ২৫ ঝুড়ি লাগে, নতুবা গাছের গোড়ায় দিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্পে কাজ চলিতে পারে।

অস্থিচূণ, খৈল প্রভৃতি মূল্যবান সার ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ছড়াইতে খরচ কিছু অধিক পড়িয়া যায় বলিয়া অনেকে বীজ রোপনকালে বা গাছ বাহির হইলে গাছের গোড়ায় গোড়ায় পরিমাণ মত দিয়া থাকেন। এইরূপ মিতব্যয়িতা মন্দ নহে। তবে, এই সকল সার, বিশেষতঃ অস্থিচূর্ণ, গাছের গোড়ায় দিতে হইলে ইতি-পূর্ব্ব হইতে উহাকে পচাইয়া বা দ্রবিত করিয়া রাখা উচিত, কারণ, তাহা হইলে উহা গাছে দিবার অল্প দিন মধ্যেই মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া গাছের আহারোপযোগী হইয়া থাকে, নতুবা দানাযুক্ত অস্থি দ্রবিত হইতেই অনেক দিন কাটিয়া যায়, ওদিকে গাছও এতদূর অগ্রসর হইয়া থাকে যে, সেই সার গাছের পক্ষে হয় ত আদৌ আবশ্যক হয় না, অথবা আবশ্যক হইলেও তাহা অল্প দিনের জন্য।

লবণ ও সোরার তেজ অধিক দিবস থাকে না, এজন্য উহা-দিগকে ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে বিস্তৃত না করিয়া ফসলের মধ্যম অব-স্থায় গাছের গোড়ায় দিলে শীঘ্রই গাছে উহার তেজ পৌঁছে। জমিতে উহার রস না থাকিলে সোরা বা লবণের কোন কার্য্য হয় না। জমি শুষ্ক থাকিলে এই সার প্রদানের পরে জল সেচন আবশ্যক। কেবল এই সারে কেন, সকল সারই জলের সংস্পর্শে না আসিলে বৃক্ষ শরীরে তাহাদিগের কোন কার্য্য হয় না।

হলচালনা ও সার প্রয়োগ দ্বারা জমি তৈয়ার হইলে, বীজ রোপন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য হলচালনার সময়ে যে সার দিতে হয়, তাহা গোবর ও অস্থিচূর্ণ বা চূণ। পরে ক্ষেত্রের দুই পার্শ্বে রজ্জু ধরিয়া সরল রেখানুসারে দেড় হস্ত ব্যবধানে 'জুলি' কাটিয়া যাইবে। এই 'জুলি' এক ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। জুলি হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকা পরে জুলিতেই লাগিবে, এজন্য উহা স্থানান্তরিত না করিয়া পার্শ্বেই রাখিতে হইবে। 'জুলি' কাটা হইলে উহা নালাবৎ বোধ হইবে। এই নালার মধ্যে বরাবর সার দিয়া বীজ রোপন করিবে। প্রত্যেক বীজ পরস্পর অর্দ্ধ হস্ত দূরে থাকিবে; এরূপ করিয়া নালা মধ্যে উহা ফেলিয়া, উপরে ৪। ৫ ইঞ্চ আন্দাজ মাটি চাপা দিতে হয়। সাধারণতঃ ১৫।১৬ দিবসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মৃত্তিকা ভেদ করতঃ গাছ বাহির হইয়া থাকে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে গাছ বাহির না হইলে, নালা মধ্যে উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হইবে। এইরূপ বীজ রোপনকে 'মরিচসহর-প্রণালী' কহে।

দেশীয় প্রণালীতে যে বীজ রোপন করা গিয়া থাকে, তাহা অন্যরূপ। 'মরিচসহর প্রণালী' মত জুলি না কাটিয়া, ক্ষেত্রমধ্যে দুই হস্ত ব্যবধানে এক বা দেড় হস্ত ব্যাস বিশিষ্ট গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ত্রিকোন করিয়া তিনটী বীজ দিয়া, মাটির সহিত সার মিশ্রিত করিয়া, উহা চাপা দিতে হইবে। উপরোক্ত সময় মধ্যে গাছ বাহির না হইলে ইহাতেও জল সেচন করিতে হইবে। এই প্রণালীতে কয়েকটী অসুবিধা আছে;—প্রথমতঃ গাছের 'ঝাড়' গুলিতে অতিশয় রৌদ্র লাগায় ইক্ষু সকল কঠিন হয়, এবং রস শুষ্ক হইয়া যায়; অপরন্তু বেগে বাতাস বহিলে গাছ পড়িয়া

যাইবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু, মরিচ-সহর প্রণালী সে ভয়ের কোন কারণ নাই, ও অল্পস্থানে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে চাষ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ঝাড় সকল বাঁধিয়া দিবার তত আবশ্যক হয় না। অনেক স্থানে বীজকে মৃত্তিকা মধ্যে একবারে না পুতিয়া বীজ গুলির দুই একটী গাঁট মৃত্তিকার মধ্যে ঈষৎ হেলাইয়া পুতিয়া দেয়। ইহাতে বীজের কিয়দংশ মৃত্তিকার উপরিভাগে জাগিয়া থাকে।

অপরাপর বৃক্ষ লতার ন্যায় ফল হইতে ইহার বীজ লইয়া চাষ করিতে হয় না। 'চোক' সমেত ইক্ষুর খণ্ডকে বীজ কহে। ইক্ষু চাষের পক্ষে এইরূপ বীজই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট জাতীয় অথবা কৃশাকার ইক্ষু হইতে বীজ তৈয়ার করা কখনই উচিত নহে। 'চোক' বিশিষ্ট সবল ও সুপুষ্ট ইক্ষু আনিয়া দুই পার্শ্বে 'চোক' সমেত গাঁট রাখিয়া উহা খণ্ড খণ্ড করিবে। প্রতি খণ্ডে ২।৩ বা ৪টী গাঁট রাখা যাইতে পারে। মরিচ সহর প্রণালীর জন্য এইরূপ বীজ কাটিতে হইবে কিন্তু দেশীয় প্রণালীর জন্য পাঁচ ছয়টী গাছ যুক্ত বীজ খণ্ড আবশ্যক, নতুবা যে পরিমাণে স্থান দেওয়া গিয়া থাকে তাহার উপযুক্ত ঝাড় হয় না।

বীজ কাটিতে কিঞ্চিত সতর্কতা আবশ্যক। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা গাঁটগুলির বহির্ভাগে ঈষৎ হেলাইয়া আঘাত করিলে সুচারুরূপে কাটিয়া যায়। কাটিবার সময় চোকগুলির কোন অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। চোক হীন গাঁট রোপন করিলে তাহা হইতে শিকড় বাহির হয় সত্য, কিন্তু উহার চোক ও উঠিতে ও গাছ বাহির হইতে ২।৩ মাস সময় লাগে। এই দীর্ঘ সময় নষ্ট করা অপেক্ষা চোক সমেত বীজ রোপন করায় লাভ আছে।

এতদ্ব্যতীত গাছের 'ডগা' অর্থাৎ প্রান্তভাগ ২।৩ টী গাঁঠ সমেত রোপন করিলে গাছ জন্মিয়া থাকে। অনেকে ইহা ফেলিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা ইহা ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করিতে বলি না। উহা রোপন করিবার সতন্ত্র প্রথা আছে। দুই তিনটী 'ডগা' পরিমিত স্থান ব্যবধানে পরস্পর বিপরীত দিকে হেলাইয়া মাটিতে পুতিয়া দিবে। 'ডগার' পাতাগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া না দিলে উহা শুষ্ক হইয়া গাছকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

শীর্ণ, ক্ষত বা কীটাক্রান্ত অংশ একবারে বাদ না দিলে, তাহা হইতে যে চারা উৎপন্ন হইবে, তাহাও তদনুরূপ হইবার সম্ভাবনা। বরং শীর্ণ বীজ রোপন করা যাইতে পারে, কিন্তু কীটাক্রান্ত বীজ আদৌ রোপন করা উচিত নহে। কীটাক্রান্ত বীজ রোপন করা, এবং কীটের বীজ রোপন করা একই কথা। কীটাক্রান্ত বীজ যে কেবল বাদ দেওয়া উচিত তাহা নহে,—উহা একবারে অগ্নিতে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে ক্রমে উহার অভ্যন্তরস্থিত কীট অন্য বীজে প্রবেশ করিতে পারে। যে সকল ইক্ষুর মধ্যে লাল বর্ণ দেখা যায়, তাহাও কীটাক্রান্ত জানিয়া পরিত্যাগ করিবে। অনেকে মায়া বশতঃ ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এবং তাহাতে যে কেবল নিজেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা নহে,—সেই বীজ যে স্থানে যায়, তথাকারও সমুদায় ইক্ষু ক্রমে নষ্ট হয়।

গাছগুলি একহস্ত পরিমাণ উচ্চে বাড়িলে গোড়ায় মাটি দেওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকার শুষ্কতা অনুসারে বর্ষাকাল ব্যতীত সকল সময়েই ১০ হইতে ১৫ দিবস অন্তর ইক্ষু-ক্ষেত্রে 'পাটান' বা জল সেচন করা উচিত। এরূপ ভাবে জল সেচন করিতে হইবে,

যেন সমুদায় ক্ষেত্র উত্তম রূপে ভিজিয়া যায়। প্রতি দুই তিন বার জল সেচনের পর, একবার কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া দিতে হয়। ইচ্ছা করিলে এসময়ে গাছের গোড়ায় গোড়ায় সার দেওয়া যাইতে পারে। ইক্ষু-ক্ষেত্রে জলের বিশেষ আবশ্যক, এজন্য ইক্ষুর জমি পুষ্করণী বা তড়াগের সন্নিকটে হওয়া উচিত। চাষীগণ ইক্ষু-ক্ষেত্রে জল সেচনের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং তাহতেই জলসেচনের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য করে না। যাঁহারা এরূপ ভ্রমে পতিত তাঁহাদিগের উচিত যে, একই স্থানে দুই খণ্ড জমিতে ইক্ষু লাগাইয়া এক খণ্ডে জলসেচন এবং অপর খণ্ডে জল সেচন না করা। তাহা হইলে কৃষক বুঝিতে পারিবেন যে, জল সেচনের কোন উপকারিতা আছে কি না। গাছ একবার জমিতে লাগিয়া গেলে জল সেচন না করায় যে গাছ মরিয়া যায়, আমরা একথা বলি না বটে, কিন্তু পরীক্ষার ফলে বলিতে পারি যে, জল সেচনে গাছের প্রভূত উপকার হয়। অপরের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঘরের কথা বলিতেছি। 'রৈইসবাগে' ও 'আক্‌জল বাগে' একই সময়ে একই বীজের দ্বারা ইক্ষুর চাষ করা যায়। প্রথমোক্ত বাগানে জলের সুবন্দোবস্ত আছে, এবং আবশ্যক মত সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে জল সেচন করা গিয়া থাকে। শেষোক্ত স্থানে জলের কথঞ্চিৎ অসুবিধা হেতু গাছ বাহির হইবার পরে আদৌ জল সেচন করা হয় নাই। ছয় মাস মধ্যে রৈইসবাগের গাছগুলি যে রূপ শ্রীসম্পন্ন ও তেজস্কর হইয়া উঠিয়াছিল আক্‌জল বাগের গাছ তাহার এক চতুর্থাংশও হয় নাই। কিন্তু আমরা জানি, আকজলবাগের জমি রৈইসবাগ অপেক্ষা উর্ব্বরা ও অক্লান্ত।

এক একটী ঝাড়ে যদি বহুল পরিমাণে গাছ বাহির হয়, তবে

সতেজগুলি মাত্র রাখিয়া ক্ষীণ ও দুর্ব্বলগুলিকে তুলিয়া না দিলে, সমুদায় ঝাড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং এত ঘন হইয়া পড়ে যে, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিয়া, ক্ষেত্রমধ্যে অস্বাস্থ্যতা আনয়ন করে। বহুসংখ্যক ক্ষীণ গাছ হওয়া অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সতেজ ও সুপুষ্ট গাছ শতাংশে শ্রেয়।

পত্র সমেত গাছগুলি তিন হস্ত উচ্চ হইয়া উঠিলে, তাহারই পাতা দ্বারা ঝাড়গুলি বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, গাছ আল্‌গা থাকিলে রৌদ্রতেজে উহার রস শুষ্ক হইয়া যায় এবং উহার সারভাগ কঠিন হইয়া পড়ে। সারভাগ কঠিন হইলে ইক্ষুমধ্যে শর্করার ভাগও হ্রাস হয় এবং ছিব্‌ড়া (fibre) অধিক হয়। এতদ্ব্যতীত বায়ুর সামান্য বেগ হইলে গাছ শায়িত হইবার আশঙ্কা থাকে। 'মরিচ সহর প্রণালীতে' যে চাষ হইয়া থাকে, তাহাকে বাঁধিয়া দিবার তত আবশ্যক হয় না, কারণ তাহা ক্রমে এতই ঘন হইয়া পড়ে যে, তন্মধ্যে সূর্য্যোত্তাপ প্রবেশাধিকার পায় না এবং ঘনতা প্রযুক্ত প্রবল বাতাসেও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

বর্ষার কয় মাস ক্ষেত্রে যেমন জল সেচন করিতে হয় না, অন্যদিকে গ্রীষ্মের কয়েক মাস বহুল পরিমাণে জলের আবশ্যক। এই সময়ে যে জল সেচন করা যায়, তাহাতে ক্ষেত্র একবারে প্লাবিত হওয়া উচিত। সেচিত জল মাটিতে টানিয়া গেলে, ক্ষেত্র কোপাইয়া দিতে হইবে, নতুবা উহা এতই কঠিন হইয়া যায় যে, মৃত্তিকার সহিত বায়ু বা আলোকের কোন সম্বন্ধ থাকে না, এবং স্থানে স্থানে জমি ফাটিয়া যাওয়ায়, তন্মধ্যে এতই রৌদ্র প্রবেশ করে যে, গাছের শিকড় হইতে রস শুকাইতে থাকে ও শিকড়ও

অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। জলাভাবে গাছ সহজে মরিয়া যায় না, কিন্তু জমি কঠিন হইয়া গেলে, গাছের শোচনীয় অবস্থা আনায়ন করে। এজন্য জমি সর্ব্বদা যাহাতে আলগা থাকে, সে বিষয়ে শিথিলতা করা ভাল নহে।

ইক্ষু-ক্ষেত্রে উই পোকা বড় অনিষ্ট করে। উই পোকা নিবারণের জন্য অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা যে উপায় দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার লাভ করিয়াছি, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিলাম। ক্ষেত্রে জল সেচন কালে প্রধান নালার মুখে একখণ্ড কাপড়ের মধ্যে হিঙ্গ বা সর্ষপ খৈলের গুঁড়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে, সেই জল সমুদায় ক্ষেত্রে ব্যপ্ত হইয়া পড়িবে। হিঙ্গ বা সর্ষপ খৈল দ্বারা উই পোকা নিবারণের বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে।

শৃগাল ইক্ষুর পরম শত্রু। রাত্রি কালে ইহারা দলে দলে বাহির হইয়া ক্ষেত্র মধ্যে প্রবেশ করতঃ ইক্ষু ভক্ষণ করে এবং অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে। ইহারা এতই ধূর্ত্ত যে, কোন রূপ বিভীষিকা দেখাইলে ইহাদের ভয় হয় না। এজন্য ইক্ষু ক্ষেত্রের সন্নিকটে পাহারা দিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা ভিন্ন অন্য উপায় দেখা যায় না।

ইক্ষুর গাছ যখন অতিশয় ছোট থাকে, তখন সময়ে সময়ে খরগস আসিয়া নূতন 'ডগা'গুলি কাটিয়া দেয়। ইহাদেগকে তাড়াইবার জন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ করিয়া আগাছা বা কাঁটা দ্বারা ঘেরিয়া দিতে হয়, অথবা প্রত্যেক ঝাড়ের নিকটে খেজুর পাতা একহস্ত মাপে কাটিয়া পুতিয়া দিলে, ইহারা আর ভয়ে তথায় যায় না। ক্ষেত্রমধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলে ইহারা ক্ষেত্র মধ্যে আইসে না, কিন্তু ইহা তাদৃশ সুবিধা

জনক নহে। রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলেও ইহারা আসে না এবং আসিলেও পলায়ন করে। শৃগাল তাড়াইবার জন্যও ইহা মন্দ উপায় নহে।

ক্ষেত্র মধ্যে দশ এগার মাস থাকিলেই ইক্ষু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং তখনই উহা কাটিবার উপযুক্ত সময়। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ইক্ষু নীরস হইয়া যায়, এবং উহার শিরা সকল স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শর্করার ভাগও কমিয়া যায়। আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কাটা গেলে যদিও তাহা হইতে অধিক রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহার রস সুমিষ্ট হয় না। তাহার কারণ এই যে, তাহাতে তখনও অধিক শর্করা জন্মে না। পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বা পরে কাটিলে লোকসান আছে, এজন্য ঠিক সময়ে উহা কাটিতে হইবে। কিন্তু এই সময় নির্দ্ধারণ করা বিচক্ষণতার কার্য্য, এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত তাহা স্থির করা কঠিন। তবে মোটামোটী এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারা যায় যে, গাছের যতদিন সবুজ বর্ণ থাকে, ততদিন উহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই জানিতে হইবে, এবং সে অবস্থাতীত হইয়া অন্য বর্ণ প্রাপ্ত হইলে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। তৃতীয় অবস্থায় ইহার পূর্ণত্ব উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে ইক্ষু কাটিবার সময়।

রেটুন প্রণালী।—ক্ষেত্রের সমুদায় ইক্ষুই যে, পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে। যে গুলি পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাই কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট গুলি রাখিয়া দিলে পর বৎসর পুনরায় সেই ক্ষেত্রে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এক ক্ষেত্রে এইরূপ তিন বৎসর ফসল হইতে পারে। এই সকল গোড়া

হইতে পুনরায় গাছ বাহির হইলে, পুনরায় আর তথায় বীজ রোপন করিতে হয় না। তবে, সেই জমিকে উত্তমরূপে কোপাইয়া, গাছে সার দিয়া প্রথম চাষের ন্যায় অপরাপর পাট করিলে যথা সময়ে আবার ইক্ষু উৎপন্ন হইবে। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর, এবং দ্বিতীয় অপেক্ষা তৃতীয় বৎসরে উৎপন্নের পরিমাণ কম হইয়া থাকে; তবে, প্রচুর পরিমাণে সার প্রদান ও জল সেচন করিতে পারিলে কতক সুবিধা হইতে পারে। যদিও অনেকে এ প্রথার পক্ষপাতী কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি না। একেইত ইক্ষু একবৎসর মধ্যে জমিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তাহাতে যদি উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর একস্থানে উহার চাষ হয়, তবে সে জমি কিছু কালের জন্য অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়া যায়, সুতরাং আমাদের মতে প্রতিবৎসর নূতন জমিতেই চাষ করা ভাল। আমাদের আপত্তির আর একটী প্রধান কারণ এই যে, সে জমিতে হল চালনার উপায় থাকে না এবং বহুল পরিমাণে সার দিতে হয়, অথচ প্রথম বৎসরের ন্যায় গাছ সকল সুপুষ্ট হয় না। ফলতঃ হলচালনার পরিবর্ত্তে কোদালদ্বারা জমি কর্ষণ এবং বহুল পরিমাণে সার প্রদান করিতে যে ব্যয় হইয়া থাকে, সেই ব্যয়ে নূতন জমিতেঅনায়াসে চাষ করা যাইতে পারে এবং ইহাতে আশানুরূপ ফল ও পাওয়া গিয়া থাকে।

নিজের আবশ্যক মত কতকগুলি নীরোগ, সুপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট ইক্ষু বীজের জন্য সতন্ত্র রাখিয়া অপরাপরগুলি কাটিতে হইবে। ইক্ষুর প্রান্তভাগে আদৌ মিষ্টতা থাকে না, এজন্য উহা সদ্য খাইবার কিম্বা গুড় তৈয়ারির পক্ষে কোন আবশ্যক হয় না,

সুতরাং সেই অংশগুলি ফেলিয়া না দিয়া, যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দিলে অনেক সাশ্রয় হয়। বাজারে যে সকল ইক্ষু প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রায় প্রান্তভাগ সংলগ্ন থাকে, এবং ইহাতে যে অনেক বীজ নষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিঃসন্দেহ। জমিতে যাবৎ বীজ পুতিবার সময় না হয়, তাবৎ কালের জন্য ইক্ষুগুলিকে বীজাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া পুষ্করণীর কিনারায় বা ছায়াযুক্ত স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিলে বীজ তাজা থাকে এবং আবশ্যক মত উঠাইয়া লইলেই চলিবে।

আয় ব্যয়।—চাষের তারতম্যানুসারে ইক্ষু ফসল হইতে বিঘা প্রতি পঁচিশ হইতে একশত টাকা লাভ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে খরচ ধরা যায় নাই, কারণ খরচ বাদ দিয়া এই টাকা লাভ থাকিবার সম্ভাবনা। বিঘা প্রতি মোট খরচ ৩০ হইতে ৬০ টাকা পড়ে।

গুড় তৈয়ারি করিবার প্রণালী।—যদিও ইহা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অন্তর্গত নহে, তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করি। ১৮৯৪ খৃঃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় কাশিপুর হর্টিকাল্চারল ইন্ষ্টিটীউশনের যে কৃষি মেলা হয়, তাহাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে আধুনিক প্রণালীতে গুড় তৈয়ার করিয়া সাধারণকে দেখান হইয়াছিল। আমরা তথায় যাহা দেখিয়াছি, এস্থলে তাহাই উল্লেখ করিলাম।

ইক্ষু মাড়িবার বা পেষণ করিবার জন্য টমশন মিল্নী কোম্পানীর যে কল আছে, তাহার মধ্যে ইক্ষু দিলে গোরুর সাহায্যে কল ঘুরিয়া ইক্ষু হইতে সমুদায় রস নিঙ্গড়াইয়া বাহির

হয়। যে দুইটী রোলারের মধ্যে ইক্ষু দিতে হয়, তাহার নিম্নে একটী পাত্র থাকে। যাবতীয় রস আসিয়া তন্মধ্যে পড়ে। সেই রস উত্তমরূপে ছাঁকিয়া বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট ধৌত পাত্রে ঢালিয়া অগ্নিতে চড়াইয়া দিতে হয়, এবং এরূপ প্রচুর পরিমাণে জ্বাল দিতে হয় যে, অল্পক্ষণ মধ্যে অর্দ্ধ ভাগ রস বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। রস ঘন ও দানাবৎ হইয়া আসিলে জ্বাল কমাইয়া উনুন হইতে পাত্র নামাইয়া, ক্রমাগত কাটির দ্বারা নাড়িতে হয়। তাহা হইলে গুড় তৈয়ার হইল। রস, অধিকক্ষণ অগ্নিতে চড়াইতে বিলম্ব করিলে, স্বভাবতঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং অম্লাস্বাদনযুক্ত হইয়া যায়। ইহাতে গুড়ের গুণ অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়।

দেশীয় প্রণালীতে যে গুড় তৈয়ার হয় তাহাতে অনেক বিলম্ব হইয়া থাকে, একারণে যত শীঘ্র রসকে গুড়ে পরিণত করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে গুড় সুন্দররূপে তৈয়ার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ রস অধিকক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে না থাকে; দ্বিতীয়তঃ উনুন বৃহৎ হওয়া চাই; তৃতীয়তঃ জ্বাল দিবার পাত্র প্রশস্ত ও বৃহদাকার হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমোক্ত প্রণালীতে যাঁহারা গুড় তৈয়ার করিতে চাহেন অথবা সেই কলের ও তদানুসঙ্গিক জিনিষের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে পত্র লিখিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

সর্ষপ বা সরিষা।

সর্ষপ রবি শস্যের অন্তর্গত, সুতরাং উহা ভাদুই ফসলের পরে আবাদ করিবার সময়। ধান্য, পাট, ভুট্টা প্রভৃতি যে সকল ফসল বর্ষাকালে জন্মিয়া ভাদ্র আশ্বিন মাসের মধ্যেই জমি হইতে উঠিয়া যায়, তাহাদিগকে ভাদুই ফসল কহে এবং তাহার পরে অর্থাৎ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত যে ফসলের আবাদ হয় তাহাদিগকে রবি বা 'চৈত্রালি' ফসল কহে। ভাদুই ফসল ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই আশ্বিনের শেষ ভাগ মধ্যে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ঠিক করিতে হইবে। জমি বারম্বার লাঙ্গল ও মই দ্বারা কর্ষণ ও চূর্ণ করিয়া কার্ত্তিক মাসে যখন আর আশু বর্ষার আশঙ্কা না থাকিবে, তখন বীজ রোপন করিতে হয়। শীঘ্র শীঘ্র বীজ রোপন করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া অনভিজ্ঞের কার্য্য, কেননা বর্ষা থাকিতে জমির উত্তমরূপ চাষ হওয়া অসম্ভব এবং সেই সময়ে বীজ রোপন করিবার পরে বৃষ্টিপাত হইলে, বীজ মাটী চাপা পড়িয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না, অথবা অঙ্কুরিত হইবার পরেও যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে গাছের গোড়া মাটীতে আঁটিয়া যায়। অতএব যাবৎ বর্ষা অতীত না হয়, তাবৎ অপেক্ষা করিয়া বীজ বুনিতে হইবে।

সাধারণতঃ বিঘা প্রতি এক সের বীজ লাগিয়া থাকে, তবে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা হেতু স্থল বিশেষে তিন পোয়া বীজেও চলে। সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,

সরস ও উর্ব্বরা জমিতে তিন পোয়া, মধ্যবিত্তে পক্ষে এক সের এবং নিকৃষ্ট জমিতে পাঁচ পোয়া বীজ রোপন করিতে হইবে। বীজ যাহাতে সমভাবে ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়ে, এজন্য বীজের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া রোপন করিবে। তদনন্তর ক্ষেত্রে একবার 'মই' চালাইয়া রোপনের কার্য্য শেষ কর। আবাদকাল মধ্যে দুই তিনটা সামান্য বৃষ্টি হইলে সরিষা প্রভৃতি রবি শস্যের সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পৌষ মাসেই গাছে ফুল ধরিয়া থাকে। ইহার ফুল হরিদ্রা বর্ণের। বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে যখন সমুদায় গাছে ফুল ধরে, তখনকার সর্ষপ ক্ষেত্রের দৃশ্য অতি মনোহর। মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে ফাল্গুনের মধ্যভাগের মধ্যে সর্ষপ পাকিয়া উঠে। ফলে সামান্য রস থাকিতেই উহা কাটা আবশ্যক, নতুবা অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া গেলে কতক শস্য আপনা হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, আবার কতক কাটিয়া আনিবার কালে পড়িয়া যায়। এজন্য ফলগুলি একবারে শুষ্ক হইবার ৪।৫ দিবস পূর্ব্বে গাছগুলি কাটিয়া আনিতে হইবে। 'খলেন' পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্ষপের গাছ কাটা হইবার পরে, তাহাদিগকে 'খলেন' মধ্যে আনিয়া ৬।৭ দিবসের জন্য 'জাগ' দিতে হইবে, তাহা হইলে বীজে যে সামান্য রস থাকে তাহা টানিয়া যায়, বা শুষ্ক হইয়া যায়। তখন সেই শস্য মাড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, কতকগুলি সুঁটি হস্তে পেষণ করিতে হয়। বীজ পরিপক্ক হইলে তাহাতে আদৌ সবুজের লেশ মাত্র থাকে না,—সবই ঘন লাল বা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। তখন তাহা যথা নিয়মে

মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া গৃহজাত করিতে হইবে। শস্যের সহিত মাটি বা আবর্জ্জনা থাকিলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, সুতরাং শস্যে এ সকল যাহাতে না থাকিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শস্য 'জাগ' দিবার কালে যদি বৃষ্টি হয় তবে 'জাগ' পচিয়া বীজ নষ্ট হইতে পারে, এজন্য বৃষ্টির আশঙ্কা থাকিলে উহা বিশেষরূপে আবৃত করিয়া দেওয়া উচিত। গৃহস্থ কৃষকের পক্ষে খলেনের উপরে কোন স্থায়ী আবরণ করা ব্যবস্থা।

সরিষার চাষে প্রতি বিঘায় চারি মণ হইতে আট মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহাতে বিঘা প্রতি ৪।৫ টাকার অধিক খরচ হয় না।

সরিষা অনেক কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে ইহার বিশেষ আবশ্যক। ঘানি-গাছে পেষিত হইলে যে তৈল নির্গত হয়, তাহা প্রধানতঃ রন্ধন কার্য্যাদিতে লাগে। তৈল নির্গত করিয়া লইবার পরে যে অবশিষ্ট পদার্থ থাকে, তাহাকে খৈল বলা যয়। উহা গবাদি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং কৃষকগণ সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।

তৈল নির্গমনের জন্য আজ কাল কলিকাতায় বিস্তর কল বসিয়াছে, এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানে ও এক একটী দেখা যায়। কলে তৈল প্রস্তুত হইবার সময় হইতে তৈলের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিত সুলভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ সরিষা বিদেশে চালান হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, এবং তাহা বিদেশীয় বণিকদিগের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও

ভারতীয় কৃষি-স্বার্থের অনুরোধে আমাদিগকে তাহা বলিতে হইল। যে পরিমাণে সর্ষপ রাশি বিলাতে চালান হইয়া থাকে ন্যূনকল্পে তাহার অদ্ধাংশ সার পদার্থ আমাদিগের দেশ হইতে চলিয়া যায়। এইজন্য আমরা মনে করি সদ্য সরিষা চালান না করিয়া, উহা হইতে যদি তৈল বাহির করা যায়, এবং তাহাই চালান দেওয়া হয়, তাহা হইলে কত লক্ষ মণ খৈল প্রতি বৎসর দেশে থাকিয়া যায়, তাহার নিরাকরণ হয় না। আমাদিগের দেশ হইতে ক্ষেত্রজাত যত দ্রব্য বিদেশে যায়, বিদেশ হইতে সেই পরিমাণের শস্যাদি এদেশে আসিলে, আমাদিগের আপত্তির কারণ ছিল না, কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন দেশীয় ক্ষেত্রের দুর্দ্দশা করিয়া সদ্য শস্য বিদেশে চালান দেওয়ায় কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

হরিদ্রা।

হাল্‌কা দো-আঁশ মাটীযুক্ত উচ্চ জমিতে হরিদ্রার চাষ করিতে হয়। মাটী কঠিন হইলে তাহাতে ছাই বা উদ্ভিজ্জ-সার মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহা হাল্‌কা হইয়া থাকে। হরিদ্রা ভারতের নানাস্থানে জন্মে। হরিদ্রা হইতে নানা প্রকার রং প্রস্তুত হয়, এবং উহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়।

হরিদ্রা গাছের শিকড়ে যে মূল থাকে, তাহাকেই হরিদ্রা কহে। মূল-জাতীয় গাছের গোড়ায় বর্ষাকালে জল জমিলে মূল সমুদায় নষ্ট হয়, এজন্য হরিদ্রা চাষের জমি সাধারণ ভূমি হইতে উচ্চ হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমনই সঞ্চিত জল অনায়াসে

নিক্রান্ত হইয়া যায়, এবং মাটি হাল্‌কা হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হরিদ্রা লাভজনক ফসল বটে, কিন্তু উহার চাষে কৃষকগণ তাদৃশ যত্ন করে না, এবং যথেচ্ছাভাবে ও স্থান নির্ব্বিশেষে উহার আবাদ করিয়া থাকে। প্রায় ইহাও দেখা গিয়া থাকে যে, যে সকল স্থান একবারে রৌদ্রের আলোকে বঞ্চিত, বৃক্ষের ছায়াযুক্ত বা আর্দ্র, সেই স্থানেই হরিদ্রা রোপিত হইয়া থাকে। এরূপ নিকৃষ্ট প্রণালীতে হরিদ্রার চাষ করিলে লাভ ত হয়ই না, অধিকন্তু যাহা কিছু হরিদ্রা উৎপন্ন হয়, তাহাও অপকৃষ্ট। সূর্য্যালোক ও বায়ুহীন স্থানে কখন কোনই ফসল সুচারুরূপে জন্মে না। আমরা অনেকস্থানে দেখিয়াছি যে, উদ্যান মধ্যস্থিত নানাবিধ ফল, বিশেষতঃ, অম্র গাছ তলস্থিত জমিতে হরিদ্রা রোপিত হয়, কিন্তু উদ্যানস্বামীগণ লক্ষ্য করেন না যে, ইহাতে ফলের দোষ ঘটে। মুরসিদাবাদে দেখিয়াছি, অনেক সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও সুগন্ধ যুক্ত আম্র হরিদ্রা গাছের সংস্রবে থাকিয়া নিকৃ-ষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষিকার্য্য দ্বারা লাভবান হইবার বাসনা থাকিলে, তৎসংক্রান্ত কোন বিষয়ে,—বিশেষতঃ জমির বিষয়ে,—কৃপণতা করা বড়ই ভ্রম।

মাঘ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত জমি উত্তমরূপে বারম্বার কর্ষণ করিতে হইবে। তিন পোয়া হইতে একহাত গভীর করিয়া মৃত্তিকা চষিতে পারিলে অতি উত্তমই হয়। দেশীয় লাঙ্গলে এতদূর গভীর করিয়া চাষ চলে না এজন্য জমিকে কোদাল দ্বারা উল্টাইয়া শেষে লাঙ্গল ও 'মই' চালনা করিতে পারিলেই সুবিধা। যে উপায়েই হউক, হরিদ্রার জমি গভীর ও আল্‌গা করিতে হইবে। মৃত্তিকা মধ্যে আল্‌গা না পাইলে,

মূল বাড়িতে না পারিয়া কেবল গাছই বাড়িবে। হরিদ্রার গাছ বাড়িলে কৃষকের লাভ কি? এজন্য যাহাতে মূল বাড়িতে পারে, সে বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করা আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে ইট, পাটকেল, ঢেলা, ও শিকড়াদি বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে জমি তৈয়ার হইলে, চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে বীজ রোপন করিতে হইবে। বীজ অর্থে এস্থলে মূল বুঝিতে হইবে। বিঘা প্রতি বিশ সের বীজ হইলেই যথেষ্ট। বৃহদাকারের বীজ রোপন না করিয়া, মূলগুলি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলে, এক এক টুকরা এক একটী বীজ হইবে। মূল গুলি কাটা হইলে উহাকে ভিজা খড়ের মধ্যে ৮।১০ দিবস রাখিয়া দিলে সকলগুলি শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, এবং সেই সময়ে উহাকে ক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে। প্রত্যেক টুকরাতে দুই একটী চোক থাকা আবশ্যক। ক্ষেত্র মধ্যে একহাত অন্তর 'ভেলি' টানিয়া তন্মধ্যে এক বা দেড় ফুট ব্যবধানে এক একটী বীজ চারি পাঁচ অঙ্গুলি মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে। ঘনভাবে বীজ রোপন করিলে স্থানাভাবে গাছ উর্দ্ধে লম্বা হইয়া উঠে, এবং পার্শ্বদেশে ঝাড় বাঁধিতে সুযোগ পায় না; ফলতঃ মূলও বাড়িতে পারে না।

গাছগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে ক্ষেত্রে একবার 'পাটান' ও তদনন্তর নিড়ানি দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যদি একবারেই বৃষ্টি না হয়, তবে আবশ্যক মত একবার বা দুইবার 'পাটান' ও কোদাল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া দিতে পারিলেই হরিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট। আষাঢ় মাসে

বর্ষাগম হইলে, গাছের গোড়ায় খৈল সার দেওয়া উচিত। বিঘা প্রতি দুই তিন মন খৈল লাগে। বর্ষা আরম্ভ হইলে উহাতে আর জল সেচনের আবশ্যক হয় না। মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া, তৃণ জঙ্গলাদি ক্ষেত্র হইতে মুক্ত করিয়া, গাছের গোড়ায় মাটী তুলিয়া দিলে হরিদ্রার বিশেষ উপকার হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষকেরা হরিদ্রার চাষে বিশেষ যত্ন করে না, সুতরাং ইহাতে জল সেচনাদি কার্য্যের কথা শুনিয়া অনেকে বহ্বাড়ম্বর মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমাদের কথায় সারবত্তা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদন করা উচিত।

পৌষ বা মাঘ মাসে গাছ শুষ্ক হইতে থাকে; তখন উহাকে ক্ষেত্র হইতে উঠাইবার সময়। কোদাল দ্বারা জমি কোপাইয়া, গাছের মূল গুলি বাছিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। বড় বড় মূল-গুলি শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে হয়। আট দশ দিবসের রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে, উহাকে অগ্নির উত্তাপে গরম জলে সিদ্ধ করিতে হয়। সিদ্ধ করিবার সময় পাত্রটী ঢাকিয়া রাখিবে, এবং যখন জল গরম হইয়া বাহির হইতে থাকিবে তখন উহা সিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া অগ্নি হইতে নামাইতে হইবে। সিদ্ধ হইবার পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই হরিদ্রা প্রস্তুত হইল। ভবিষ্যতের চাষের জন্য যে বীজ রাখা যায় তাহা সিদ্ধ করিতে হয় না। সুতরাং উহা কাঁচা অবস্থাতেই রাখিয়া দেওয়া উচিত। বিঘা প্রতি দশ মোণ হইতে পনর মণ পর্য্যন্ত হরিদ্রা উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা শুষ্ক ও সিদ্ধ হইবার পরে প্রতি মণে পনর সের দাঁড়ায়। একবিঘা ভূমিতে পনর মণ হরিদ্রা উঠিলে তাহা হইতে সাঁড়ে পাঁচ মণ পাকা হরিদ্রা দাঁড়াইতে পারে।

হরিদ্রার সহিত চুণ মিশ্রিত করিলে ঘন লাল বর্ণে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা হরিদ্রা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করে। হিন্দুগণের অনেক শুভকার্য্যের ইহা একটী উপকরণ। শরীরের কোন স্থানে ব্যথা হইলে বা কোনরূপ আঘাত লাগিলে, পেষিত-হরিদ্রা উত্তপ্ত করিয়া লেপন করিলে উপকার হয়। কৃষিক্ষেত্র অনেক সময় উই-পোকা, পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। হরিদ্রা চূর্ণ করিয়া, অথবা তাহা জলে গুলিয়া, সেই স্থানে দিলে উহারা মরিয়া যায়, অথবা পলায়ন করে।

আর্দ্রক।

চলিত ভাষায় ইহাকে আদা কহিয়া থাকে, সুতরাং আমরা ইহাকে আদা নামে অভিহিত করিব। আদা গাছের শিকড়ে যে মূল থাকে, তাহাকেই আদা কহে।

মূল বিশিষ্ট ফসলের পক্ষে উচ্চ ও হাল্‌কা মাটির প্রয়োজন। আদাগাছের গোড়ায় জল বসিলে উহার মূল পচিয়া যায়, এবং কঠিন বা চিক্কণ মাটিতে উহার চাষ করিলে মূল বৃদ্ধি হইতে পারে না।

যে জমিতে আদার আবাদ করিতে হইবে, তাহা চৈত্র মাসের মধ্যে উত্তম রূপে চষিয়া, ও তাহার মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া, বৈশাখ মাসে বীজ রোপণ করিতে হইবে। হরিদ্রার ন্যায় ইহার মূলই বীজ। আদার জন্য অন্ততঃ নয় ইঞ্চ গভীর করিয়া মাটী চষিতে হইবে এবং উহাকে আল্‌গা করিবার জন্য, ছাই বা উদ্ভিজ্জের

আবর্জ্জনা মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। এক বিঘা জমিতে কুড়ি কি পঁচিশ সের বীজ হইলেই চলিবে।

ক্ষেত্রমধ্যে এক ফুট বা পনর ইঞ্চ ব্যবধানে দড়ি দ্বারা লাইন ধরিয়া প্রতি লাইনের মধ্যে পনর ইঞ্চ অন্তর এক একটী বীজ চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকা মধ্যে রোপন করিবে। বীজ রোপিত হইবার পরে দুই একটী বৃষ্টি হইলে গাছ বাহির হইতে অধিক দিন বিলম্ব হয় না, নতুবা প্রায় এক মাস সময় লাগে। শীঘ্র শীঘ্র গাছ বাহির করিবার মানস থাকিলে কৃত্রিম উপায়ে উহাতে জল সেচন করা আবশ্যক। অঙ্কুরিত হইয়া গাছগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে বড় হইলে সমুদায় ক্ষেত্রকে একবার কোদালদ্বারা কোপাইয়া দিয়া পরে গাছের গোড়ায় গোড়ায় কিয়ৎ পরিমাণে খৈল-সার দিলে গাছগুলি শীঘ্রই বলবান হইয়া উঠে এবং তাহাতে ভবিষ্যতে ফসলের পরিমাণ ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অন্যান্য সার অপেক্ষা রেড়ীর খৈল আদার পক্ষে বিশেষ উপাদেয়। রেড়ীর-খৈল চাপ চাপ থাকে এবং সেই অবস্থায় গাছের গোড়ায় দিলে পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিতে বিলম্ব হয়। অতএব উহা ঢেঁকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেই ভাল হয়। আবাদ কালে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রে জল সেচন করা বিশেষ প্রয়োজন, এবং সে প্রয়োজনীয়তা যিনি অনুভব করেন, তাঁহার পক্ষে আদা-ক্ষেত্রে অন্ততঃ সপ্তাহে একবারও জল সেচন করা উচিত।

আদা-ক্ষেত্র যাহাতে কঠিন ও জঙ্গলময় না হইতে পায়, এজন্য প্রতি মাসে উহা একবার কোপাইয়া এবং মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া নিড়ানি দ্বারা পরিষ্কার ও আল্‌গা করিয়া দেওয়া বিশেষ

প্রয়োজন। গাছের গোড়া যত আল্‌গা রাখিতে পারা যাইবে. ততই গাছের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং ফসলের পরিমাণ বাড়িবে। প্রতিবার যেমন গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবেক সেই সঙ্গে গোড়ায় মাটি তুলিয়া দিতে হইবে।

পৌষ বা মাঘ মাস হইতে গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয়। গাছ গুলি যখন একবারে শুকাইয়া যাইবে, তখন কোদাল দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটি উল্টাইয়া, সমুদায় মূল বাছিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর উহাকে জলে ধৌত করিয়া 'খলন' মধ্যে ছড়াইয়া দিবে এবং পরে জল শুকাইয়া গেলে, তীক্ষ্ণ বঁটী বা অপর কোন অস্ত্র দ্বারা যাবতীয় মূলকে সম্ভবমত আকারে চিরিয়া ও খণ্ড খণ্ড করিয়া, কয়েক দিবস উত্তমরূপে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে সুঁট প্রস্তুত হইল, এবং এই সুঁটই বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে। আর যদি সুঁট প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কাঁচা অবস্থাতেই বিক্রয় হইতে পারে।

এস্থলে সাধারণ পাঠকের বিদিতার্থ পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি যে, কোন ফলের গাছতলায় আদার আবাদ করিলে গাছে রবিশেষ অনিষ্ট হয়, কিন্তু অনেক বাগানে দেখিয়াছি যে, হরিদ্রার ন্যায় আদাও গাছের তলায় রোপিত হয়, ইহাতে যে সমূহ অনিষ্ট হয়, তাহা উদ্যানস্বামী লক্ষ্য করিতে পারেন না। আমরা এ প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী। ছায়াযুক্ত স্থানে উহার আবাদ করিলে কোন লাভ হয় না, তাহা আমরা হরিদ্রার প্রস্তাবে বলিয়াছি।

আলু।

আলু বলিলে সাধারণতঃ নানা প্রকার আলু বুঝাইয়া থাকে, এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, এই প্রস্তাবে কেবল গোল-আলুর বিষয়ই আলোচিত হইবে।

গোল-আলু ভারতীয় জিনিষ না হইলেও এক্ষণে এতদূর প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহা এক্ষণে আমাদের প্রধান তরকারি হইয়া উঠিয়াছে। আলুর এতাদৃশ আদর হইবার দুইটী কারণ আছে; প্রথমতঃ ইহা পুষ্টিকর ও সুখাদ্য; দ্বিতীয়তঃ বারমাসই পাওয়া গিয়া থাকে।

কঠিন বা এঁটেল মৃত্তিকায় আলু ভাল জন্মে না। মৃত্তিকা যত হল্‌কা হইবে আলুর পক্ষে ততই মঙ্গলজনক। এজন্য দো-আঁশ ও বেলে জমিতে আলুর চাষ করিতে হইবে। মাটি এঁটেল বা কঠিন হইলে তাহাকে নানাবিধ সার প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার করিয়া লওয়া উচিত। ঈদৃশ জমির সংস্করণ করিতে হইলে উহাকে গভীররূপে বারম্বার লাঙ্গল দিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ করিতে হয় এবং দেখিতে হইবে যে, উহাতে মাটির চাপ বা ঢেলা আদৌ না থাকে। আলুর চাষের জন্য জমির মাটি ধূলার ন্যায় করিতে হইবে। এঁটেল মাটিকে আল্‌গা করিতে হইলে, উদ্ভিজ্জ-সার বা টাট্‌কা গোবর শুষ্ক করিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয়। কাঁচা গোবর ক্ষেত্রে দিলে নানাবিধ কীট ও আগাছা জন্মিয়া ফসলের অনিষ্ট করে।

আলুর চাষের জন্য উচ্চ ভূমির আবশ্যক। নিম্নভূমি বর্ষায়

ডুবিয়া যায় এবং অতিশয় আর্দ্র থাকে, এজন্য আলুর পক্ষে উহা প্রশস্ত নহে। যদিও এই সকল জমি আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শুষ্ক হইয়া যাওয়া সম্ভব, তথাপি ফসলের সময় দৈবক্রমে বৃষ্টি হইলে জল জমিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ঐ জমিতে বর্ষার জল থাকা প্রযুক্ত উহাকে পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিবার কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। সুবিধামত উচ্চ জমি পাওয়া না গেলে, অগত্যা নিম্নতল জমিতেই চাষ করিতে হয়। কিন্তু, ইদৃশ জমিতে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে, তাহার জন্য জমি ঢালু করা উচিত ও তাহার চারি পার্শ্বে নালার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। উচ্চভূমি অপেক্ষা নিম্নভূমি উর্ব্বরা হইলেও, আলুর পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী মনে করি না।

জমি হইতে 'ভাদুই' ফসল অর্থাৎ আশু-ধান্য, পাট, শন প্রভৃতি কাটা গেলে, ঐ জমি আলুর জন্য তৈয়ার করিতে হইবে। যদি জমিতে কোন ফসল না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়; কেননা জমিতে এক দফা ফসল হইয়া গেলে, তাহার কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা তাহাতে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করিতে হয়। ভাদ্রমাস হইতে ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিয়া জমিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। দুই চারিবার মাটি উলট-পালট হইলে তাহাতে সার ছিটাইয়া পুনরায় উলট পালট করিলে সার সমুদায় মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে। জমি যদি পূর্ব্ব হইতে জঙ্গল বা ঘাস-যুক্ত থাকে, তবে সার মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে উহা অগ্নি দ্বারা পুড়াইয়া দিলে, জঙ্গল মরিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে কীটাদিও বিনষ্ট হয় এবং কিয়ৎ পরিমাণে সার ও সংগৃহিত হয়। ছাই, আলুর একটী প্রধান সার। জঙ্গল দগ্ধ করিবার

কাশে যদিও জমি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ Organic matter) নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু জমিতে কার্ব্বন সঞ্চিত হওয়ায়, বাতাস সংযোগে জমিতে পুনরায় বহুল পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ সংগৃহিত হইয়া থাকে। তখন ইহাতে সার মিশ্রিত করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া থাকে।

আলুর জমিতে অধিক পরিমাণে সার দিলে অধিক ফসল পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১০০ হইতে ২০০ মণ গোবর সার, ৮ মণ রেড়ীর—খৈল অথবা ৩ হইতে ৬ মোণ সুরিষার খৈল, ও মাটির অবস্থা বুঝিয়া, এঁটেল হইলে অধিক এবং দো-আঁশ হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থাৎ ২৫ হইতে ৫০ মণ ছাই দিতে হয়। খৈল জমিতে ছিটাইয়া না দিয়া, বীজ রোপন কালে, বীজের সঙ্গে কিছু কিছু দিলে চলিতে পারে। অস্থিচূর্ণ আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী বটে, কিন্তু সকল স্থানে সমান নহে। কোথাও ইহার সংযোগে জমির উন্নতি হয়, আবার কোথাও জমির অনিষ্ট হয়। আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে, অস্থি-চূর্ণ অপর কোন সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া না দিলে, তাহার কোন উপকারীতা অনুভূত হয় না। অস্থিচূর্ণ মাটির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকরী হইতে বিলম্ব হয়, এজন্য যথায় উহা ব্যবহার করিতে হইবে, সে ক্ষেত্রে জৈষ্ঠমাস হইতে দুই একবার লাঙ্গল দিয়াই উক্ত সার ছড়াইয়া দিতে হইবে। পরে, কয়েক মাস বর্ষার জল পাইয়া উহা পচিয়া গেলে, গাছের ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। সার যদবধি না দ্রবিভূত হয়, তাবৎ তাহার কোন কার্য্য নাই। রাশিকৃত চাউল পরিপূর্ণ গুদামে বসিয়া থাকিলে যেমন মানুষের উদর পূরণ হয় না, কিংবা মৎস্য, মাংস, ঘৃত মাখন পূর্ণ ধর্ম্মভাণ্ডার

বাজ্জারে বসিয়া থাকিলে যেমন মানুষের শরীর বলিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ গাছের গোড়ায় যথেষ্ট সার দিলেই গাছ ফলবতী হয় না। সার পচিয়া উত্তমরূপে বিগলিত না হইলে, উহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সারের কার্য্যকারিতা ও ফসলের স্বভাব না বুঝিয়া অবিমৃষ্যভাবে সার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

জমিতে কয়েকবার লাঙ্গল দেওয়া হইলে তাহাতে 'মই' দিয়া সমুদায় ঢেলা ভাঙ্গিয়া গোবর সার ছিটাইয়া দিবে; তদনন্তর তাহাতে ছাই দিবে। বীজ রোপন কালে সার দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সমুদায় ক্ষেত্রে সমভাবে বিস্তৃত করিয়া দিলে ভাল হয়। আশ্বিন মাসের মধ্যে ক্ষেত্রের সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া রাখা উচিত।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে আলু মহার্ঘ হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে উহা বীজের জন্য কিনিয়া রাখিতে পারিলে, অর্থ বিষয়ে সুবিধা আছে। যাহা হউক, ঘরে বীজ না থাকিলে বাজার হইতে আলু খরিদ করিয়া আনিতে হইবে। বীজ শব্দে এস্থলে আলুই বুঝিতে হইবে। এদেশে প্রকৃত বীজ হইতে আলুর চারা উৎপাদনের প্রথা নাই, এজন্য এদেশে আলুকেও বীজ কহে। বিঘা প্রতি কি পরিমাণ ওজনের বীজ আবশ্যক হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বীজ বড় হইলে, ওজনে অনেক লাগে, কিন্তু ছোট বীজ হইলে তাহাপেক্ষা অল্প লাগে। সাধারণতঃ বড় বীজ বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ, মাঝারি ৩।৪ মণ, এবং ক্ষুদ্র ১॥২ মণ লাগিয়া থাকে।

বীজ রোপন করিবার দুই প্রকার প্রথা আছে। কেহ কেহ

সদ্য আলু রোপন করেন, কেহ বা প্রত্যেক আলুকে টুকরা করিয়া রোপন করেন। বীজ কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে রোপন করিতে হয়। সুতরাং আশ্বিনের ১৫।১৬ দিবস অতীত হইলে বাজার হইতে ভাল বীজ আনিয়া কোন অন্ধকার ও ঠাণ্ডা গৃহ মধ্যে পরস্পর স্বতন্ত্র করিয়া ছড়াইয়া বা মেলিয়া দিবে; বালুকার উপর দিতে পারিলে আরো ভাল হয়। গৃহ মধ্যে ১০।১২ দিবস থাকিলেই বীজ গুলি অঙ্কুরিত হইবে। বীজগুলি গৃহ মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। প্রতি দিন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন আলু পচিয়াছে কি না। যদি কোনটী এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, নতুবা অপরাপর আলুতেও সেই রোগ বিস্তারিত হইবার সম্ভাবনা।

আলুর খণ্ড বা টুকরা রোপন করিতে হইলে, আলুর আকার ও 'চোখের' সংখ্যানুসারে এক একটী আলু দুই তিন বা চারি টুকরা করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক খণ্ডে একটী বা দুইটী সুপুষ্ট 'চোখ' থাকা চাই। রোপন করিবার দুই দিবস পূর্ব্বে আলুগুলি উল্লিখিত প্রণালীতে খণ্ড খণ্ড করতঃ তাহাতে ছাই লাগাইয়া দুই দিবস শুকাইয়া রোপন করিতে হয়। কাটিয়া সদ্য রোপন করিলে অধিকাংশ বীজ পচিয়া গিয়া থাকে।

বীজ তৈয়ার হইতে দিয়া এই অবসরে রোপনের পুর্ব্ব ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক্ষণে শেষবারের মত ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও 'মই' দিয়া 'ভেলি' টানিতে হইবে। 'ভেলি' অর্থে ক্ষেত্রের দুই পার্শ্বে দড়ি ধরিয়া সরল রেখানুসারে কোদাল দ্বারা অল্প পরিমাণে মাটী উঠাইয়া যে নালা হয় তাহাকে 'ভেলি' কহে। এক হাস্ত

ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণে এক দফা 'ভেলি' টানিয়া পুনরায় পূর্ব্ব পশ্চিমে ছয় হস্ত অন্তর 'ভেলি' টানিবে। তদনন্তর উত্তর দক্ষিণে যে ভেলি টানা গিয়াছে, তাহাতে ৯।১০ বা ১২ ইঞ্চ অন্তর এক একটী গর্ত্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে পচা খৈল, গোবর ও ছাই মিলিত সার এক এক সের হিসাবে দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দাও। তৎপর দিবস বীজ লইয়া, প্রতি গর্ত্তে এক একটী বীজ চারি অঙ্গুলি মাটীর নিম্নে পুতিয়া দিতে হয়। ইতিমধ্যে যদি বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আরো কয়েক দিবস মাটি শুষ্ক হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বীজ রোপন করা উচিত, নতুবা আর্দ্র জমিতে বীজ রোপন করিলে উহা পচিয়া যায়। কার্ত্তিক মাস আগত হইলেই যে বীজ রোপন করিতে হইবে তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নাই। কার্ত্তিকেও যদি বর্ষাতিশর্য্য দেখা যায়, তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসে বীজ রোপন করা বরং ভাল। আবার যদি এরূপ বুঝা যায় যে, আশ্বিনেই বর্ষা একবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই মাসেই বীজ রোপন করা যাইতে পারে। বীজ রোপন কালে গর্ত্ত মধ্যে গমের বিচালি, গোরুকে 'জাব' দিবার ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া বিছাইয়া বা মাটির সহিত মিশাইয়া বীজ চাপা দিলে মাটি আল্‌গা থাকে, ও তন্নিবন্ধন আলুর আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল ফসলের এইরূপ মূল জন্মিয়া থাকে, তাহাতে এরূপ করিলে বিশেষ সুবিধা আছে। মাটি কঠিন হইলে, আলু সকল বাড়িতে পারে না এবং আকার বিকৃত হইয়া যায় ও গাছের তেজ হ্রাস হইয়া পড়ে। গমের বিচালি দিবার কারণ এই যে, ইহাতে সহজে 'উই' বা কোন কীট লাগিতে পারে না, এবং শীঘ্র পচিয়াও যায় না ; কিন্তু ধান্যের বিচালি, ঘাস বা

অন্য কোন জিনিষ দিলে, উপকার না হইয়া ক্ষতিই হইয়া থাকে। কঠিন ও বিকৃত আকারের আলু যে আমরা দেখিতে পাই, তাহা জমির কাঠিন্য প্রযুক্তই হইয়া থাকে; কিন্তু টুকরা টুকরা বিচালি, মাটির সহিত সংযুক্ত থাকিলে, মাটি সহজে কঠিন হইতে পারে না; সুতরাং মাটি আল্‌গা পাইয়া, মূল সকল আপন আবশ্যক মত স্থান অধিকার করিবার সুযোগ পায়।

বীজ রোপন করিবার আর একটী উপায় নিম্নে লিখিত হইল;—

রোপন করিবার পূর্ব্বে আলু গুলিকে, ৬ পাউণ্ড (তিন সের) সল্‌ফেট্-অব্-আমোনিয়া (Sulphate of ammonia), ও ৬ পাউণ্ড (তিন সের) নাইট্রেট-অব-পোটাস্ বা সোরা (Nitrate of Potash), ২৫ গ্যালন্ (২৮২॥ সের) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তন্মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখ; পরে উহা হইতে উঠাইয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া রোপন করিবে। *

অঙ্কুরিত অখণ্ড বীজের গাছ ৭।৮ দিবসের মধ্যেই মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া থাকে। আর খণ্ড-বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০ হইতে ১৫ দিবস লাগে। অখণ্ড বীজের গাছ যদি ৭।৮ দিনের মধ্যে, এবং খণ্ড-বীজের গাছ ১০।১২ দিবসের মধ্যে নির্গত না হয়, তাহা হইলে উহাতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। দুই একবার জল সেচন করিলেই সমুদায় গাছ বাহির হইবে। গাছ-গুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে সমুদায় ক্ষেত্রের মাটি নিড়ানি বা কোদাল দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিবে এবং সিউনী বা ডোঙ্গা-কল দ্বারা ক্ষেত্রে উত্তম রূপে জল সেচন করিবে। ক্ষেত্রকে

* Indian Agriculturist, march, 3. 1894.

উত্তমরূপে ভিজাইতে হইলে, ভেলির মুখ খুলিয়া, তন্মধ্যে জল পূরিয়া পুনরায় তাহা বন্ধ করিয়া দিবে। এরূপ করিলে সমুদায় মাটিই ভিজিয়া যাইবে, এবং মাটিতে অনেক দিবস রস থাকিবে। জমি নিতান্ত উচ্চ, শুষ্ক বা বেলে হইলে ১২।১৪ দিবস অন্তর জলসেচন করিবে, নতুবা সাধারণ জমিতে ১৭।১৮ দিবস অন্তর জল সেচন করা চলে। জল সেচনের কয়েক দিবস পরে মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে জমি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, ও গাছের গোড়া নিড়ানি দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিবে। প্রতিবার জল দিবার পরে একবার মাটি আল্‌গা করিয়া দেওয়া, এবং সদা সর্ব্বদা তৃণাদি জঙ্গল পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। বরং জলাভাবে গাছ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জল দিবার পরে মাটী টানিয়া গেলে, ও গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মিলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়,—অনেক সময়ে মরিয়া যায়। ফসলের কয়েক মাস মধ্যে ৪ হইতে ছয়টী ‘সেঁচ’ বা ‘পাটান’ই আলুর পক্ষে যথেষ্ট।

আলুর গাছ যত বড় হইতে থাকে, তত তাহার গোড়ায় মাটি ঢাকা দিতে হয়। মাটি ঢাকা দিবার সময় যেন গোড়ায় অস্ত্রের আঘাত না লাগে, এজন্য বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। ক্ষেত্রে প্রতি দুইবার ‘পাটান্’ দিবার পরে, একবার মাটি ঢাকা দেওয়া, এবং মধ্যে মধ্যে গোড়াআল্‌গা করিয়া দেওয়া ভিন্ন এক্ষণে অন্য কোন কাজ নাই। জমির অভাব না বুঝিয়া ঘন ঘন জল সেচন করিলে মাটি নিতান্ত আর্দ্র হইয়া পড়ে, ও তন্নিবন্ধন গাছ রুগ্ন হয় ও মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত আলু সমূহ পচিয়া যায়।

আলুর ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে পোকা লাগিয়া সমূহ অনিষ্ট সাধন করে; এজন্য উহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা

উচিত। গাছে কীট লাগিলে রন্ধন-শালার ঝুল, চিম্‌নীর ভুষা, সর্ষপ খৈল বা লবনের জল দিলে তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেহ কেহ কেরোসিন তৈল, ঘোল ও জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আমার জনৈকবন্ধু নসীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রশন্ন নাথ লাহিড়ী ও আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে, উহা নিতান্ত ক্ষতিজনক। ঐ ঔষধ দিলে অনেক সময় গাছ মরিয়া যায়, এবং আমাদের ও অনেক গাছ মরিয়া গিয়াছিল। গাছে তূঁত (sulphate of copper) ও তুঁতের জল দিবার ব্যবস্থা ও আছে। মরারক-মঞ্জিল নামক বাগানে আলু-ক্ষেত্রের কীট নিবারণের জন্য দেড় মণ জলে একসের তুঁতের গুড়া মিশ্রিত করিয়া, সেই জল গাছে দিয়া দেখা গিয়াছে, এবং রইসবাগের আলু-ক্ষেত্রে আধ-কাঁচ্চা পরিমাণ তুঁতের গুঁড়া পাতায় ও মাটীর উপরে দিয়া ও দেখিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে, যে গাছে উক্ত তুঁতমিশ্রিত জল বা গুঁড়া দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই ৮।১০ দিবসের মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল। গাছ মরিবার পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ পাতা বিবর্ণ ও ঝাঁজ্‌রার ন্যায় ছিদ্র হইয়া যায়,—অবশেষে শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রণালীতে বোরডোঁ মিকশ্চার (Bordeaux mixture.) প্রস্তুত করিয়া কীটাক্রান্ত গাছে দিলে কীট মরিয়া যায়, এবং গাছের ও কোন ক্ষতি হয় না। উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে বিশেষ কষ্ট বা পরিশ্রম নাই এবং তাহার পরিমাণ ও প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল ; —

তুঁত (sulphate of copper) ⁄২॥০ সের
নিস্তেজ (slaked) চূণ———⁄২॥০ ”
জল——————৫০ গ্যালন।

প্রথমতঃ ৫০ গ্যালন জলে /২॥০ আড়াই সের চূণ কোন কাষ্টপাত্রে ২।১ ঘণ্টা ভিজিতে দিয়া উত্তমরূপে চালনা করিতে হইবে। তদনন্তর অতি সূক্ষ্ম ঝাঁজরা, জাল বা পসমী কাপড় দ্বারা ছাকিয়া জল-মিশ্রিত তুঁত ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিলেই বোর্ডো মিক্শ্চার তৈয়ায় হইল।

মুসোঁ পেরেট (M. Perret) নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেলঃ—

নুতন চূণ (unslaked)	।০ দশ সের।
গুড় ————————	।০ দশ সের।
তুঁত ————————	।০ দশ সের।
জল————————	৩০ গ্যালন—৩ মন ১৫ সের।

দশ গ্যালন জলে দশ সের চূণ ও অন্য দশ গ্যালন জলে দশ সের গুড় উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া এতদুভয়কে মিলিত করিতে হইবে। পরে, তৃতীয় দশ গ্যালন জলে দশসের তুঁত মিশ্রিত করিয়া, পূর্ব্বকৃত চূণ ও গুড় মিলিত জল, ইহার সহিত একত্র করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই জল গাছে দিলে বৃষ্টিতে ধৌত হইয়া যায় না এবং গাছে বা পাতায় লাগিলে উহা দগ্ধ হয় না।

আলুর চাষ সম্বন্ধে বাঙ্গালা কৃষি—বিভাগের মেঃ এন, এন, বানার্জি যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ফ্রান্স দেশের অন্যতম ব্যক্তি প্রোফেসর জিরার্ড সাহেবের এক বিধান আছে। তাহাতে তিনি, সহস্র গুণ জলে ২০ গুণ তুঁত ও ১৫ গুণ চূণ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে বলেন। মিঃ বানার্জি বলেন যে, ইহা বিশেষ ফলদায়ক ও কীট-বিনাশক।

ফসল সংগ্রহ।— ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন গাছ সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন যত্ন সহকারে জমি খনন করিয়া আলু সংগ্রহ করিতে হইবে। গাছ সবুজ থাকিতে তাড়াতাড়ি করিয়া আলু উঠাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তাহাতে আলু সুপুষ্ট হইতে পায় না। গাছ বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিলে, ক্ষেত্রে জল—সেচন একবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, কেননা, এই সময়ে গাছের আর জল আহরণ করিবার শক্তি থাকে না। অধিকন্তু, গোড়ায় জল বসিলে আলু পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। জমি হইতে আলু উঠাইবার কালে মালিক স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন বিশ্বস্ত লোকের তথায় উপস্থিত থাকা উচিত, নতুবা লোকজনেরা অনেক আলু আত্মসাৎ করিতে পারে। জমি হইতে আলু উঠান হইলে, উহাকে পরিষ্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ ক্ষণকাল রৌদ্রে রাখিয়া, তাহার গাত্রের জল শুষ্ক হইলে গৃহজাত করিতে হইবে। আলু রক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক গৃহমধ্যে মাচান করিয়া অথবা কাষ্ঠের চৌকীর উপরে বালুকা বিছাইয়া, তদুপরি আলু সাজাইয়া পুনরায় তাহাতে বালুকা ঢাকা দিতে হয়। আলু রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথা বিশেষ ফলদায়ক ;—

৯৮ ভাগ জলে ২ ভাগ সল্‌ফিউরিক এসিড় (Sulphuric acid) মিশ্রিত করিয়া, তন্মধ্যে ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে আলু শীঘ্র খারাপ্ হয় না। এই জলে বারম্বার আলু ভিজাইতে পারা যায়। কিন্তু আলুর 'ছাল' বা 'খোসা' যদি স্থূল বা পাত্‌লা হয়, তবে সল্‌ফিউরিক এসিডের ভাগ অর্দ্ধ হইতে একভাগ পর্য্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সময়ের সম্বন্ধেও সেইরূপ। পাত্‌লা ছাল হইলে ১০।১২ ঘণ্টা জলের মধ্যে আলু

রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু বীজের জন্য যে আলু রাখা যায়, তাহা এই জলে ভিজাইলে অঙ্কুরিত হয় না; এজন্য উহা সতন্ত্রভাবে যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে হইবে।

বীজের জন্য যে সকল আলু রাখা হইবে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুপুষ্ট হওয়া চাই। ক্ষুদ্র বা অপরিপক্ক বীজে গাছ তেজস্কর হয় না, এবং তাহাতে যে আলু জন্মে, তাহাও ক্ষুদ্রজাতীয় হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশে বীজ রক্ষা বিষয়ে বড় অযত্ন দেখা যায়, এবং সেই কারণেই প্রথম উৎকৃষ্ট বীজ রোপন করিলেও ভবিষ্যতে তাহা নিতান্ত জঘণ্য হইয়া যায়। কৃষিকার্য্য দ্বারা লাভবান হইতে হইলে, বীজ সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

ভারতের নানা স্থানে নানা জাতীয় আলু জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে চিরাপুঞ্জি ও নৈনীতাল জাতীয় আমাদের মতে উৎকৃষ্ট। এই আলু সচরাচর বেলে হইয়া থাকে, এজন্য অনেকে ইহা পছন্দ করেন না, কিন্তু উত্তমরূপে পাক করিতে পারিলে, ইহার আস্বাদন ও আঘ্রাণ বড় সুন্দর হইয়া থাকে। হুগলী ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে যে সকল আলু জন্মিয়া থাকে তাহাও মন্দ নহে; কিন্তু মুরসিদাবাদ অঞ্চলে একপ্রকার লাল আভাযুক্ত আলু জন্মে; তাহা স্বাদ ও আঘ্রাণ শূন্য, এবং অত্যন্ত আটা-যুক্ত। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় দ্বারা, যে ফসল করিতে হইবে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্য ভালই হওয়া উচিত। এ জন্য ভাল জাতীয় আলুর চাষ করা উচিত। তবে, আমরা একথা ও বলি না যে, যাহা মন্দ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে একেবারে অবহেলা করা হউক; বরং, যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নিতান্ত অল্প। ভাল বীজ হইতে

ভাল সামগ্রী উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সুচাষ দ্বারা যিনি মন্দ জিনিষের উন্নতি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দেশ হিতৈষী। এস্থলে একটী প্রকৃত ঘটনা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। একদিন মুরসিদাবাদ সহরের অদূরে নসীপুর নামক স্থানে কোন ভদ্রলোকের কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অনেক রকম ফসল দেখিলাম; তন্মধ্যে ইহাও দেখিলাম যে, ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলুর ফসল রহিয়াছে। আইরিস ও কিড্‌ণী জাতীয় আলু যে যে ক্ষেত্রে ছিল, তাহা শুনিলাম ও দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহাতে নানাবিধ সার যথা, অস্থিচূর্ণ, সুপার-ফস্‌ফেট-অব-লাইম প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ক্ষেত্রে আবশ্যক মত জল সেচন ও হইয়াছে এবং আনুসঙ্গিক যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমুদায়ই পরিপাটী রূপে হইয়াছে। কিন্তু, অপর পার্শ্বে একটী চৌকায় দেশী আলু রোপন করা হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় যে, সে জমিতে সার দেওয়া দূরের কথা,—তাহাতে একবার জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, কিম্বা মৃত্তিকাও খনন করা হয় নাই। আইরিস ও কিড্‌ণী জাতীয় আলুর জন্য তিনি যে রূপ যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস যে, দেশীয় আলুর প্রতিও যদি ঐ রূপ করিতেন তাহা হইলে উহার অনেক পরিমাণে উন্নতি করিতে পারিতেন, এবং ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর সেই নিকৃষ্ট আলুকে উন্নত করিয়া লইতে পারিলে যে, অল্প-দিবস মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নূতন জাতীয় হইত, তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। আবার ইহাও আমার ধারণা যে, দেশী আলুর ন্যায় যদি আইরিস বা কীড্‌ণী আলুর চাষে অবহেলা করা যাইত,

তাহা হইলে উহাও যে অবনতি প্রাপ্ত হইত না তাহার প্রমাণ কি ?

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা, সার, ও পা'টের তারতম্যানুসারে ফসল উৎপন্নের পরিমাণ পরিচালিত হয়। কিন্তু, সচরাচর বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণ আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহাতে খরচ বাঁদে ৩০।৩৫৲ টাকা লাভ থাকে। যে স্থলে ২৫।৩০ মণ মাত্র উৎপন্ন, সে চাষে ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বিঘা প্রতি ২০০।৩০০ মণও আলু জন্মিতে শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ চাষকে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাষ বলিতে পারি। অর্থ বিষয়েই হউক আর পরিশ্রম বিষয়েই হউক, কৃষি কার্য্যে কৃপণতা করিলে, আশানুরূপ ফল হয় না; এজন্য ফসল উৎপাদনে যে যে; উপকরণ আবশ্যক, তাহা যথা সময়ে ও যথা নিয়মে প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন। অনেকে কৃপণতা বশতঃ ভূমি কর্ষণ, সার প্রদান ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্য্য সংক্ষেপে শেষ করিয়া থাকেন; ফলতঃ তাঁহারা পরিনামে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েন। তাহাতেই বলি কৃষিকার্য্যে কৃপণতা করা বিধেয় নহে। সকল বিষয়ে সুবিধার জন্য নিজের সাধ্য ও আয়ত্ব মত অল্প বিস্তর জমি লইয়া চাষ করা উচিত।

আলুর-চাষ আজ কাল অধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও আমাদের নিত্যকুটম্ব হইয়াছে। সুবৎসরে ততদূর জানিতে পারা যায় না কিন্তু সামান্য অজন্মা হইলেই মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সেই জন্য দুর্ভিক্ষ কালে বাজারে যদি যথেষ্ট পরিমাণে আলু মজুত থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা অনেক মনুষ্যের জীবন ধারণ

হইতে পারে। ধান্য, বৃষ্টির মুখাপেক্ষী; কিন্তু আলু বৃষ্টির প্রত্যাশা রাখে না, সুতরাং যে বৎসর ধান্য অজন্মা হয়, সে বৎসর অধিক পরিমাণে আলুর চাষ করা বিধেয়।

যব।

যব রবি শস্যের অন্তর্গত। ভাদুই ফসলের পরে, ও বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া মই দিতে হইবে। যবের, ভূমি গভীররূপে কর্ষণ করা আবশ্যক, কারণ, উহার শিকড় মৃত্তিকার নিম্নদেশে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথম একবার বা দুইবার লাঙ্গল দেওয়া হইলে, বিঘা প্রতি ৪।৫ গাড়ি গোবর সার দিয়া পুনরায় লাঙ্গল চালনা দ্বারা উহাকে মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। 'পলিপড়া' জমি হইলে তাহাতে সার দিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

কার্ত্তিক মাস বীজ রোপন করিবার সময়। সচরাচর বিঘা প্রতি দশ সের বীজ ছিটান হয়, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, তাহাতে বড় পাতলা হয়; পনর সের বীজ দিলেই ঠিক হয়। ছিটাইয়া বীজ বপন করা অপেক্ষা সরল রেখা বিশিষ্ট জুলির মধ্যে বীজ রোপন করার সুবিধা আছে। যবের ক্ষেত্রে এদেশে জল-সেচনের ব্যবস্থা নাই, কিন্তু জল সেচন দ্বারা যে উহার ফলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা সকল কার্য্যই সংক্ষেপে শেষ করিতে চাহি, কাজেই গম, যব, প্রভৃতির আবাদে জল-সেচনের ব্যবস্থা করিতে রাজি নহি; কিন্তু একবার যাঁহারা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন,

তাঁহারা কোন মতে কার্য্য সংক্ষেপ করিতে চাহেন না। বাস্তবিক আসল কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া, কার্য্য সংক্ষেপ করা অহম্মুখতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যাহা হউক, বীজ বপনের ৪।৫ দিবসের মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া থাকে। তখন অন্য বিশেষ কোন পা'ট নাই; তবে ক্ষেত্র জঙ্গলময় না হয় অথবা মৃত্তিকা শুষ্কাইয়া না যায়, ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। গাছগুলি বড় হইলে এবং যদি ক্ষেত্রে জল-সেচনের কোন বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে প্রতি বিঘায় ৭।৮ সের সে'রা ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়।

যাঁহারা শস্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল উহার গাছ গবাদি পশু দিগকে খাওয়াইতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। ক্ষেত্রে মাসে দুইবার জল সেচন করিতে পারিলে, তিনবার গাছ কাটিয়া পশু দিগকে খাওয়ান চলিতে পারে। যাহা হউক, গাছ কাটিয়া লইলে শস্যের পরিমাণ কমিয়া যায়; সুতরাং যাহারা শস্যের জন্য আবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা গাছ না কাটিয়া, ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করেন, তাহা হইলে শস্য অধিক পরিমাণে জন্মিবে।

মাঘ মাসে যব-পাকিয়া উঠে। তখন উহা কা'স্তে দ্বারা কাটিয়া আনিয়া 'খলেনে' রক্ষা করতঃ যথা বিধি মাড়িতে হইবে, এবং তাহার জঞ্জালাদি ঝাড়িয়া গুদামে রাখিবে। বিঘা প্রতি ৫ হইতে ২০ মণ শস্য জন্মে।

বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাদিতে ইহার বিস্তর চাষ হইয়া থাকে, কারণ, ঐ দেশের দরিদ্র লোকেরা ইহার ছাতু খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ছাতু অতি পুষ্টিকর সামগ্রী।

অনেকে অশ্বদিগকে ছাতু খাওয়াইয়া থাকেন,-ইহাতে ঘোড়ার বল বৃদ্ধি করে।

গম।

বেলে বা দো-আঁশ অপেক্ষা এঁটেল মৃত্তিকায় গম যে ভাল জন্মে, ইহার কয়েকটী কারণ আছে। বৎসরের যে ভাগে গমের চাষ হইয়া থাকে, তখন বর্ষা অতীত হইয়া যাওয়ায় মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইয়া যায়। বেলে ও দো-আঁশ মাটির রস আরো শীঘ্র শুকাইয়া যাওয়ায়, তন্মধ্যস্থিত গমের গাছের রসাভাব হইয়া থাকে। এঁটেল মাটির রস-ধারণা-শক্তি অধিক, এজন্য তত শীঘ্র রস শুষ্ক হয় না। যে মৃত্তিকায় একশত ভাগের মধ্যে ৫০ ভাগেরও অধিক কর্দ্দম, এবং পাঁচ ভাগ (অধিক না হয়) চূণ বর্ত্তমান তাহাকে এঁটেল মাটি (Clayey soil) কহে। যে জমিতে অযথা পরিমাণে কর্দ্দমের ভাগ বর্ত্তমান এবং বালি ও দাহ্য পদার্থের অভাব, তাহা গমের উপযোগী নহে। এ সকল কথা গুরুতর হইলেও, কৃষি-কার্য্য করিতে গেলে এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, নতুবা অনেক সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। আবার উহা অপেক্ষা নিম্নতল, এবং নিম্নতল অপেক্ষা যে জমিতে অপর জমির জল আসিয়া পড়ে, এরূপ গ'ড়েন বা 'নামাল' জমি গমের চাষের বিশেষ উপযোগী। এই নামাল জমিকে অনেক স্থানে 'ডোবা-জমি' ও কহিয়া থাকে। ডোবা-জমি রবি শস্যের সময় জাগিয়া উঠে, অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাহার জল শুকাইয়া গেলে মাটি দেখা যায়। ইহার উপকারিতা আমরা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং

প্রস্তাবান্তরে কহিয়াছি। রৈইসবাগে সমতল ভূমির ক্রোড়ে একখণ্ড জমি আছে, ও তাহা প্রায় পূর্ব্বোক্ত জমি অপেক্ষা একহস্ত নীচু। বর্ষাকালে এই খণ্ড জমি ডুবিয়া যায়, এবং উচ্চ জমির জলও ইহাতে আসিয়া পড়ে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ইহার জল শুষ্ক হইলে, যথাবিধি চাষ করিয়া গম বুনা গিয়া থাকে। এই ডোবা-জমিতে এমন সুন্দর ও ঝাড়-বিশিষ্ট গাছ হয় যে, বাগানের অন্য কুত্রাপি সেরূপ হয় না। বলা বাহুল্য যে, এ জমিতে কখনও কোনরূপ সার প্রদান করা যায় না। কেবল রইসবাগ কেন, অন্যান্য অনেক স্থানে আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, উচ্চ জমি অপেক্ষা ডোবা-জমিতে অপরিয্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে এবং নিঃসঙ্কোচে কৃষককে পরামর্শ দিতে পারি যে, সুবিধামত ডোবা-জমি থাকিলে, উচ্চ জমি ছাড়িয়া, ইহাতেই গমের চাষ করা উচিত। 'ডোবা-জমিতে অস্থি-চূর্ণ সার দিলে বিশেষ উপকার হয়, কেননা এরূপ জমিতে স্বভাবতঃ যবক্ষারজানিক সারের প্রাধান্য থাকে, এবং তন্নিবন্ধন গাছের বৃদ্ধি ও বর্ণ নয়নরঞ্জক হয়। তাহা সত্ত্বেও যদি পুনরায় যবক্ষারজানিক সার, অর্থাৎ গোবর, খৈল, মলমূত্র, বা অন্য উদ্ভিজ্জ-সার দেওয়া যায়, তাহা হইলে গাছই বাড়িবে, কিন্তু ফসল হইবার পক্ষে অনিষ্ট হয়। এজন্য কেবল অস্থিচূর্ণ দিলে ফসলের বিশেষ উন্নতি হয়। সাধারণ কৃষকে প্রায় কোন সার ব্যবহার করে না, অস্থিসার ত দূরের কথা।

'ভাদুই ফসল' ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া গেলে জমি উত্তম রূপে কর্ষণ করিতে হয়। গমের জমি যত অধিক কর্ষণ করা যায় ততই

ভাল, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, কৃষকগণ দুই তিনটী মাত্র চাষ, ও দুই একবার 'মই' দিয়া তাহাতেই বীজ ছিটাইয়া দেয়। এ প্রকার হীন-চাষে কিন্তু আমাদের সহানুভূতি অতি অল্প। পুনঃ পুনঃ চাষ করায় ব্যয় আছে স্বীকার করি, কিন্তু সেই ব্যয় যে ফসল হইতে আদায় হয় না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অন্ততঃ পক্ষে গমের জমিতে ১২।১৪ টী চাষ দেওয়া আবশ্যক। ভাদ্র মাস হইতে কার্ত্তিক মাসের প্রথম কয়েক দিবস পর্য্যন্ত জমিতে লাঙ্গল ও 'মই' দিয়া মৃত্তিকা চূর্ণীকৃত করিতে হইবে। লাঙ্গল দিবার কালে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, লাঙ্গলের ফাল্ যেন গভীর রূপে মাটির ভিতর প্রবেশ করে। গমের গাছের শিকড় উপরিভাগে বিস্তৃত না থাকিয়া মৃত্তিকার ভিতরদিকে প্রবেশ করে, সুতরাং গভীরভাবে অন্ততঃ ৭।৮ ইঞ্চ মৃত্তিকা চষিয়া আল্‌গা করা আবশ্যক।

জমি হীন-বল বা নিস্তেজ হইয়া থাকিলে, তাহাতে সার দেওয়া আবশ্যক। লাঙ্গল দিবার সময় গোমায়ু সার দিতে হয় এবং সোরা বা লবন গাছ বড় হইলে দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ডোবা' বা বন্যাপ্লাবিত জমিতে সার দিবার আবশ্যক নাই; তবে যদি দিতে হয়, তাহা হইলে অস্থিচূর্ণ। ধূলাবৎ হইলে লাঙ্গলের সময় দিলেই চলিবে। দানা-যুক্ত সার বর্ষা থাকিতেই জমিতে ছিটাইয়া না দিলে উহা শীঘ্র দ্রবিভূত বা গলিত হয় না। যব-ক্ষারজান বিশিষ্ট জমিতে সোরা দিতে হয় না। ক্ষেত্রে সোরা প্রদান করিলে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জমির অবস্থা বিশেষে বিঘা প্রতি পাঁচ সের হইতে পনর সের সোরা বা লবন, এবং অস্থিচূর্ণ দুই হইতে চারি মণ আবশ্যক।

কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিবার সময়। এদেশীয় কৃষকগণ ক্ষেত্রে

বীজ ছিটাইয়া দিয়া থাকে, কিন্তু জুলি করিয়া তন্মধ্যে বীজ বুনিলে ফসল অধিক হইয়া থাকে এবং ইহাতে আর এক সুবিধা এই যে, আবশ্যক হইলে ক্ষেত্রে 'পাটান' দেওয়া চলে। অনেকের ধারণা যে, গমের চাষে জলের আবশ্যক হয় না, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, গমের ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করায় লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। ক্ষেত্রে যখন গমের গাছ থাকে, তখন যদি মধ্যে মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হয়, তাহাতে ফসলের বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু সে সময় একবারে অনাবৃষ্টি হইলে গমের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা ঘটে। মধ্যে মধ্যে 'পাটান' দ্বারা ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারিলে সে অভাব অনেক পরিমাণে দূরীকরণ করা যাইতে পারে। এ সকল কথা অসঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, কারণ তাঁহাদিগের ধারণা যে, বিঘা প্রতি দুই তিন মণ গমের জন্য জমিতে সার প্রদান বা জলসেচন করিয়া লাভ কি? দুই তিন মণ বিনাসারে বা বিনা জলসেচনেই হইয়া থাকে সত্য বটে, কিন্তু আমরা দুই তিন মণে সন্তুষ্ট নহি। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ জানা গিয়াছে যে সবিশেষ যত্ন করিলে বিঘা প্রতি নয় মণ গম ও কুড়ি মণ খড় পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি দুই বা তিন মণ গমের স্থানে নয় মণ গম উৎপন্নের কথা শুনিলে বঙ্গীয় কৃষক বিস্মিত হইতে পারেন অথবা গল্প কথা মনে করিতে পারেন, কিন্তু গত বৎসর আমি স্বয়ং কাটা প্রতি ষোল সের গম উৎপন্ন করিয়াছি। কাঠা প্রতি ষোল সের হইলে, বিঘা প্রতি আট মণ হইয়া থাকে। প্রতি মণের মূল্য ২॥০ টাকা যদি ধরা যায়, তবে কেবল গমেরই দাম ২০ টাকা; এতদ্ব্যতীত খড়ের মূল্য আছে। এই জমিতে কাঠা

প্রতি এক সের অথবা বিঘা প্রতি অর্দ্ধ মণ সোরা পড়িয়াছে। অর্দ্ধ মণ সোরার মূল্য ১৷৷০ হইতে দুই টাকার অধিক নহে। যাহা হউক ২৲ টাকা ধার্য্য করিয়া লইলাম। তাহা ব্যতীত জমিতে দুই বার জল সেচন করিতে হইয়াছিল। বেতন ভোগী লোকে যদিও জল সেচন করিয়াছিল, কিন্তু সেই কয় জন লোক ঠিকা হইলে ২ বারে এক টাকা চারি আনা হিসাবে আড়াই টাকার অধিক লাগিত না। অতএব সাধারণ চাষ অপেক্ষা এই চাষে বিঘা প্রতি হিসাবে ৪৷৷০ টাকা মাত্র অধিক লাগিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে দেশীয় চাষের প্রথা অনুসরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ২০৲ টাকা হইতে ৪৷৷০ টাকা বাদ দিয়া বিঘা প্রতি ১৫৷৷০ টাকা লাভ থাকে। আবার দেশীয় মতে যে চাষ করা হয়, তাহাতে কোন সার বা জল সেচন করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার উৎপন্ন হইয়াছে ২৷৷০ মণ গম; মূল্য ২৷৷০ হিসাবে ৬।০ টাকা চারি আনা হয় মাত্র। এ সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে নাগপুর ও ডুমরাঁও গবর্ণমেণ্ট ফারমের রিপোর্ট দেখিতে পারেন।

বিঘা প্রতি ১৫ সের বীজ দরকার হয়। কেবল ওজনে পনর সের দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। বীজগুলি কীটযুক্ত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে। দেশীয় নিকৃষ্ট বীজ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমের বা বক্‌সারের ভাল বীজ রোপন করিলে অধিক পরিমাণে গম ফলিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের গমের বীজ বড় অধিক দিন তাজা বা বলিষ্ঠ থাকে না, এজন্য প্রতি বৎসর না হইলেও, দুই এক বৎসর অন্তর নূতন বীজ আমদানী করা উচিত।

পূর্ব্বে যে জুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে কাটিলেই চলিবে। সেই জুলি মধ্যে বীজ দিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে। জুলির মধ্যে বীজ রোপন করিবার আবশ্যক এই যে, ক্ষেত্রে জলসেচনের সুবিধা হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে গমের ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা বা প্রথা প্রচলিত নাই। এজন্য বিনা জুলিতেই বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। বীজ রোপনের পরে, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলে, গমের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বৃষ্টির একান্ত অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রে জল সেচন করা উচিত। অনেক সময়ে মৃত্তিকার এতই রসাভাব হইয়া থাকে যে, গাছগুলি অকালে বিবর্ণ ও শুষ্ক প্রায় হইতে থাকে, এবং তাহা হইতে অতি রুগ্ন ও শীর্ণ শীষ বাহির হয়, তাহাতে কতক দানা বা বীজ অপুষ্ট থাকে এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ অতি সামান্য হয়। গাছে শীষ বাহির হইলে যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রে জল দিলে উহা সুপুষ্ট হইয়া থাকে, অনেকের বিশ্বাস গমের বীজ পাতলা করিয়া রোপন করায় লাভ আছে, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, লাভের মধ্যে রোপন কালে বীজ অল্প লাগে। বীজ পাতলা ভাবে রোপন করায় বিশেষ ক্ষতি আছে। ইহাতে ক্ষেত্র মধ্যে অতিরিক্ত সূর্য্যোত্তাপ প্রবেশ করতঃ জমির রস শুষ্ক করে এবং গাছের শরীর হইতেও অধিকতর পরিমাণে বাষ্পাকারে রস শুষ্ক হইয়া গাছকে হীনবল করে; কিন্তু ঘন ভাবে রোপন করিলে জমি তাদৃশ শীঘ্র নীরস হইতে পারে না এবং গাছগুলি ও সতেজ থাকে।

ফাল্গুন মাসে গম পাকিতে আরম্ভ হয়। শীষ সমেত গাছগুলি যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায়, তখন উহাকে কাটিতে হয়। ইহার

বিচালি যদি গৃহ পালিত গদাদি পশুদিগকে খাওয়াইবার জন্য আবশ্যক না থাকে, তবে ক্ষেত্রমধ্যস্থিত গাছগুলির উপরিভাগস্থ শীষগুলি কাটিয়া লইলেই চলিতে পারে এবং অবশিষ্ট গাছের অংশ ক্ষেত্রেই জ্বালাইয়া দিলে জমি সারবান হয়। যাহা হউক, শস্য কাটা হইলে কোন পরিষ্কৃত স্থানে আনিয়া মাড়িতে হইবে। সাধারনতঃ শস্য মাড়িবার জন্য কৃষকেরা দুই প্রথা অবলম্বন করে। প্রথমতঃ গোরু লইয়া বিস্তারিত শস্যের উপরে ঘুরাইতে থাকে। বারম্বার গোরুর পদ চালনায় শস্য সমুদায় তৃণ ও শীষ হইতে খসিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, শীষ সমেত গাছগুলিকে কাষ্টের তক্তার আছড়াইতে থাকে এবং তাহাতেও শস্যগুলি গাছ হইতে খসিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, সংগৃহিত ফসলের উপর লম্বা যষ্টির দ্বারা উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়া শস্যগুলিকে গাছ হইতে পৃথক করে। অতঃপর তৎসমুদায় ঝাড়িয়া বাছিয়া গুদাম-জাত করিতে হইবে। বিলাতি এক প্রকার (winnowing machine) যন্ত্র আছে; ইহার চক্র ঘুরিবার সময় কিঞ্চিৎ উচ্চ হইতে শস্য ঢালিতে থাকিলে, বাতাসে সমুদায় তৃণাদি উড়িয়া যায় এবং প্রকৃত শস্যগুলি ভূমিস্থিত কোন পাত্রে পড়ে। উক্ত কলের কার্য্য কৃষকগণ কুলা দ্বারা সম্পন্ন করে এবং ইহাতে কার্য্য ও সফল হয়।

বীজ রক্ষা করিবার জন্য এক বোতল বাইসল্‌ফাইড-অব-কার্ব্বণ (Bi-Sulphide of carbon) নামক আরক ব্যবহার করা উচিত। বীজ রাশির মধ্যে উক্ত আরক সমেত বোতলের ছিপি খুলিয়া কোন উপায়ে উহার মুখ খোলা রাখিয়া, তদুপরে বীজ চাপা দিলে, তন্মধ্যে আর কোন কীট থাকিতে পারে না।

আরোরুট।

আরোরুট মূল জাতীয় গাছ এবং ইহা বর্ষাকালে জন্মে। দো-আঁশও হাল্‌কা মাটি-যুক্ত উচ্চ জমিতে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। যে জমিতে বর্ষাকালে জল জমিয়া থাকে, অথবা যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা এঁটেল, তথায় ইহার চাষ আদৌ হইতে পারে না। অতিরিক্ত বর্ষার জলে ইহার মূল পচিয়া যায় এবং কঠিন মৃত্তিকা হইলে মূল বাড়িতে পারে না।

মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট জমিকে উত্তম রূপে আবাদ করিয়া, আবশ্যক হইলে তাহাতে সার প্রদান করিয়া রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ইহার জমি উত্তম রূপে বারম্বার চষিতে হইবে, এমন কি,—মৃত্তিকাকে ধূলাবৎ করিতে পারিলে ভাল হয়। মৃত্তিকা যত হাল্‌কা হইবে, ততই উহার মূল বৃদ্ধি পাইবে। কেবল যে মৃত্তিকার উপরিভাগ এই রূপে চূর্ণ করিতে হইবে তাহা নহে,—মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এক ফুট গভীর করিয়া খনন করতঃ চাষ দিতে হইবে, নতুবা কেবল উপরিভাগ আল্‌গা থাকিলে মূল মৃত্তিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গাছের কাণ্ডাংশ বাড়িবে মাত্র। অন্যান্য সারের মধ্যে গোয়াল-ঘরের পুরাতন আবর্জ্জনা ও অস্থিচূর্ণ আরোরুটের পক্ষে প্রশস্ত। সারের সহিত খড় মিশ্রিত থাকিলে মাটি আরো আল্‌গা থাকে, সুতরাং মূল বাড়িবার পক্ষে সুবিধা হয়। অধিক সার থাকিলে, উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া চাষ দিলে ভাল হয়, অথবা, বীজ রোপন কালে বীজের সহিত অর্দ্ধসের আন্দাজ দিলেই চলিবে।

ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বীজ পুতিবার সময় বটে, কিন্তু নিজের সুবিধা বুঝিয়া উহা সত্বর বা বা বিলম্বে রোপন করিতে হইবে। আমরা সত্বর রোপনের পক্ষপাতী, কিন্তু সত্বর রোপন করিলে চৈত্র্য, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে জমি নীরস হইয়া যায়, সুতরাং উহাতে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করা বিশেষ প্রয়োজন হয়, অন্যথা নূতন গাছগুলি তাৎকালিক প্রখর রৌদ্রের তেজে শুকাইতে থাকে। যাঁহা-দিগের জলের সুবন্দোবস্ত আছে, তাঁহারা ফাল্গুণ্‌ মাসের মধ্যেই বীজ রোপন করিতে পারেন। শীঘ্র শীঘ্র বীজ রোপন করিতে পারিলে লাভ আছে, এবং তাহা এই যে. ফসল অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস ক্ষেত্রে থাকিতে পাওয়ায়, তাহার 'ফলন' অধিক হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের রোপিত বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তাহা বর্ষারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই অঙ্কুরিত হইয়া অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে, এবং বৃষ্টি পাইলেই অমিত তেজে বাড়িয়া উঠে। কিন্তু, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে বীজ রোপণ করিলে একেইত দুই তিন মাস অমনি কাটিয়া যায়, তৎপরে অঙ্কুরিত হইতেও কিছুদিন যায়। পুনরায় সেই নব অঙ্কুরিত চারাগুলি বর্ষার অতিরিক্ত জল আহরণ করিতে পারে না, সুতরাং সেই বর্ষা ফসলের বিশেষ উপকার করিতে পারে না। ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে কিছুতেই বীজ রোপন করা উচিত নহে, কারণ তখন শীত থাকায় বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়,-অগত্যা মৃত্তিকার আর্দ্রতায়, হয় উহা পচিয়া যায়, না হয় পিপীলিকা বা কীটে খাইয়া ফেলে।

ক্ষেত্র মধ্যে এক হাত অন্তর 'জুলি' করিয়া তন্মধ্যে একহাত ব্যবধানে দুইটী বা একটী বীজ পুতিতে হইবে। বীজ পুতিবার

সময় স্থানীয় মাটি উলট্-পাল্‌ট করিয়া লইলে উহা হাল্‌কা হইয়া থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০ হইতে ২০ দিবস লাগে। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে সমুদায় বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া উঠে এবং মাটি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে জল সেচন করা উচিত। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে আর উহাতে জল সেচন আবশ্যক হয় না।

এক্ষণে মধ্যে মধ্যে মাটি কোপাইয়া দিতে হইবে এবং ক্ষেত্রে যাহাতে জঙ্গল না জন্মে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জমিতে যখন কোপান দেওয়া হইবে, তখন গাছগুলির গোড়ায় মাটি দেওয়া উচিত।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ হইতে অর্থাৎ শিশিরপাত আরম্ভ হইলে গাছের তেজ কমিতে আরম্ভ হয়। এ সময়ে বর্ষা শেষ হইয়া যায় বলিয়া, ক্ষেত্রে জল সেচনের আবশ্যক হয় না। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে গাছগুলি শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তখনই উহা উঠাইবার সময়। জমি হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া গাছ উঠাইবার আবশ্যক নাই, কারণ মূলগুলি সুপক্ক হইবার পূর্ব্বে উহা উঠাইলে, মূল মধ্যে জলীয় ভাগই অধিক থাকে এবং সার পদার্থ অতি অল্প থাকে। আবার একদিকে যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র মূল সংগ্রহ করা উচিত নহে, অন্যদিকে, অধিক দিন থাকিলে মূলে আঁশের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, এবং আঁশের পরিমাণ বাড়িলে সার ভাগও কমিয়া যায়। অতএব যথা সময়ে গাছগুলি যত্ন সহকারে মূল সমেত উঠাইয়া লইতে হইবে। তদনন্তর গাছের মূলগুলি স্বতন্ত্র করিয়া পরিষ্কার জলে বারম্বার উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। তখন সেই ধৌত মূলকে ঢেঁকিতে কুটিয়া বৃহৎ গামলায় ফেলিয়া পরিষ্কার জলে গুলিতে হয় এবং তাহাতে যে সমুদায় ছিবড়া

থাকে, তাহা বাছিয়া লইয়া পুনরায় ঢেঁকিতে কুটিয়া জলে গুলিতে হইবে। বারম্বার ঢেঁকিতে কুটিলে, সেই সমুদায় ছিব্‌ড়ার যাবতীয় সারাংশ বাহির হইয়া আসিবে। এইবার সেই গামলার জলকে সূক্ষ্ম ছাকনীর দ্বারা ছেঁকিলে, সমুদায় ছিব্‌ড়া সতন্ত্র হইয়া যাইবে। তৎপরে সেই জলকে পুনরায় সূক্ষ্ম কাপড় দ্বারা ছেঁকিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ঢেঁকিতে কুটিবার কালে উহা কোন মতে ময়লা না হয়, এবং যে জল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও যেন অপরিষ্কার বা ময়লা না হয় কারণ, উহাকে যতই পরিষ্কার রাখিতে পারা যায়, ততই আরোরুটের বর্ণশুভ্র ও উজ্জল হইবে। কুটিবার ও ধুইবার দোষে আরোরুটের বর্ণ ময়লা হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই গাম্‌লাস্থিত ছাঁকা জলকে এক ঘণ্টা কালের জন্য স্থির হইতে দিলে, তম্মধ্যস্থিত যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থ গাম্‌লার তলদেশে গিয়া জমিবে। তখন এরূপ সাবধানে জলটী ফেলিয়া দিতে হইবে যে, উহার সহিত নিম্নস্থিত পদার্থ পুনরায় মিশ্রিত না হয়। এইরূপে সেই সূক্ষ্ম পদার্থকে জল হইতে পৃথক করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই আরোরুট প্রস্তুত হইল।

আরোরুট অনাবৃত ঠাণ্ডা স্থানে রাখিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। এজন্য উহা এরূপ সাবধানে রাখিতে হইবে যে, কোন রূপে উহাতে বাতাস বা ঠাণ্ডা না লাগে। বিক্রয় করিতে হইলে, আরোরুট প্রস্তুত হইবার পরেই, উহাকে টীন বাক্সে পুরিয়া একবারে বন্ধ করিতে হইবে।

আলিপুরে কোন সাহেবের আরোরুটের চাষ আছে। তিনি সেই কার্য্যে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। হুগলী জেলার স্থানে স্থানে ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

* বিঘা প্রতি ৪।৫ মণ আরোরুট জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ ৩১ মণ মূল জন্মে এবং তাহা হইতে ৪।৫ মণ আরোরুট জন্মে। বাজারে একসের আরোরুটের মূল্য ৷৷৹ আনা। অতএব এক বিঘা আরোরুটের আবাদ করিলে ৫২৲ টাকা পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। বিঘা প্রতি আবাদী খরচ ২৫৲ টাকা ধরিলেও ২৭৲ টাকা লাভ থাকে।

হুগলী, বৰ্দ্ধমান, মালদহ, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি জেলা আরোরুট চাষের বিশেষ উপযোগী। আমাদিগের আশা আছে, বাঙ্গালা দেশে ইহার চাষ করিলে প্রভুত পরিমাণে লাভবান হওয়া যায়।

মাঠ-বাদাম।

স্থান বিশেষ ইহাকে চীনের-বাদাম বা মাঠ-কড়াই কহিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইহা বহুকাল হইতে আবাদ হইতেছে, কিন্তু অনেকে অনুমান করেন যে, মাট-বাদাম আমেরিকা মহাদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। এক্ষণে এদেশে বহুল পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে, এবং সহস্র সহস্র মণ প্রতি বৎসর ইয়ুরোপে রপ্তানি হয়। এই বাদাম মনুষ্যের অতি মুখপ্রিয়,-গবাদি গৃহ পালিত পশুগণ ইহার খৈল আহার করিলে বলিষ্ট হয় এবং গাভী দুগ্ধবতী হয়। কৃষকের ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা অমূল্য সার। এতদ্ব্যতীত ইহা হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহা অলিব (Olive Oil) তৈল সদৃশ; সুতরাং অনেক সময়ে অলিব তৈলের পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং জ্বালানী কার্য্য ও সাবান প্রস্তুত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাট বাদামের চাষ অতি সহজ এবং ক্ষেত্রে একবার রোপন করিলে প্রায় আর রোপন করিবার আবশ্যক হয় না। ফসল উঠাইয়া লইলে, যে সমুদায় বীজ ক্ষেত্রে রহিয়া যায়, তাহা হইতেই পুনরায় গাছ বাহির হইয়া ক্ষেত্র ভরিয়া যায়। মুরসিদাবাদের উচ্চতল ভূমিতে মাঠ-বাদাম অতি সুন্দর রূপে জন্মিয়া থাকে। ১৮৯৩ সাল হইতে রৈইসবাগে ইহার চাষ আরম্ভ করা গিয়াছে।

বালিযুক্ত উচ্চতল মাঠান জমিতে চিনের-বাদাম ভাল রূপ জন্মে। নিম্নতল অর্থাৎ যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায়, এঁটেল মাটি এবং ছায়া-যুক্ত স্থান চীনের-বাদামের পক্ষে নিকৃষ্ট জমি। উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযুক্ত বেলে-মাটি নির্ব্বাচন করিয়া, ফাল্গুন মাস হইতে জমিতে উত্তম রূপে চাষ দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হয়। দুই একটী বৃষ্টি হইলেই বীজ রোপন করিতে হইবে। ইহার জমি আলুর জমির ন্যায় চূর্ণ ও আল্‌গা করিতে হইবে। মৃত্তিকার সহিত ইট, পাটকেল থাকিলে, তাহা একবারে বাছিয়া ফেলা উচিত।

মাট বাদামের সুঁটী বা ফলের মধ্যে একটী হইতে চারটী পর্য্যন্ত দানা বা বীজ থাকে। সুঁটী ভাঙ্গিয়া একটী একটী পৃথক করিয়া রোপন করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ণ সুঁটি রোপন করায় যদিও কিছু অধিক বীজ লাগে, তথাপি আমি ইহার পক্ষপাতী, কেননা, পূর্ণ সুঁটী রোপন করিলে তন্মধ্যে যে কয়টী দানা থাকে সবই অঙ্কুরিত হয়, ও অল্প দিবসের মধ্যেই গাছগুলি ঝাড় হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত সুঁটী হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিয়া রোপন করিলে পোকায় খাইয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু সুঁটী থাকিলে

তক্ত সহজে কিছু করিতে পারে না; ইতিমধ্যে গাছও বাহির হইয়া পড়ে।

ক্ষেত্র মধ্যে দেড় হাত অন্তর সরল রেখা টানিয়া, প্রতি রেখার মধ্যে দেড় বা দুই হাত ব্যবধানে চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকার ভিতরে এক একটী সুঁটী পুতিয়া দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ১০।১২ দিন সময় লাগে। মৃত্তিকার রসাভাব বশতঃ বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হইলে ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে বীজ রোপণ করিলে ১৫।২০ দিনের মধ্যে সমুদায় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাহির হইবে। সম্মুখেই বর্ষা আসিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে আর জল সেচনের আবশ্যকতা হয় না। এক্ষণে উহার জন্য অন্য কোন পা'ট করিতে হয় না,—কেবল ক্ষেত্র মধ্যে যে তৃণ বা জঙ্গল জন্মে তাহাই নিড়াণী দ্বারা উঠাইয়া ফেলিতে হয়, এবং গাছের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। গাছের শাখা প্রশাখা যত বাড়িতে থাকে, তত তাহাদের পত্র-গ্রন্থি বা গাঁটে গাঁটে স্থূল সুঁচাকারে শিকড় বাহির হয়। তখন শাখাগুলির কেবল উপরের কয়েকটী পাতা উপরে রাখিয়া সমুদায় অংশ আল্‌গা মাটীর দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। শাখাগুলি এইরূপে যত চাপা দেওয়া যাইবে ততই তাহা বাড়িবে, এবং যত বাড়িবে তত চাপা দিতে হইবে। মাটী চাপা দিতে অবহেলা করিলে গাঁটের শিকড় সকল শুষ্ক হইয়া যায়। যতগুলি শিকড় নষ্ট হইবে, ততগুলি ফল নষ্ট হইল জানিতে হইবে; কারণ, ঐ শিকড়েই বাদাম ফলে। শাখায় মাটী চাপা দিবার কার্য্য প্রতিমাসে একবার করিলেই চলিতে পারিবে। এ কার্য্য সহজ কিন্তু সূক্ষ্ম; এজন্য সাবধানতার সহিত করা উচিত। খরচ লাঘব করিবার

জন্য এ কার্য্য পুরুষ-মজুর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারা সহজে হইতে পারে। স্ত্রীলোকের মজুরী কম, অথচ এই সকল সূক্ষ্ম কার্য্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারা অনায়াসে হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাঠ-বাদাম গাছে ফুল ধরিয়া থাকে। ফুলগুলি হরিদ্রা বর্ণের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাতে ফল হয় না। এই সময় হইতে যতই শিশির পড়ে ও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গাছগুলি বিবর্ণ হইতে আরম্ভ হয় এবং শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি হ্রাস পায়, কিন্তু গাছগুলি একবারে শুষ্ক হইতে দেখা যায় না। এক্ষণে আর শাখায় মাটী চাপা দিবার আবশ্যক হয় না।

মাঘ ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের সময়। ইহার ফসল এক একটী করিয়া সংগ্রহ করা সুকঠিন; সুতরাং কোদাল দ্বারা সমুদায় ক্ষেত্র কোপাইয়া, তাহা হইতে বাদাম গুলি বাছিয়া লইতে হইবে। মাটী হইতে বাদাম বাছাই করিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা ভাল। এক একটী গাছে ১০০।১৫০ ফল জন্মিয়া থাকে, এবং বিঘা প্রতি ৬।৭ মণ ফলন হয়। বাদাম ক্ষেত্র হইতে উঠাবার পরেই রৌদ্রে ৭।৮ দিবস শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। বাদান উঠাইয়া গাছগুলি ফেলিয়া না দিলে, গোরু বাছুরে খাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে কাঁচা বাদামও তাহা-দিগকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। এই গাছ তাহারা আগ্রহ সহকারে খাইয়া থাকে।

জমি হইতে সকল ফল বাছিয়া উঠাইতে পারা না যাওয়ায়, অনেক বাদাম তাহাতে থাকিয়া যায়, এবং একমাস অতীত না হইতেই, ক্ষেত্র ব্যাপিয়া গাছ বাহির হইয়া থাকে। সেই জন্য বাদাম

উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরেই জমিতে 'লাঙ্গল' ও 'মই' দিয়া দিতে হয়, নতুবা গাছ বাহির হইলে তাহাতে আর কোন কার্য্য করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না। একমাস পরে যখন ক্ষেত্র মধ্যে গাছ বাহির হইয়াছে দেখা যাইবে, তখন যে সকল স্থান খালি দেখা যাইবে, সেই সেই স্থানে আবশ্যক মত বীজ পুতিয়া দিলেই চলিবে। রৈইসবাগে প্রথম বৎসর বীজ রোপন করা হইয়াছিল, তৎপরে আর বীজ রোপনের আবশ্যক হয় নাই।

মাঠ-বাদামের ক্ষেত্রে তুলার গাছ অথবা তুলার ক্ষেত্রে বাদামের বীজ রোপন করিলে একচাষে দুই ফসল পাওয়া যায়। ইহাতে কোন ফসলের অনিষ্ট হয় না, বরং বাদামের গাছ তথায় সংলগ্ন থাকায় তুলা গাছের উপকার হইতে পারে, কারণ মাঠ-বাদামের গাছ বায়ু হইতে বহুল পরিমাণে যবক্ষারযান আহরণ করিয়া মাটিকে উর্ব্বরা করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিঘা প্রতি মাঠ-বাদাম ৬।৭ মণ ফলিয়া থাকে এবং প্রতি মণ ন্যূন কল্পে ৫৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় করিলে ১৫৲ টাকা খরচ বাদ দিয়া ৭ মণে ২০ টাকা লাভ থাকে।

পাট।

পাটের কাট্‌তি ও মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা আমাদের একটা বিশেষ ফসল হইয়া উঠিয়াছে। পাটের চাষে অন্যান্য ফসল অপেক্ষা সবিশেষ লাভ থাকে, এজন্য অনেক কৃষকে ধান্যাদির চাষ বন্ধ করিয়া কেবল পাটেরই চাষ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা কিন্তু দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে জানিয়াও যে

আমরা এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি তাহার কারণ এই যে, ইহার চাষ এতদুর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার বিষয় আলোচনা না করিলে পুস্তকের অসম্পুর্ণতা থাকে। আমাদের কর্ত্তব্য যাহা, তাহাই আমরা করিতেছি, কিন্তু ইহাও বলি যে, ধান্তের চাষ বন্ধ করিয়া পাটের চাষে জমি আবদ্ধ করিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব না। তবে যদি দেখিতাম যে, পতিত জমি সমুদায় এতদকার্য্যে ব্যবহার হইতেছে এবং সতন্ত্র লোক ইহাতে নিযুক্ত আছে, তাহা হইলে বরং আহ্লাদের বিষয় ছিল। দিন দিন বিলাতে যতই পাটের আবশ্যক হইতেছে, ততই পাট মহার্ঘ হইতেছে, ফলতঃ পাটের চাষ ও বৃদ্ধি পাইতেছে। অর্থব্যবহার-জীবীগণ ভাবিতে পারেন যে, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইলে বিদেশের অর্থ ঘরে আসিবে, দেশ ধনী হইবে এবং দেশবাসীগণের ঐশ্বর্য্য সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদিগের সম্পুর্ণ মতভেদ আছে, কেননা, আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবল ধন হইলেই শ্রীবৃদ্ধি হয় না, সিন্ধুকের মধ্যে অর্থরাশি থাকিলে ধনী হওয়া যায় না, গৃহস্থের অঙ্গিনামধ্যে সুবর্ণ খনি থাকিলেও তাহাকে ঐশ্বর্য্যশালী কহা যাইতে পারে না। অর্থব্যয় করিয়াও যদি পেট পুরিয়া খাইতে না পাওয়া যায়, তবে অর্থের মূল্য কি? ধনী লোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ লোকের অবস্থা লইয়া দেশের অবস্থা বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া আমরা আর পাঠকের বিরক্তিভাজন হইতে চাহি না।

পাট হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। পরিধেয়বস্ত্র, গাত্রা-বরণের কম্বল, র‍্যাপার, ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য রজ্জু, ব্যবসায়ী

দিগের মাল চালানীর জন্য 'চট' বা থ'লে প্রতি বৎসর রাশি রাশি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাটের কাটতি বৃদ্ধি হওয়ায় ইদানি আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশেও পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। চীন ও ব্রহ্ম দেশেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে বাঙ্গালা দেশেই পাট চাষের প্রাধান্য অধিক। সিরাজগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ও ঢাকায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাট জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহি, পাবনা, ফরিদপূর ও মুরসিদাবাদে পাটের চাষ বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সমুদায় পাট কলিকাতায় প্রতি বৎসর আমদানি হয়। তখন বণিক সম্পদায় উহা খরিদ করিয়া বিলাতে চালান দেয়। এই উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানীগণ ও বেশ লাভ করিয়া থাকেন। কলিকাতার মধ্যে হাটখোলা, আহিরীটোলা, বাগবাজার, চিৎপূর, উল্টাডিঙ্গী ও বেলেঘাটায় ইহার হাট। এই সকল স্থানে মহাজনের আড়ত আছে। ব্যাপারীগণ তথায় মাল আনিয়া পৌঁছিয়া দিলে, বণিকগণ তাহাদের নিকট হইতে অথবা সাক্ষাৎ ব্যপারীগণের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকেন। পাট খরিদ করা হইলে, বণিকগণ ইহা কলে লইয়া গিয়া পরিষ্কার করেন। তদনন্তর বড় বড় গাঁট বাঁধাই করিয়া বিলাতে রপ্তানি করেন।

চাষের প্রণালী। উচ্চ ও নিম্নতল উভয়বিধ জমিতেই পাট জন্মিয়া থাকে, তবে প্রচুর বৃষ্টি না হইলে উচ্চতলভূমিতে পাটের চাষে সুবিধা হয় না। এই জন্য নিম্ন ভূমিতে পাটের চাষ করা যুক্তিসিদ্ধ। মাঘ ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্র হইতে রবি শস্য (স্থান বিশেষে চৈতালি) ফসল উঠিয়া গেলে,

বৈশাখের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত জমি উত্তমরূপে চষিবে। পতিত জমি এই সময়ে অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকায়, তথায় লাঙ্গল চলে না, সুতরাং দুই একটী বৃষ্টিপাত হইলেই জমিতে লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করিতে হইবে। জমিতে ঢেলা না থাকে, এজন্য বারম্বার 'মই' দেওয়া আবশ্যক।

বহুদিনের পতিত জমিতে পাট অতি সুন্দর রূপে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ জমিকে ইংরাজিতে (Virgin soil) কহে। অক্ষত-জমির মৃত্তিকা এতদূর উর্ব্বরা হইবার কারণ এই যে, উহার যাবতীয় পদার্থ উহাতেই মজুত থাকে, এবং তাহার উপরে যে সমুদায় জঙ্গল জন্মিয়া থাকে তাহার পত্র, শাখা ও শিকড়াদি পচিয়া স্বভাবতঃ সাররূপে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থের আধিক্য প্রযুক্ত এরূপ জমিতে পাট অতি সুন্দররূপে জন্মে। গত দুই বৎসর রৈইসবাগে এইরূপ একখণ্ড পতিত জমিতে পাট বুনা গিয়াছিল। এই জমিতে এ নাগাইদ কখনও লাঙ্গল না পড়ায়, উহাতে এতই জঙ্গল হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না। সেই জমির জঙ্গল পরিস্কার করিয়া এবং মৃত্তিকা গভীর করিয়া কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তৎপরে লাঙ্গলের চাষ দিয়া বীজ বুনা যায়। এই জমিতে প্রথম বৎসর বিঘাপ্রতি ৮ মণ 'ফলন' হইয়াছিল এবং গাছগুলি ও ৮।৯ হাত উচ্চ হইয়াছিল। যাহা হউক, জমি যদি নিতান্ত ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হয়, তবে তাহাতে বিঘা প্রতি ১০।১২ গাড়ী গোবর-সার দিলে উহার উপকার হয়।

বৈশাখ মাসের ১৫ দিবসের মধ্যে জমি কর্ষণাদি কার্য্য শেষ করিয়া রাখিতে হইবে। দুই একটী বৃষ্টি হইলেই পুনরায় উহাতে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছিটাইয়া 'মই' দিবে। জমি যদি

সরস ও নিম্নতল হয়, তবে বৈশাখের শেষ ভাগেই বীজ রোপন করা যাইতে পারে, নতুবা জ্যেষ্ঠমাসের শেষ পর্য্যন্তও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকা উচিত। তাড়াতাড়ি করিয়া বীজ রোপনের পর যদি বৃষ্টির অভাব হয় এবং সূর্য্যের উত্তাপ প্রবল হয়, তবে পাটের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এজন্য আকাশের অবস্থা বুঝিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে বীজ রোপন করিবে। বিঘা প্রতি একসের বীজ লাগে। বীজগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য উহার সহিত ২।৩ গুণ মাটি মিশাইয়া রোপন করিলে ক্ষেত্রময় সমভাবে বীজ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পাত্‌লা ভাবে বীজ রোপিত হইলে গাছগুলি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং পাটের পক্ষে তাহা নিতান্ত ক্ষতিজনক। এজন্য পাটের বীজ ঘন করিয়া রোপন করিতে হইবে। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৩।৪ দিবস সময় লাগে। চারা বাহির হইলে যদি দেখা যায় যে, কোন কোন স্থান অতিশয় ঘন হইয়াছে, তবে তাহার মধ্য হইতে আবশ্যক মত চারা উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। গাছের মধ্যে পরস্পর ৫ হইতে ৮ অঙ্গুলির ব্যবধান থাকিলেই যথেষ্ট। গাছগুলি ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে ক্ষেত্রে প্রথমবার 'নিড়ানি' আবশ্যক। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি ভিন্ন আর কোন কাজ নাই। গাছের অনিষ্ট না করিয়া যতদিন নিড়ানি করা চলিতে পারে, ততদিন ১৫।২০ দিবস অন্তর একবার জমিতে নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা গাছের গোড়ায় ঘাস জন্মিয়া গেলে গাছ বাড়িতে পারিবে না।

ভাদ্র মাস হইতে পাটের গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়, এবং সেই ফুল ফলে পরিণত হইয়া যখন পাকিতে আরম্ভ করে, তখনই

পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়। অনেকে কিন্তু ফুল ধরিলেই কিম্বা ফল ধরিলেই গাছ কাটাইতে থাকেন। আমাদের এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁহারা যে ফল ধরিবার পূর্ব্বে অথবা পরেই গাছ কাটাইতে থাকেন তাহার অর্থ এই যে, তাঁহাদের ধারণা,—এই সময়ে গাছ পাকিয়া যায় এবং তখন তাহা কাটাইয়া পাট তৈয়ার করিলে সে পাট কোমল হয় না, সুতরাং মূল্য ও অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, গাছে যখন ফুল আইসে তখন তাহার আশ বা পাট এতই কোমল থাকে যে, কয়েক দিবস জল মধ্যে থাকায় পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, উহার শক্তি পরিপক্ক গাছের পাট অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু ঠিক যে, ফল গাছে পাকিয়া শুষ্ক হইলে পাট শক্ত হয় ও ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং ফলগুলি পাকিবার পূর্ব্বে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই গাছ কাটিতে হইবে। ইহাতে পাটের কোমলতা ও শক্তি উভয়ই রক্ষা পাইবে এবং পাটের ও মূল্য বেশী হইবে। সুতীক্ষ্ণ কা'স্তের সাহায্যে গাছের গোড়াটী কাটা ভিন্ন পাট কাটিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

গাছ কাটা হইয়া গেলে, ক্ষেত্রেই উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার করিয়া তিন চারি দিনের জন্য তৃণাদি আগাছা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। এইরূপ কয়েক দিবস ঢাকিয়া রাখিলে, গাছের রস কথঞ্চিত শুকাইয়া যায় এবং পাতাগুলি, ঝরিয়া যায়। কিন্তু সাবধান, গাছ অতিরিক্ত শুষ্ক হইলে তাহা হইতে আর পাট বাহির হইবে না। নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে গাছগুলি ঝাড়িয়া বড় বড় আঁটী বদ্ধ করিতে হইবে। গাছ ঝাড়িবার সময় উহার অনাবশ্যকীয় অংশ অর্থাৎ উপরিভাগ-

স্থিত অপক্ক ও কোমলভাগ বাদদিয়া আঁটী বন্ধ করিলে, বহনের অনেকভার লাঘব হইবে এবং কাচিবারও সুবিধা হইবে। আঁটী বাঁধা হইলে, তাহাদিগকে কোন সন্নিকটস্থিত জলাশয়ে লইয়া গিয়া, তন্মধ্যে উহাদিগকে ডুবাইয়া তদুপরি মাটীর চাপ চাপা দিতে হয়। যে পুষ্করণীতে পাট 'পচান' করিতে দেওয়া যায়, তাহার জল দুর্গন্ধযুক্ত ও অস্পর্শীয় হইয়া যায় সুতরাং যে পুষ্করণীর জল পান করা যায় তথায় পাট ভিজাইতে দেওয়া কোন মতে শ্রেয়: নহে। পতিত ডোবা বা পুষ্করণী পাট ভিজাইবার পক্ষে উত্তম স্থান। জলে গাছ ভিজাইবার সময় ১০।২০ আঁটী একত্র করিয়া পরস্পরে ভেলার মত বাঁধিয়া, ভেলাটী একটী বাঁশের বা অন্য কোন খুঁটীতে বাঁধিয়া রাখিবে, নতুবা উহা বাতাসে অধিক জলে চলিয়া যাইতে পারে। আঁটী গুলিতে অনেক সংখ্যক গাছ থাকিলে অথবা দৃঢ় করিয়া আঁটী বাঁধা থাকিলে ভিতরের গাছ পচিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু উপরের গুলি কাচিবার উপযুক্ত হয়। কিন্তু এ অবস্থায় কাচিতে গেলে ভিতরের গুলির ছাল, কাটি হইতে সতন্ত্র হইবে না অথচ অধিক দিবস রাখিতে গেলে বহির্ভাগের গাছের ছাল একবারে পচিয়া গলিয়া যাইবে। এই জন্য প্রত্যেক আঁটীতে এতগুলি গাছ থাকা আবশ্যক যে ৭।৮ দিবসের মধ্যে সকল গাছগুলিই কাচিরাব উপযুক্ত হয়। ভেলার উপরে মাটী চাপা না দিলে উহা ভাসিয়া থাকিবে, এবং ভাসিয়া থাকিলে উপরিভাগস্থ গাছ সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে। গাছ শুষ্ক হইলে তাহা হইতে পাট বাহির করা সুকঠিন।

জলে গাছ 'জাগ' দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

গাছে জল দিবার ছয় সাত দিবস পরে প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, গাছ হইতে ছাল সহজে খসিয়া আইসে কি না। যদি না আইসে তবে উহা কাটিবার উপযুক্ত হয় নাই জানিয়া, পুনরায় তদবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে এবং দুই এক দিবস অন্তর পরীক্ষা করিতে হইবে। গাছের ছাল আল্‌গা হইলে পুষ্করণীর কিনারায় আনিয়া তদুপরিস্থিত মাটী ফেলিয়া দিয়া, এক একটী আঁটী কাচিতে হইবে। আঁটী বাহির করিয়া সম্ভবমত কতকগুলি কাটি হাতে লইয়া তাহার গোড়া হইতে দেড় বা দুই হস্ত উর্দ্ধে বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিতে হইবে। পরে কাটিগুলির উপরিভাগ ধরিয়া জলে বারম্বার নাড়িলেই, নিম্ন ভাগের ভগ্নাংশ কাটিগুলি স্বতঃই ভাসিয়া যাইবে। তখন নিম্নদেশের ছাল ধরিয়া জলে রাখিয়া টান দিলেই উর্দ্ধদিকস্থ কাটির অবশিষ্ট ভাগ পৃথক হইয়া যাইবে এবং হস্তে কেবল ছাল থাকিবে। সেই ছালগুলি জলে বারম্বার আছ্‌ড়াইলেই সূত্রবৎ আঁশ বাহির হইয়া আসিবে এবং অন্য অপরিষ্কার অংশ ভাসিয়া যাইবে। এই আঁশকেই পাট কহে। পাট উত্তমরূপে কাচা হইলে নিঙ্‌ড়াইয়া শুকাইবার স্থানে আনিতে হইবে। পুষ্করিণীর জল যদি পঙ্কিল হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত পাট দ্বিতীয়বার সন্নিকটস্থিত পরিষ্কার পুষ্করণীতে কাচিয়া লইলে পাটের বর্ণ উজ্জ্বল ও সাদা হয়। যদি ময়লা জলে পাট কাচা যায় তাহার রং ময়লা হয়।

পাট শুষ্ক করিবার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে লম্বা লম্বা বাঁশের 'ভারা' বাঁধিয়া, তাহাতে কাচা পাট পাতলা ভাবে এলাইয়া দিতে হইবে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এবং

সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর থাকিলে একদিনেই পাট শুকাইয়া যায় নতুবা দুই তিন দিবস লাগে। যত শীঘ্র পারা যায় পাট শুকাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা অধিক দিবসের আর্দ্রতার পাট পচিয়া যায়। পাট শুকাইয়া গেলে তাহাকে গাঁট বাধিতে হইবে। প্রতি গাঁটে এক বা দেড় মণ পাট থাকে। এক গাঁটে ইহাপেক্ষা অধিক পাট দিলে বহনকারীর পক্ষে কষ্টকর হয়। বিঘা প্রতি চারি মণ হইতে নয় মণ পর্য্যন্ত পাটের ফলন হয়।

পাট কাচিবার কালে যদি উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কাচা পাট কোন আবৃত বায়ুযুক্ত স্থানে উক্ত প্রণালীতে মেলাইয়া দিতে হইবে। পাট কাচিবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনার কার্য্য আছে তাহা এই যে, একদিনে যে পরিমাণে পাট কাচিয়া উঠিতে পারা যাইবে, সেই পরিমাণের গাছ একই দিনে ভিজাইতে হইবে। নতুবা সকল গাছ একদিনে জলে দিলে ঐ পাট যথা সময়ে কাচিয়া উঠিতে না পারায়, অনেক নষ্ট হয়। পাট কাচা হইতে বীজ রোপন পর্য্যন্ত পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। অর্থাৎ একদিনে সমুদায় বীজ রোপন করা উচিত নহে। তবে যাঁহাদের সামান্য পরিমাণ জমি পাটে আবদ্ধ হইবে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তথাপি এ নিয়মটীর প্রতি অবহেলা করিবেন না।

ক্ষেত্রের একভাগে কতগুলি সুবৃহৎ গাছ বীজের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া দিবে। এবং তাহা পরিপক্ক ও শুষ্ক হইলে ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিবে। জমি হইতে পাট উঠিয়া গেলে, তাহাতে ইক্ষু, আলু, সরিষা, গম, মসিনা, বুট, মটর, কলাই, তামাক প্রভৃতি বুনিতে পারা যায়।

উপরে যে পাটের বিষয় আলোচনা করা গেল, উহাই ব্যবসায়ীদিগের jute এবং উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে উহার নাম (Corchorus)। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ গাছের ছালে পাট হইয়া থাকে, কিন্তু সে পাটের আমদানী বাজারে হয় না। তবে গৃহস্থগণ সাংসারিক খরচের জন্য তাহা হইতে পাট বাহির করিয়া লইতে পারেন। অপরাপরের মধ্যে সূর্য্যমুখী, (Sunflour), বনঢেঁড়স (Malachra Capitata), কস্তুরা (Hibiscus Abelmoschus), ঢেঁড়স (Hibiscus Esculentus), ইত্যাদি। বনঢেঁড়স, কস্তুরা ও ঢেঁড়সের পাট আমরা তৈয়ার করিবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই কয়েক জাতীয় গাছের পাট অতিশয় দৃঢ় ও চিক্কণ হইয়া থাকে এবং ইহাও যে শীঘ্র বাজারে আমদানী হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি।

তিসি বা মসিনা।

(Linseed)

তিসি রবি শস্য, সুতরাং ইহা আশ্বিনের শেষভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্যে রোপন করিতে হইবে। মুরসিদাবাদ প্রভৃতি অনেকস্থানে ইহার মিশ্রিত আবাদ হইয়া থাকে অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে বুট ও মসিনার বীজ বপন করা হয়। ইহাতে যে কি বিশেষ উপকার তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, বরং ইহা আমরা দেখিয়াছি যে, তিসির সহিত অপর যে ফসল থাকে তাহার কোন উপকার হয় না। তিসির দ্বারা ভূমির দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, সুতরাং অপর ফসল তাহাতে বিশেষ তেজ করিতে

পারে না। অনেকে মনে করেন যে, তিসির গাছ লম্বা হয়, এবং বুট মৃত্তিকার সহিত প্রায় সংলগ্ন হইয়া থাকায় উভয় ফসলেরই এক ক্ষেত্রে আবাদ করিতে পারিলে, অল্প জমি ও অল্প পরিশ্রমে দুই ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমির বিষয়ে কৃপণতা করিয়া একত্রে দুই ফসল আবাদ না করিয়া, পৃথক পৃথক ভূমিতে পৃথক পৃথক শস্য আবাদ করা যুক্তি সঙ্গত।

ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে, জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করতঃ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া 'মই' দিতে হইবে। বিঘা প্রতি সাধারণ ভূমিতে পাঁচ সের এবং উর্ব্বরা ভূমিতে তিন সের বীজই যথেষ্ট। জমি সরস থাকিলে তিন চারি দিবসের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, নতুবা সাত আট দিন সময় লাগে। গাছ বাহির হইলে পরে, ইহার আর কোন পাট করিতে হয় না। পৌষ বা মাঘ মাসে তিসির গাছে ফুল ফুটে। ফুলগুলি দেখিতে বড় সুন্দর,—উহার বর্ণ নীল। চৈত্রমাসে ফসল পাকিয়া উঠিলে ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া 'খলিয়ানে' আনিয়া যথা নিয়মে মাড়িতে ও ঝাড়িতে হইবে। বাজারে যে সমুদায় তিসি আসিয়া থাকে তাহাতে এত মাটী ও জঞ্জাল থাকে যে জিনিষ ভাল হইলেও তাহার মূল্য কম হইয়া থাকে। ইহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ খলিয়ানে মাড়িবার পরে অনেক জঞ্জাল শস্যের সহিত থাকিয়া যায় অথবা সেরূপ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মহাজনেরা কৃষকদিগের নিকট হইতে শস্য খরিদ করিয়া আনিয়া তাহার সহিত নানাবিধ জঞ্জাল অর্থাৎ মাটী, বা পরিত্যক্ত অপরাপর শস্য মিশাইয়া দিয়া থাকে। ইদৃশ নীচভাবে প্রতারণা করায় বিশেষ লাভ নাই কেন না সেই শস্য

যাঁহারা পুনরায় খরিদ করেন, তাঁহারা সেই জঞ্জালের দরুণ মণ শতকরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দিয়া লয়েন। ইহাতে আমাদিগের ধারণা যে, অনেক সময়ে মহাজনগণ অপরকে প্রতারণা করিতে গিয়া নিজেই প্রতারিত হইয়া থাকেন। সাধুতার সহিত ব্যবসা করা উচিত। ইহাতে ব্যবসায়ে একটা প্রতিপত্তি জন্মে ও ব্যবসায়ী মহলে সম্মান থাকে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে বহুল পরিমাণে তিসি বিলাতে রপ্তানি হইত। রুসিয়াতে কিন্তু এক্ষণে উহার অধিক পরিমাণে আবাদ হওয়ায় এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যের অল্পতা বশতঃ বিলাতী সওদাগরগণ ঐ স্থান হইতেই উহা খরিদ করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা, বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তিসির চাষ হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজ হইতে অধিকতর পরিমাণে রপ্তানি হইত, কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ও বোম্বাই এ বিষয়ে প্রধান।

সচরাচর দুই জাতীয় তিসি দেখা যায়। তন্মধ্যে শ্বেত জাতীয় হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহাই উৎকৃষ্ট। ইহার তৈলে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। নানাবিধ বার্নিস, রং, সাবানও ঔষধে ইহা ব্যবহার হয়। তিসি বাটিয়া বা পেষণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ যে 'পুলটিস্' হয়, তাহা ফোড়ায় দেওয়া গিয়া থাকে। মসিনার তৈল কঠোর শীতেও ঘন হয় না বা জমাট বাঁধিয়া যায় না, তবে রৌদ্রে শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। তৈল বাহির করিয়া লইবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা খৈল রূপে ব্যবহৃত হয়। এই খৈল গবাদির আহার ও জমির সারের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

তিল।

(Sesamum Indicum)

তিল দুই প্রকার,—শ্বেত ও কৃষ্ণ। উভয় প্রকার তিল হইতেই তৈল নির্গত হইয়া থাকে এবং তৈলের জন্যই ইঁহার আবাদ হইয়া থাকে। শ্বেত অপেক্ষা কৃষ্ণ তিল হইতে উত্তম তৈল জন্মে। এজন্য শেষোক্ত জাতীয় তিলের বিস্তৃত আবাদ হইয়া থাকে।

তিলের আবাদের জন্য বেলে-ভূমি একবারে পরিহার করিবে। দোঁ-আঁশ মৃত্তিকা অপেক্ষা যে মাটীতে কর্দ্দমের ভাগ অধিক আছে, এরূপ জমিতেই কৃষ্ণ তিল ভাল জন্মে, তাহার কারণ এই যে, ইহার আবাদের অধিকাংশভাগই অনাবৃষ্টিতে কাটাইতে হয়। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত অতি অল্পই হইয়া থাকে। কর্দ্দমবিশিষ্ট ঈষৎ গুরুমাটীতে অপেক্ষাকৃত অধিক রস থাকায় উহার তাদৃশ রসাভাব হয় না, কিন্তু বেলে বা দোঁ-আঁশ মৃত্তিকার জলধারক শক্তি নিতান্ত অল্প। অন্যদিকে চৈত্র বৈশাখের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে জমি এতই নীরস হইয়া যায় যে, গাছ তাহাতে অতি কষ্টে জীবিত থাকিলেও তাহার আকার অতিশয় শীর্ণ হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা কৃষ্ণ তিলের জন্য কর্দ্দম বিশিষ্ট দোঁ-আঁশ মাটীর অন্বেষণ করি। উচ্চ অপেক্ষা নিম্নতল জমিতেই তিল সুশৃঙ্খলে জন্মিয়া থাকে। ইদৃশ কথা শুনিয়া পাঠকের বিস্মিত হইবার কারণ নাই, কারণ নীচু জমি অতিশয় সারবান হয়; দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল জমি বর্ষায় ডুবিয়া যাইবার পূর্ব্বেই কৃষ

তিল পাকিয়া উঠে, এবং কাটিয়া গৃহে আনিতে পারা যায়। অতএব ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। আরও এক কথা, শ্রাবন ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে প্রায় জমিকে ডুবিতে দেখা যায় না এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে এদিক সেদিক দিয়া জল অন্যস্থানে গিয়া পড়ে। আর শ্বেত তিলের জন্য উচ্চ জমি এবং দোঁ-আঁশ মৃত্তিকার আবশ্যক। এই তিল যে সময়ে ক্ষেত্রে থাকে, তখন বর্ষার বিশেষ প্রাদুর্ভাব বশতঃ জমি ডুবিয়া যাইতে পারে এবং কঠিন মৃত্তিকায় অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে শ্বেত তিলের জন্য উচ্চ জমিও দোঁ-আঁশ মৃত্তিকার আবশ্যক।

যে জমিতে তিলের আবাদ করিতে হইবে, তাহাতে উত্তমরূপে চাষ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা সামান্য তৃণাদির শিকড় থাকিলে বর্ষাকালে ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়ে ও তাহাতে ফসলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। কৃষ্ণ তিল ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বপন করিতে হয়, এজন্য মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্র উত্তম রূপে চষিয়া জঙ্গল ও তৃণাদি বাছিয়া পুড়াইয়া দিলে ভাল হয়। ফাল্গুন মাসে বিঘা প্রতি দেড়সের বীজ বপন করা নির্দ্দেশ আছে। বীজ বপন করিবার পরে ক্ষেত্রোপরি 'মই' দিয়া জমি সমতল করিয়া দিবে।

জ্যেষ্ঠ মাসের শেষ ভাগেই প্রায় কৃষ্ণ তিল পাকিয়া উঠে। তখন উহাকে কাটিয়া 'খলেনে' আনিতে হইবে এবং যথা নিয়মে মাড়িয়া ঝাড়িয়া লইবে।

যথাবিধি জমি তৈয়ার হইলে আষাঢ় মাসের প্রারম্ভেই শ্বেত তিল বুনিতে হইবে। যদি ইতিপূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং জমি আর্দ্র বোধ হয়, তবে উহা যাবৎ না শুষ্ক হয় তাবৎ

বীজ বপন নিষেধ। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে একবার লাঙ্গল দিবে। এই ফসল পৌষমাসে পাকিয়া উঠে।

ভূমির উর্ব্বরতানুসারে বিঘা প্রতি দুই হইতে চারি মণ পর্য্যন্ত তিল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিল হইতে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে তিলের কহে। ইংরাজিতে উহার নাম (Gingelly Oil)। বিলাতে সাবান প্রস্তুত করিতে এবং আলোক জ্বালিবার জন্য প্রধানতঃ ব্যবহার হয়। ফ্রান্স দেশে নানাবিধ সুগন্ধি তৈল বা আরক প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে অনেক তিল প্রতি বৎসর রপ্তানি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরব দেশে বিস্তর তিল গিয়া থাকে। এখানে যে 'ফুলেল-তৈল' ভদ্রলোকে গাত্রে মর্দ্দন করেন, তাহাও তিলের তৈলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিলের তৈলে ডাক্তারি ও কবিরাজি অনেক ঔষধ তৈয়ার হয়।

ছোলা।

(Cicer Arietinum)

স্থান বিশেষে ইহাকে বুট কহিয়া থাকে। বুট রবিশস্য, সুতরাং ভাদুই ফসলের জমিতে আবাদ করিতে হয়। ধান্য, পাট, শন প্রভৃতি ফসল জমি হইতে উঠিয়া গেলে, জমি রীতিমত চষিয়া ভাদ্র হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হইবে। বিঘা প্রতি দশসের বীজের আবশ্যক হয়।

মুরসিদাবাদ প্রভৃতি অনেকস্থানে গৃহ পালিত অশ্ব ও গবাদি পশুদিগকে বুটের গাছ খাওয়াইয়া থাকে। গাছে যখন ফল

অৰ্দ্ধ পরিপক্ক হয়, তখন দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালাগণ ও গৃহস্থ ভদ্র লোকেরা ক্ষেত্রের ফসল একবারে খরিদ করিয়া লইয়া তাহাতে গোরু চরাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ ছোলার গাছ খাইলে অশ্ব, মহিষ ও গোরু বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। দুগ্ধবতী গাভীদিগকে খাওয়াইলে তাহারা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং এই দুগ্ধ বলকারক হয়।

সরস দোঁ-আশ মাটীতে বুট উত্তম জন্মে। অনেক ফসলের ন্যায় বেলে মাটিতে বা উচ্চ জমিতে বুট বুনিলে সেই জমি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় মাটীতে রসাভাব হয়; তন্নিবন্ধন গাছ সুপুষ্ট হইতে পারে না। বুট ঘনভাবে বুনিলে মৃত্তিকার রস তাদৃশ শীঘ্র শুষ্ক হইবার আশঙ্কা থাকে না। বুটের গাছ মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইয়া থাকে, এজন্য কৃষকেরা ইহার সহিত তিসি, গম, প্রভৃতি অন্য শস্য একত্রে আবাদ করে।

বুট দুই প্রকারের, শ্বেত ও লাল। কিন্তু সচরাচর শেষোক্ত প্রকারের বুটেরই আবাদ হইয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ অযত্নের সহিত চাষ হওয়ায় বাঙ্গালা দেশীয় বুট অতিশয় নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় ইহা দেখা যায় যে, যে বৎসর ভাদুই ফসল সুচারুরূপে জন্মে, সে বৎসর কৃষকগণের চিত্ত প্রফুল্ল থাকায় উহারা রবি ফসলের প্রতি তাদৃশ যত্নবান হয় না। আবার যে বৎসর ভাদুই ফসল অতি বৃষ্টি, বন্যা বা অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ভালরূপে জন্মে না, সে বৎসর ও চাষীগণ নিরুৎসাহ হওয়ায় রবিশস্যে মনোযোগী হয় না। এতব্যতীত তাহাদিগের ইহাও ধারণা যে, রবি শস্যের জন্য বিশেষ পাটের আবশ্যক করে না। আমরা প্রতি বৎসর প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি যে, ভাদুই ফসল জমি হইতে

উঠিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই কৃষকগণ জমিতে দুই এক বার জমিতে চাষ দিয়াই বীজ ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে ক্ষেত্রময় সমভাবে চাষ পড়ে না, মাটির ঢেলা ও ভাঙ্গে না এবং তৃণাদি যে সকল জঙ্গল থাকে, তাহাও থাকিয়া যায়। ইহারা মনে করে যে, অধিক পরিমাণে জমিতে বীজ বুনিতে পারিলেই অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে। এই ভ্রম বশতঃ তাঁহারা জমি তৈয়ারির প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল কত বিঘা জমিতে আবাদ করা হইল ইহাই দেখে। আবার এরূপ ঘটনার ও অপ্রতুল নহে যে, তাহারা এক বিঘার পরিমাণ বীজ চারি পাঁচ বিঘায় বুনিয়া বিঘার সংখ্যা বাড়াইয়া থাকে মাত্র। ঈদৃশ অযত্নের ফসল যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হয়; অবশেষে সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া কৃষক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে।

অগ্রহায়ণ পৌষ মাস নাগাইদ বুটের গাছে ফুল ধরে। তদনন্তর উহাতে যে সুঁটী ধরে, তন্মধ্যে একটী দুইটী বা তিনটী করিয়া দানা থাকে। দানা পরিপুষ্ট ও সুপক্ক হইলে গাছ সমেত উহা 'খলেনে' আনিয়া মাড়িতে হয়। ফাল্গুন হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে বুট পাকিয়া উঠে। তখনই উহা কাটিবার উপযুক্ত সময়। গাছ সম্পুর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যাইবার ৫।৬ দিবস পূর্ব্বে উহা কাটিয়া 'খলেনে' আনয়ন করা কর্ত্তব্য, নতুবা সুঁটী অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেলে, উহা ফাটিয়া গিয়া দানাগুলি মাটিতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঈষৎ কাঁচা থাকিতে গাছ কাটিয়া আনিয়া কয়েক দিবস 'খলেনে' শুষ্ক করিয়া মাড়িয়া লওয়া সুবিধাজনক।

বিঘা প্রতি দুই মণ হইতে পাঁচ মণ বুট উৎপন্ন হইয়া

থাকে, কিন্তু শৃঙ্খলা ও যত্ন সহকারে চাষ করিতে পারিলে উৎপন্নের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হইতে পারে ইহা সুনিশ্চিত।
* ডাক্তার রুক্টি সাহেব বলেন যে ছোলার গাছ হইতে Oxalic Acid নামক এক প্রকার জলীয় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে এবং কৃষকেরা উহা ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করে।

কার্পাস তুলা।

আহারীর শস্যের মধ্যে ধান্য ও গম যেরূপ অতিশয় আবশ্যকীয় জিনিষ, সেইরূপ পরিধেয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য তুলার আবশ্যক। আমরা যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তদধিকাংশই কার্পাস তুলা নির্ম্মিত। ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর যে কত সহস্র সহস্র মণ তুলা বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের টারিফ রিপোর্ট দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

তুলা ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং ভারতের নানা স্থানে ইহার যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে 'ঢাকা-মসলিন নামক যে অতি সুক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হইত তাহা ঢাকা তুলাজাত। সেই কাপড় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ইয়ুরোপীয় ধনীগণ নানা কার্য্যে ব্যবহার করিতেন। আজ পর্য্যন্ত ঢাকা-মসলিনের নাম ও প্রশংসা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই।

---

* Dr. Voigt's Hortus Suburbanus Calcultensis.

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা ও জল বায়ুর গুণে সকল স্থানে এক প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হয় না। আসাম, ঢাকা, বেহার, উত্তর পশ্চিম, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি দেশে বিশেষ বিশেষ তুলা জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইদানী অনেক স্থানে মার্কিন ও মিসর তুলার আবাদ হইতেছে। বিদেশী তুলার মধ্যে ন্যানকিন, জর্জিয়ান, নিউঅর্লিন্স, ডনক্যান ও পিয়ারলেস জাতী প্রচলিত। আমরা যে কয়প্রকার আবাদ করিয়াছি তন্মধ্যে বিদেশীয় নিউ অর্লিন্স ও ডন্‌ক্যান এবং বেরারের ঝারি ও রানি জাতীয় তুলা উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে। শিবপুর গবর্ণমেণ্ট ফারমের রিপোর্ট দেখা যায় যে, ন্যানকিন জাতীয় তুলা তথায় ভালরূপ জন্মে। কাশিপুর ইনষ্টিটিউশন ফারমে ম:রোহিল তুলা ভালরূপে জন্মিয়াছিল; ইহার ফল বড় এবং আঁশ বা তুলা লম্বা ও দৃঢ় হয়। বিদেশীয় তুলার ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও আঁশ অতি কোমল ও বর্ণ চিক্কণ সাদা। পরীক্ষার ফলে আমরা বলিতে পারি যে, বিদেশীয় তুলার উৎপন্ন দেশীয় তুলা অপেক্ষা কম। বিদেশীয় তুলার সহিত দেশীয় ভাল জাতীয় তুলার দ্বারা শঙ্কর-বীজ উৎপন্ন করিয়া লইলে যে ফসল্ হইবে, তাহাতে আমাদিগের ধারণা, উভয়বিধ গুণ থাকিবার সম্ভাবনা এবং পরস্পরের মধ্যে যে দোষ থাকিবে তাহাও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। শঙ্কর বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য সহজ উপায় এই যে এক ক্ষেত্রেই উত্তম জাতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় তুলার মিশ্রিত আবাদ করিতে হয়। তাহা হইলে পরস্পরের ফুলে পরমাণু বা রেণু সঞ্চারিত হইলে নূতন জাতী উৎপন্ন হইবে এবং সেই বীজ হইতে যে ফসল হইবে, তাহা উভয়জাতী হইতে স্বতন্ত্র হইবে। তুলা এইরূপে

সহজে শঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য নিকৃষ্ট জাতীয় তুলার সহিত উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার আবাদ করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে। কারণ উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা হয়ত নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব উৎকৃষ্টজাতীয় তুলার আবাদ করাই উচিত।

তুলার আবাদের জন্য বিশেষরূপে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উচ্চ ও হাল্‌কা দোঁ-আশ মৃত্তিকাযুক্ত জমিই তুলা আবাদের পক্ষে প্রশস্ত। অধিক বালি বিশিষ্ট জমিতে তুলা ভাল জন্মে না, কিন্তু যাহাতে দাহ্য পদার্থের অংশ অধিক, তাহাতে তুলার চাষে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্ন জমিতে উহার আবাদ করিলে বর্ষাকালে ক্ষেত্র ডুবিয়া যাইতে পারে এবং উহার শৈত্যতা বশতঃ গাছের অনিষ্ট হওয়া সম্ভব। তুলা বারমেসে ফসল, সুতরাং এরূপ স্থলে উহার আবাদ করিতে হইবে যথায় বর্ষাকালে জল না দঁড়ায় কিম্বা গ্রীষ্মকালে মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক না হয়, অথবা হইলেও উহাতে জলসেচনের সুবিধা থাকে। নিকটে পুষ্করণী বা ইঁদারা না থাকিলে ক্ষেত্রে জলসেচনের বিশেষ কষ্ট হয় এবং অধিকদূর হইতে কোন কৌশলে জল আনিতে বিস্তর খরচ পড়িয়া যায়।

তুলার জমিতে বিস্তর চাষ দেওয়া আবশ্যক। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত উহাতে অভাব পক্ষে দশ বারো বার চাষ ও মই দেওয়া উচিত। জমিতে ঢেলা থাকিলে তাহা চূর্ণ করিয়া সমুদয় ক্ষেত্র ধূলাবৎ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে খনার একটী সুন্দর বচন উদ্ধৃত করা গেল—

"শতেক চাষে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা,

তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাষে পান।"

বারম্বার চাষ দিয়া জমি আলগা, ও চূর্ণ করিতে হইবে। দুই চারিবার চাষের পরে ক্ষেত্রে গোবরের সার বা রেড়ীর খৈল বিস্তৃত করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ও মই দেওয়া হইলে জমী তুঁলা চাষের উপযোগী হয়। জমি যদি স্বভাবতঃ কঠিন বা এঁটেল হয়, তবে তাহার সহিত ছাই বা উদ্ভিজ্জ সার যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হইবে। মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ সার প্রদত্ত হইলে তুলার গাছ সকল সুশ্রীও সবল হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তুলা কম পরিমাণে জন্মে। জমিতে অস্থিচূর্ণ দিলে তুলার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে অস্থিসার দিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে বা আষাঢ় মাসের প্রথমেই বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনে দুইটী প্রণালী আছে। কোথাও বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়, কোথাও বীজ একটী করিয়া রোপন করিতে হয়। আমরা শেষোক্ত প্রণালীর পক্ষপাতী। বীজ একবারে ক্ষেত্রে রোপন না করিয়া চারা—'ভাটীতে চারা তৈয়ার করিয়া ক্ষেত্রে লাগাইলে সুবিধা আছে। ভাঁটীর মাটি অত্যন্ত হাল্‌কা করিয়া তাহাতে চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে এক, একটী বীজ রোপন করিয়া মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিবে। বীজ ৫।৬ দিবসের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু তখন যদি প্রচণ্ড রৌদ্র থাকে, তাহা হইলে ভাঁটীকে কোন আচ্ছাদন দ্বারা দিনের বেলায় ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক নতুবা রৌদ্রে নূতন চারা মরিয়া

যাইতে পারে। যাবৎ ক্ষেত্রে উহা লাগান না যায় তাবৎ উহাতে উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হইবে, এবং প্রতিদিন বৈকালে ভাঁটীর ঢাকা খুলিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ রূপ অবস্থায় রাখিয়া দিবে ও পর দিবস প্রাতে ৯।১০ টার সময়ে পুনরায় ঢাকিয়া দিবে।

বীজ যাহাতে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, এই জন্য আমরা সোরার জল ও গোমায়ু মিশ্রিত জলে বীজকে পৃথক পৃথক পাত্রে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উহকে একঘণ্টা কালের জন্য বাতাসে বা অল্প রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ভাঁটীতে রোপন করিয়াছিলাম। ভাটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথম খণ্ডে সোরা-পাত্রের, দ্বিতীয় খণ্ডে গোমায়ু,-পাত্রের ও তৃতীয় খণ্ডে সদ্য বীজ রোপন করা যায়। বলা বাহুল্য যে, তিন খণ্ড ভূমিই এক প্রকার তদ্বির প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিন দিবস পরে দ্বিতীয় খণ্ডের, চার দিবস পরে প্রথম খণ্ডের ও ৬ দিবস পরে তৃতীয় খণ্ডের বীজ অঙ্কুরিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বীজ হইতে যে সকল চারা জন্মে তাহা তৃতীয় খণ্ডের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়াছিল। এই সময় হইতে যখনই আমরা তুলার বীজ আবাদ করিতাম তখনই গোবর জলে উহাকে একরাত্রি ভিজাইয়া পরে যথাবিধি রোপন করিতাম।

আষাঢ় মাসের ১৫।১৬ দিবস অতীত হইলে, অর্থাৎ উপর্য্যু-পরি যখন কয়েক দিবস বৃষ্টি হইতে থাকে, তখন চারাগুলি সাবধানের সহিত ভাঁটী হইতে তুলিয়া, দুই হাত অন্তর লাইনে ও প্রতি লাইনে আড়াই বা তিন হাত ব্যবধানে এক একটী চারা রোপন করিতে হইবে। যখনই চারা একস্থান হইতে তুলিয়

অপর স্থানে পুতিতে হইবে, তখনই স্বায়ংকালে সে কার্য্য সম্পন্ন করিলে সুবিধা এই যে, স্থানান্তরিত হওয়ায় গাছের যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা রাত্রিকালের শীতল বাতাসে অনেক পরিমাণে লাঘব হইয়া আইসে, কিন্তু রৌদ্রের সময় পুতিলে সেই কষ্ট লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং চারা মরিয়া না গেলেও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয়।

অপরাপর অনেক বীজের ন্যায় যাহারা তুলার বীজও জমিতে ছড়াইয়া দেয় তাহাদিগকে এত পরিশ্রম করিতে হয় না সত্য, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, আমাদিগের প্রণালী অধিকতর ফলদায়ক, কারণ ছিটাইয়া দেওয়া বীজ যদিও অঙ্কুরিত হয়, তথাপি তাহা সুশৃঙ্খলে হয় না। কোথাও ঘন কোথাও পাতলা ভাবে জন্মে এবং তাহাতে পরবর্ত্তী পাইটের বিশেষ অসুবিধা হয়। লাইন করিয়া নিয়মিত ভাবে পুতিলে পরে জমি কোপাইবার, জল সেচন করিবার ও ফল উঠাইবার অনেক সুবিধা হইয়া থাকে।

যতদিন বর্ষা থাকে ততদিন ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে জমি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দিলেই চলে। জমি কোপাইবার কার্য্য প্রতিমাসে একবার করিলেই যথেষ্ট। গাছগুলি দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া উঠিলে, মৃত্তিকা হইতে একহস্ত পরিমাণ রাখিয়া গাছের উপরিভাগ কাঁচির দ্বারা কাটিয়া দিতে হয়, নতুবা উহাতে শীঘ্রই ফল আসিয়া পড়ে এবং সেই একমাত্র শাখায় অধিক ফল ও হইতে পায় না। গাছের মাথা ছাঁটিয়া দিলে অবশিষ্টাংশ হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া গাছগুলি ঝাড় বিশিষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহাতে অপরিমিত ফল

ধরিয়া থাকে। বর্ষা অতীত হইলে মৃত্তিকার অভাব বুঝিয়া পনর হইতে কুড়ি দিবস অন্তর ক্ষেত্রে উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হয় এবং চারি পাঁচ দিবস পরে মৃত্তিকার রস ইষৎ শুষ্ক হইলে জমি কোপাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আশ্বিন মাস হইতে গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সেই ফুল ক্রমে ফলে পরিণত হয়। ইহার ফুল ঢেঁড়সের ফুলের ন্যায়। পৌষ মাস হইতে ফল পাকিতে আরম্ভ হয় এবং উহা পাকিয়া যখন ফাটিয়া যায় তখনই ফল সংগ্রহ করিবার সময়। ফল প্রতিদিন রৌদ্রের সময় সংগ্রহ করা উচিত। প্রাতে সংগ্রহ করায় দোষ এই যে, রাত্রিকালের শিশিরে উহা ভিজিয়া থাকে সুতরাং সে অবস্থায় তুলিলে উহাতে ময়লা লাগিতে পারে। প্রতিদিন ফল উঠাইলে উহা আর রৌদ্র, বাতাস বা শিশিরে বিবর্ণ হইতে পায় না। তুলা বিবর্ণ হইলে মূল্য কমিয়া যায়। যখন পাকিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন প্রতিদিবসই ফল পাকিতে থাকে, সুতরাং প্রতিদিন ক্ষেত্র মধ্যে অন্বেষণ করিয়া ফাটা ফল গুলি সংগ্রহ করিতে হইবে। যে ফল আপনা হইতে না ফাটিয়া যায়, সে ফল কদাচ উঠান কর্ত্তব্য নহে, কারণ তখনও তাহার আঁশ নরম থাকে। ফল ফাটিয়া গেলেই জানা যায় যে, গাছের সহিত উহার সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে, তখন আর উহাকে গাছে রাখিলে উপকার না হইয়া ক্ষতি হইবে।

ফল উঠাইয়া ভূমিতে বা অপরিষ্কার পাত্রে কখন রাখা উচিত নহে কারণ ইহাতে তুলার বর্ণ খারাপ হইয়া যায়। সংগ্রহকারীদিগের প্রত্যেকের সহিত একটী পরিষ্কার চাঙ্গারি থাকিলে উহারা অনায়াসে ফল উঠাইয়া সেই চাঙ্গারি মধ্যে রাখিতে

পারে। যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তুলার আবাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক জাতীয় তুলা স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া দিতে হইবে, নতুবা জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল তুলা মিশিয়া গেলে কোন জাতিরই বিশেষত্ব থাকে না, সুতরাং মূল্যের ও তারতম্য হয় না। তুলা সংগ্রহ করিবার জন্য বালক অথবা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলে অল্প খরচে কার্য্য নিষ্পত্তি হয়।

ফল সংগৃহিত হইলে উহাকে কর্ম্মশালায় আনিয়া 'খোসা' পৃথক করিবে; পরে বীজ হইতে তুলা পৃথক করিতে হইবে। ফল হইতে তুলা বাহির করিবার সময় লোকদিগের হস্ত অপরিস্কার না থাকে কিম্বা তুলার সহিত খোসার সামান্য অংশও মিশিয়া না যায়। তুলা বাহির করা হইলে তাহা হইতে এইবার বীজ স্বতন্ত্র করিতে হইবে। বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য একপ্রকার দেশীয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত ইক্ষুপেষণ যন্ত্রবৎ 'রোলার' আছে। এই রোলার মধ্যে উহা দিলে একদিকে তুলা ও অন্যদিকে বীজ পৃথক হইয়া পড়িয়া যায়। সমুদায় তুলার বীজ স্বতন্ত্র করা হইলে তুলা ওজন করিয়া চটের বা পাটের থ'লের মধ্যে বাঁধাই করিয়া গুদামজাত করিবে এবং বাজারের অবস্থা বুঝিয়া বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিবে।

অন্যান্য অনেক ফসলের ন্যায় তুলা গাছ ফল হইবার পরে মরিয়া যায় না ও যত্ন করিয়া রাখিলে তাহা হইতে দুই তিন বৎসর ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম বৎসরের ফসল সংগৃহিত হইবার পরে, মাঘ মাসে জমি উত্তমরূপে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দিতে হয় এবং জ্যেষ্ঠ মাসে প্রত্যেক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে সার প্রদান করিতে ও গাছগুলি ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

পুরাতন গাছের শাখা প্রশাখার অর্দ্ধপরিপক্ক অংশ মাত্র রাখিয়া নূতন অংশ কাটিয়া দিবে এবং যাবৎ বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ না হয় তাবৎ ক্ষেত্রে বারি সেচন করা আবশ্যক। অনন্তর গাছ সকল পুনরায় নূতন শাখা প্রশাখার দ্বারা সুশোভিত হইয়া ফল ধারণ করে। দুই তিন বৎসর গাছ রাখিতে ইচ্ছা থাকিলে, প্রথম রোপন করিবার সময় তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্থান রাখা আবশ্যক। এরূপস্থলে প্রত্যেক গাছের জন্য চারিদিকে চারি হস্ত পরিমাণ স্থান রাখিতে হইবে অথবা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে—জমি কোপাইবার পূর্ব্বে—প্রত্যেক তিনটী গাছের মধ্যস্থিত একটী গাছ উটাইয়া ফেলিলে অবশিষ্ঠ গাছের স্থানের অপ্রতুল হয় না। দুই তিন বৎসরের গাছগুলি পাঁচ ছয় হস্ত উর্দ্ধে বড় হইয়া থাকে।

তুলার বীজ যে কেবল বপন করিবার জন্য আবশ্যক হয় তাহা নহে। বীজ পেষণ করিলে তৈল প্রস্তুত হয় এবং সে তৈল অনেক কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। উহা হইতে যে খইল পাওয়া যায় তাহা গোরুতে ভক্ষণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। তুলা-বীজের তৈলে জ্বালানী কার্য্য হইয়া থাকে। অতএব উহা নষ্ট না করিয়া কলুর বাটী হইতে উহার তৈল প্রস্তুত করাইয়া আনিতে পারিলে গৃহস্থালী প্রদীপ জ্বালানী কার্য্য চলিতে পারে এবং যে খইল হইবে তদ্দ্বারা বলদ গাভীদিগের আহার চলিবে।

সুশৃঙ্খলা সহকারে এক বিঘা তুলার আবাদ করিতে পারিলে প্রায় আড়াই মণ তুলা এক বৎসর মধ্যে পাওয়া যায় এবং প্রতি মণের মূল্য ন্যূনকল্পে ১৫৲ টাকা ধরিলেও বিঘা প্রতি ৩৭৷৷০ টাকা হয়। এতদ্ব্যতীত বীজের পরিমাণ ও মূল্য স্বতন্ত্র আছে।

তুলার ক্ষেত্র মধ্যে অনেক স্থান খালি থাকে এই জন্য আমরা সেই বৃক্ষ পরস্পরের মধ্যস্থিত খালি ভূমিতে মাট-বাদাম ও পেঁয়াজ আবাদ করিয়া থাকি। পেঁয়াজ অপেক্ষা বাদামের চাষে তুলা গাছেরও উপকার হইয়া থাকে, বাদাম গাছও তুলাগাছের ছায়া দ্বারা উপকৃত হয়। বৃক্ষ মধ্যস্থিত খালি জমি পতিত না রাখিয়া মাঠ-বাদামের চাষ করিতে পারিলে অনেক দিকে লাভ আছে। ছায়া বিশিষ্ট স্থানে বাদামের আবাদ করিলে উহাতে বাদামের পরিমাণ অল্প হয় কিন্তু উহার গাছ বড় ও কোমল হয়, সুতরাং গোরুকে খাওয়াইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। এক চাষে দুই ফসল, ইহাও বিবেচনার কথা।

কঙ্গন বা কাঁওন।

Millet.

কঙ্গনের আবাদ বাঙ্গালাদেশে অতি অল্পই হইয়া থাকে, কারণ বাঙ্গালার কৃষকগণ ধান চাষের প্রতিই অধিক লক্ষ্য রাখে। যে দেশে সহজে ও অল্পদিনের পরিশ্রমে বহুল পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে, তথায় কঙ্গনের ন্যায় সামান্য শস্য লোকে ব্যবহার করে না। পার্ব্বত্য ও বন্য জাতিগণই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করে এবং সেই সকল দেশেই উহার চাষ আবাদ হয়। উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র লোকে ইহা ব্যবহার করে।

নিম্নতল ভূমিতে কঙ্গন উত্তম জন্মে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমিতে দুই তিন বার চাষ দিয়া বৈশাখ মাসে দুই এক পসলা বৃষ্টিপাতের পরে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি

এক সের বীজ লাগিয়া থাকে। বীজ বপনের পরে বৃষ্টি হইলে তিন চারি দিবসের মধ্যে উহা অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু এই সময়ে বৃষ্টি না হইলে অথবা মৃত্তিকা অতিশয় শুষ্ক থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং উইপোকা ও পীপিলিকায় বীজ খাইয়া ফেলে। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে ক্ষুদ্র বীজ পচিয়া যায়। বীজ বুনিবার একমাস মধ্যেই গাছগুলি অর্দ্ধহস্ত বা তিন পোয়া উচ্চ হয়; তখন নিড়ানি দ্বারা ক্ষেত্রের তৃণ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া দিলে গাছ অতি শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। জমি সতেজ থাকিলে গাছ প্রায় তিন হাত উচ্চ হয় নতুবা দুই হাত হইয়া থাকে। শ্রাবন মাসে গাছে শীষ উঠে এবং সেই শীষ ভাদ্র মাসে পাকিয়া যায়। তখন কা'স্তে সাহায্যে গাছের শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া 'খলেনে' তিন চারি দিবস শুকাইয়া লইতে হয়। পরে যথা নিয়মে মাড়িয়া ও ঝাড়িয়া গৃহজাত করিতে হইবে। শস্য পাকিয়া উঠিলে আর অধিক দিবস জমিতে রাখা উচিত নহে, কারণ নানাবিধ পক্ষীতে উহা খাইয়া যায়।

কাঁওনের শীষ দেখিতে অতি সুন্দর; পাকিলে কাঁচা স্বর্ণের ন্যায় উহার বর্ণ হয়। এক একটী শীষ দেখিতে এক একটী শৃগালের লেজের ন্যায়। উহার দানা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং বোধ হয় ২।৩টী একত্র করিলে একটী সর্ষপের সমান হয়। শীষ কাটিয়া লইবার পরে গাছগুলি জমিতেই থাকিয়া যায়। কৃষকগণ আর উহা কাটিয়া না আনিয়া ভাবি ফসলের উপকারের জন্য জমিতেই জ্বালাইয়া দেয়। কঙ্গন চূর্ণ করিয়া যে ময়দা বা আটা প্রস্তুত হয়, তাহা সহজে পরিপাক হয় না। অভাবে পড়িয়া দরিদ্র লোকে ইহা আহার করে। অন্যদিকে আবার এন্সলী (Anislie) সাহেব বলেন যে

দুগ্ধের সহিত উহা পাক করিলে সুন্দর খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং তাহা রোগী দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং আমরা কোন মতামত প্রকাশ করা উচিত মনে করি না।

প্রতি বিঘায় দুই মণ হইতে চারি মণ কাঁওন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মটর।

Pea.

আশ্বিন মাসে জমিতে উত্তমরূপে লাঙ্গলও মই দিয়া কার্ত্তিক মাসে বীজ রোপন করিতে হইবে। ইহার বীজ ক্ষেত্রময় ছিটাইয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ছোট জাতীয় দেশীয় হইলে বিঘা প্রতি দশসের, আর বড় জাতীয় পাটনাই হইলে সাত সের বীজ লাগে।

গবাদি গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্য শীতকালে কৃষক ও দুগ্ধব্যবসায়ীগণ ইহার চাষ করে। ফল সমেত গাছ খাইয়া গাভী দুগ্ধবতী হয় এবং ইহাতে তাহাদের শরীরও পুষ্টি লাভ করে। অনেক কৃষক গোয়ালাদিগকে এই সময় ক্ষেত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। ক্ষেত্র বিক্রয় অর্থে এরূপ কেহ বুঝিবেন না যে, তাহারা জমি বিক্রয় করে;—তাহারা কেবল ক্ষেত্রস্থিত ফসল বিক্রয় করে মাত্র। ক্ষেত্র খরিদ করিয়া গৃহস্থ বা কৃষকগণ স্ব স্ব গোরু বাছুরদিগকে তাহাতে চরাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র মটর আহরণ করা অপেক্ষা গাছ সমেত ক্ষেত্র বিক্রয় করায় লাভ আছে।

পাটনাই ও অন্য বড় জাতীয় মটর মনুষ্যের আহার কার্য্যে ব্যবহার হয়। মটর অতিশয় পুষ্টিকর সামগ্রী এবং সুস্বাদু ও মুখপ্রিয়। এজন্য ইহা শীতকালে প্রচুর রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৌষ মাস হইতে গাছে সুঁটী ধরিতে আরম্ভ হয়। তখন কৃষকগণ উহা সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে; কেহবা তখন বিক্রয় না করিয়া রাখিয়া দেয়। ফাল্গুন মাসে যখন ফল পাকিয়া উঠে এবং লতা শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন উহা কাটিয়া আনিয়া যথা নিয়মে দানা সংগ্রহ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫ মণ মটর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপর্য্যুপরি আবাদ করায় যে ক্ষেত্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহাতে মটর জাতীয় (Lequminosœ) ফসল বুনিলে উহা অনেক উৎকর্ষতা লাভ করে। ইক্ষু, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ফসলে জমিকে অতিশয় ক্লান্ত ও দুর্ব্বল করে, এই কারণে সেই সকল ক্ষেত্র খালি পড়িলে তাহাতে মটর, অড়হর, বুট প্রভৃতি ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য।

মটর ভাঙ্গিয়া যে ডাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা ভারতবাসী হিন্দুদিগের বিশেষ উপাদেয় খাদ্য। মুসলমানের মধ্যে ইহা ব্যবহার আছে কিনা তাহা জানি না। নিরামিষাশী হিন্দুগণের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্যকীয় খাদ্য বলিয়া আমরা মনে করি, কারণ মৎস্য মাংসাদি ভোজন না করায় শরীরে যে 'ফস্‌ফরস' নামক পদার্থের অভাব হয়, তাহা মটরঃ জাতীয় ফসলের দ্বারা

পরিপূরিত হইতে পারে। বিনা 'ফস্‌ফরকে' জীব শরীর রক্ষিত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং যে কোন প্রকারেই হউক ইহা আমাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পিতৃমাতৃ বা অন্য কোন গুরুজন বিয়োগে অশৌচাবস্থায় হিন্দুগণের মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ একবারে নিষেধ আছে, কিন্তু তাহাতে যে শরীরের ক্ষতি হয় তাহা রোধ করিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ হবিষ্যান্নের সহিত মটর ডালের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মটর-ডাল পোষণ করিয়া যে 'বড়ি' প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাও বিশেষ পুষ্টিকর।

অড়হর।

(Cajanus indicus.)

বারম্বার আবাদ হওয়ায় যে ক্ষেত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সাধারণতঃ তাহাতেই উহার আবাদ হইয়া থাকে। অড়হর গাছের গুণ এই যে, পত্র দ্বারা বায়ু হইতে বহুল পরিমাণে যবক্ষারজান সঞ্চয় করিয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরতা আনয়ন করে; এই কারণে কৃষকেরা সময়ে সময়ে ক্ষেত্রে অড়রের আবাদ করিয়া থাকে।

ফাল্গুন বা চৈত্র মাসের মধ্যে যথাবিধি হল চালনা দ্বারা জমি তৈয়ার করিয়া বৈশাখ মাসে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইবার পরে বীজ বপন করিতে হইবে। জঘন্য জাতীয় বীজ রোপন দ্বারা ক্ষেত্র পূরণ না করিয়া, পরিষ্কার ও ভাল জাতীয় বীজ রোপন করা উচিত। পাটনা জাতীয় অড়রের বীজ উৎকৃষ্ট। বিঘা প্রতি তিন সের বীজ আবশ্যক হয়। বীজের পরিমাণ সম্বন্ধে

একটী কথা আছে। তিনসের বীজ রোপন করিলে গাছ অতি ঘন ভাবে জন্মে, এবং তাহাতে শাখা প্রশাখা নির্গত হইতে পারে না। নিয়মিত পরিমাণে স্থান নির্দ্দেশ করতঃ গাছগুলি স্বতন্ত্র জন্মিলে উহাদিগের শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে ফলও অধিক জন্মে। কৃষকগণ কিন্তু ঘনভাবে গাছ রোপন করিবার পক্ষপাতী। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পাইলে অড়র গাছ উর্দ্ধে ৫।৬ হাত এবং পার্শ্বদেশে ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া যথেষ্ট পরিমাণে ফল ধারণ করে। আমাদিগের প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রতি বিঘায় চারি শত গাছ হইলেই যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে;—গাছগুলি তিন হাত উচ্চ হইলে ভূমি হইতে তুই হাত রাখিয়া উপরিভাগ কাটিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে গাছগুলি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া সুন্দর শ্রী-ধারণ করিবে। ঘনভাবে বীজ রোপিত হইলে গাছ লম্বাভাগে বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে ফলও অল্প জন্মে।

আমাদিগের প্রণালী অনুসারে অড়রের চাষ করিতে খরচাধিক্য আছে ভাবিয়া কৃষক আশঙ্কিত হইতে পারেন, কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের প্রণালী সহজ ও অল্প ব্যয় সাধ্য। চলিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হইলে বীজ ছিটাইবার পরে জমিতে ‘মই’ দিতে হয়। তাহাতে তুইটী বলদ ও একটী হলধারীর পরিশ্রম আছে, কিন্তু আমাদিগের পদ্ধতিতে সেই কার্য্য একটী বালক বা স্ত্রীলোক দ্বারা সমাহিত হইতে পারে, কারণ উহা অতি সহজ কার্য্য। ক্ষেত্র মধ্যে প্রতি চারি হাত ব্যবধানে

এক একটী 'থালা' করিয়া তন্মধ্যে তিন চারিটী বীজ পুড়িয়া দিলেই হইল।

যে প্রণালীতেই হউক, মৃত্তিকা সরস থাকিলে ৪।৫ দিবসের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রণালীতে পৃথক পৃথক ভাবে যদি বীজ লাগান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল গাছ বাহাল না রাখিয়া, প্রত্যেক 'থালায়' একটীর হিসাবে গাছ রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে নতুবা ঘন হইয়া যাইবে। গাছগুলি আষাঢ় মাসের মধ্যেই দুই হাত উচ্চ হইয়া উঠিলে, তখনই উল্লিখিত প্রণালীতে ক্ষেত্র পাতলা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রাবন মাসের মধ্যে গাছের শিরোভাগ কাটিয়া দিতে হইবে। ঘনভাবে রোপিত ক্ষেত্রের গাছে ছুরী চলিবে না, কারণ তাহা করিলে, গাছের শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া ক্ষেত্র অধিকতর ঘন ও নিবিড় হইয়া যাইবে অগত্যা তাহাতে ফসল ও কম জন্মিবে। আমাদিগের প্রণালীতে বীজ রোপিত হইলে যে গাছ বাহির হইবে তাহাই ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত, অপর স্থলে নহে।

উচ্চ, নীরস ও বালিমাটি অপেক্ষা নিম্নতল, সরস ও চিকন বা দো-আঁশ জমিতে অড়র গাছ ভালরূপ জন্মে। অসার ও নীরস জমিতে উহার তাদৃশ আশাজনক ফসল হয় না। যে স্থলে কেবল জমির উর্ব্বরতা সাধন করাই ক্ষেত্রস্বামীর উদ্দেশ্য, তথায় উহার জন্য বিশেষ তদ্বিরের আবশ্যক নাই, কিন্তু ফসলের জন্য আবাদ করিতে হইলে, অন্যান্য ফসলের ন্যায় উহাকেও যত্ন করা উচিত, কারণ বিনা যত্নে কোন ফসলেরই সুশৃঙ্খলে আবাদ হইতে পারে না।

কার্ত্তিক মাস হইতে অড়র গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং সেই ফুল হইতে সুঁটী জন্মে। প্রত্যেক সুঁটী মধ্যে তিন হইতে পাঁচটী ডাল বা বীজ থাকে। ফাল্গুন মাসে সুঁটী পরিপক্ক হইলে শস্য আহরণ করিতে হয়। গাছ হইতে একটী একটী সুঁটী সংগ্রহ করিতে বিশেষ বিলম্ব হয়, সুতরাং সুঁটী সমেত গাছ বা শাখা কাটিয়া 'খলেনে' আনিয়া দুই চারিদিবস তদবস্থায় উত্তমরূপে শুষ্ক হইতে দেওয়া আবশ্যক। তদনন্তর শাখা বা গাছ ধরিয়া কাষ্ঠ আচড়াইলে সুঁটী খসিয়া পড়িবে। পরে তাহার উপর বলদ ঘুরাইলে সুঁটী হইতে বীজ পৃথক হইয়া যাইবে; তৎপরে ঝাড়িয়া ওজন করতঃ গুদামে রাখিয়া দাও। বিঘা প্রতি ৬ মণ ফসল জন্মে, কিন্তু শেষোক্ত প্রণালীতে ৮।১০ মণ জন্মিয়া থাকে।

অড়র হইতে যে ডাল প্রস্তুত হয় তাহা অতি পুষ্টিকর ও বলকারক। পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাববাসীগণ ইহা সমধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। অড়রের ভূষি খাওয়াইলে গাভী দুগ্ধবতী হয় এবং বলদ ও যণ্ড বলিষ্ঠ হয়।

অড়হর কাষ্ঠ দ্বারা জ্বালানী কার্য্য চলিতে পারে কিন্তু উহা নিতান্ত হালকা সুতরাং শীঘ্রই পুড়িয়া যায়। বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য ইহার অঙ্গার আবশ্যক হয়। অতএব উহা অনর্থক নষ্ট না করিয়া বারুদ ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করিলে লাভ আছে।

অড়রের আবাদ উঠিয়া গেলে ক্ষেত্রকে পুড়ান উচিত নহে, কেন না তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক সংগৃহিত যবক্ষারজানও সেই

সঙ্গে পুড়িয়া যায়, সুতরাং জমীর পূর্ব্বাবস্থা আসিয়া পড়ে এবং অড়রের আবাদ দ্বারা ক্ষেত্রের যে কিছু উপকার হইয়াছিল তাহা আর থাকে না।

অনেক স্থানে দেখা যায়, কৃষকগণ ক্ষেত্রের চারিদিকে অড়র গাছের বেড়া দিয়া থাকে, তাহাতে ফসলও পাওয়া যায় এবং জমিও আটক থাকে। অনেক স্থানে তুলা ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে অড়রের গাছ লাগান হইয়া থাকে, ইহাতে তুলার বিশেষ উপকার হয়, এইরূপ শুনা যায়।